রাজনীতির নজরুল

সম্পাদনা □ অরুণাভ ঘোষ

প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স
৩৭এ, কলেজ স্ট্রীট : : কলকাতা-৭৩

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

কাজী নজরুল ইসলামকে আমি প্রথম আবিষ্কার করি ১৯১৯ সালে, আজ থেকে আশি বছর আগে, প্রবাসীর বৈশাখ সংখ্যায় হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম এই নামে মাত্র দু-লাইনের একটি কবিতা লিখেছিলেন---প্রেমের কবিতা। হাফেজ-এর কবিতার অনুসরণে লিখিত সেই কবিতার (আশায়) শেষ পঙ্‌ক্তি ছিল 'পশ্‌বে তোরও নাসায়'। তার এক বা দু' বছর বাদে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' 'বল বীর চির উন্নত মম শির' 'মুসলিম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়—তার থেকে উদ্ধৃত হয় প্রবাসীতে। সেই কবিতায় তিনি হিন্দু পুরাণ সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। পড়লে মনে হয় না যে সেটা কোন মুসলমানের লেখা। তাঁর বিদ্রোহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সেই অন্যায় হিন্দু বা মুসলিম কোন পক্ষের নয়। মোট কথা বিদ্রোহী কবি নজরুল ধর্ম-নিরপেক্ষ কিংবা ধর্মের নিরপেক্ষ।

তার পরে তাঁর বই 'অগ্নিবীণা' বেরয়। আমরা ছাত্ররা কিনি, পড়ি ও তাঁর ভক্ত বনে যাই। আমি তখন পাটনা কলেজের ছাত্র। একবার কলকাতা এসে এ্যালবার্ট হলের সভায় যাই। সেখানে দেখি মেঝের ওপর ফরাস পাতা। ফরাসের একপ্রান্তে কাজী নজরুল ইসলাম ও তাঁর সামনে একটি হারমোনিয়াম। তিনি হারমোনিয়াম বাজাতে বাজাতে গান করতে লাগলেন—'হে ভাই চাষী ধর কষে লাঙল'। তার পর আর একটি গান 'হে ভাই মজুর ধর কষে শাবল'। এর থেকে বোঝা গেল তিনি কৃষক শ্রমিক জাগরণের (মহান) বাণী মূর্তি, অর্থাৎ তিনি মূলত একজন সাম্যবাদী। সেটা বোধহয় তাঁর বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের প্রভাবে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ওরফে 'কাকাবাবু' ছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং একই কালে 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি'র কর্তাব্যক্তি। বিদ্রোহী কবি পরবর্তীকালে প্রেমের কবিতা লিখতে আরম্ভ করলেন। তার পর চলে গেলেন গানের জগতে।

তাঁকে আমি দ্বিতীয়বার দেখি ১৯৩০ সালে আমার বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর বিবাহের বরযাত্রী রূপে। অচিন্ত্যের দাদার বাড়ীতেই আমরা মিলিত হই। তখন লক্ষ করি যে তাঁর পরনে গৈরিক ধুতি ও চোস্ত্ কুর্তা। যতদূর মনে পড়ে কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা। অচিন্ত্যের বিবাহ নিয়ে হাসি মস্করা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর প্রকাশক গোপাল দাস মজুমদার। গোপালবাবু বলেন কাজীর বই প্রধানত মুসলমানেরা কেনে। নজরুল মাথা নেড়ে বললেন 'না প্রধানত হিন্দুরাই কেনে'। ইতিমধ্যে তিনি হিন্দু-বিবাহ করেছিলেন। হিন্দুদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক। এর পরে তাঁর সঙ্গে আমার আর কোন দিন দেখা হয় নি। সরকারী চাকরী উপলক্ষে আমায় নানান জেলায় ঘুরতে হয়েছিল। তিনিও গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হন। তাঁর রেকর্ড আমি কিনি।

চট্টগ্রামে ১৯৩৮ সালে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। তিনি আমার হাতে একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে বলেন, এই দেখুন কাজী নজরুল ইসলাম

একটি গান লিখে দিয়েছেন। সেটি সেই ভদ্রলোকের গুরু এক পরমহংসের নামে। পরমহংসের নামটি আমার ঠিক মনে পড়ছে না, তবে 'তারা' দিয়ে আরম্ভ— বোধহয় তারাচরণ। গানটি সম্পূর্ণ হিন্দু ভাবের গান। যেন একজন হিন্দু সাধকের লেখা। এর প্রায় আটবছর বাদে আমি যখন ময়মনসিং-এ তখন একদিন দেখি আমারই অধস্তন একজন কর্মচারী হারমোনিয়াম সহযোগে গান করছেন। গানের মর্ম 'হে কাজী নজরুল তুমি আবার সুস্থ হয়ে ওঠ'। আমি জানতে চাইলুম কি হয়েছে নজরুলের? তাঁরা বলেন শক্ত অসুখ, তিনি কথা বলতে পারছেন না। আমি খুবই দুঃখিত হই। মাস কয়েক পরে কলকাতায় শুনি নজরুলের বাড়ী আক্রান্ত হয়েছে। দাঙ্গাবাজরা আক্রমণ করেছিল, কিন্তু সুখের বিষয় জনমত ছিল তাঁর পক্ষে। এই ঘটনার কিছুদিন বাদে, পার্টিশনের পরে, আমি একটি কবিতা লিখি—

"ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সবকিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নি কো নজরুল।
সেই ভুলটুকু বেঁচে থাক
বাঙালী বলতে একজনই আছে
দুর্গতি তার ভেসে যাক।"

তার মানে আমরা সবাই বিভক্ত হয়ে গেছি, কেউ ভারতীয়, কেউ পাকিস্তানি। কিন্তু নজরুলকে ওভাবে চিহ্নিত করা যায় না। তিনি বিভক্ত হন নি। আমি খুব আশা করেছিলুম যে তাঁর দুর্গতি মুছে যাবে। কাজী আবদুল ওদুদ ও রবিউদ্দীন তাঁকে নিয়ে ইউরোপে যান। ভিয়েনার ডাক্তাররা বলেন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। এ অসুখ সারবার নয়। আমাদের আর কারও কিছু করবার ছিল না। বাংলাদেশ হবার পরে শেখ মুজিবর রহমানের সরকার তাঁকে ঢাকায় নিয়ে যান। সেখানেও তাঁর অবস্থার উন্নতি হয় না। একদিন শুনি তিনি আর নেই। তার একদিন-দুদিন বাদে রবীন্দ্রসদনে কি একটা উপলক্ষে সভা হচ্ছিল, মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় এবং আমি দুজনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলুম। এমন সময়ে কাজী সব্যসাচীর স্ত্রী কল্যাণী কাজী এসে আমাদের পায়ের তলায় কান্নায় ভেঙে পড়ে। তার মুখে শোনা গেল সব্যসাচী ছুটে গিয়েছিল ঢাকায় তার পিতার অন্ত্যেষ্টির জন্য। তাকে ঢাকা বিমানবন্দরে আটক করে রাখা হয়। তারপর যখন ছেড়ে দেওয়া হয় তখন সে গিয়ে দেখে অন্ত্যেষ্টি পর্ব ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়ে গেছে। তার পিতার কবরে সে এক মুঠো মাটি দিতে পারল না। সব্যসাচী হতাশ হয়ে ফিরে এল। আমরা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলুম। আমাদের কিছু করবার ছিল না। কল্যাণীকে সান্ত্বনা দিই। মনে মনে বুঝতে পারি ঢাকার মৌলবাদীরা নজরুলকে একজন গোঁড়া মুসলমান বানিয়েছে। তার মানে ভাগ করে নিয়েছে। সব্যসাচী সেই ভাগের মধ্যে পড়ে না। তখন আমি আর একটি কবিতা লিখি। তার মর্ম হচ্ছে,— মৃত্যুর পর নজরুল ভাগ হয়ে গেছে। আমার কাছে এটা খুবই দুঃখের বিষয়।

অন্নদাশঙ্কর রায়

ভূমিকা

কবি হিসাবে, সঙ্গীতকার হিসাবে কাজী নজরুল ইসলাম যতটা পরিচিত, সমাদৃত, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর অবদান যতটা স্বীকৃত, তাঁর রাজনৈতিক সত্তা—রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও ভূমিকা ততটা আলোচিত নয়। অথচ তাঁর কাব্য ও সঙ্গীতে বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর জীবন ও কর্মে ঐ রাজনীতির প্রতিফলন সুস্পষ্ট। নজরুল ছিলেন সমাজ সচেতন কবি। তাঁর রাজনৈতিক চেতনা, তাঁর প্রতিবাদী চরিত্র তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি'তে পরিণত করেছিল। সামাজিক বৈষম্য, অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী বার বার গর্জে উঠেছিল। পাশাপাশি তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন।

জন্মশতবর্ষ উদযাপনের কালে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নজরুলের দিকে ফিরে তাকাবার তাগিদ থেকেই এই বই-এর পরিকল্পনা। সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, রাজনীতির দিক থেকে নজরুলকে ধরার চেষ্টা হয়েছে এই বইতে। তাঁর রাজনৈতিক জীবন, কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক মতামতকে সংকলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে মোট বারোটি প্রবন্ধের মাধ্যমে। যাঁরা লিখেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নজরুলের উপর বিশেষজ্ঞ অথবা গবেষণারত। তাঁদের প্রত্যেকের কাছেই আমি ঋণী। বইটির মুখবন্ধ লিখে জীবন্ত কিংবদন্তী কবি অন্নদাশঙ্কর রায় আমাকে তাঁর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। নজরুল সম্পর্কে লিখিত প্রায় তিনশো বই-এর একটি তালিকা গ্রন্থপঞ্জীতে সংযোজিত হল, ভবিষ্যৎ গবেষণার স্বার্থে। তবে তালিকাটিতে কিছু অপূর্ণতা থেকে গেল, কোন কোন গ্রন্থের প্রকাশকের নাম বা প্রকাশনার সাল উদ্ধার করতে না পারায়।

সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে পরিপূর্ণ বর্তমান ভারতে নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থেই এক অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব। 'আর সবই ভাগ' হয়ে গেলেও নজরুলকে জীবদ্দশায় ভাগ করা যায় নি। তাই তো মুসলমান হয়েও কত আবেগ দিয়ে শ্যামাসঙ্গীত লিখতে পেরেছিলেন তিনি। মোল্লাদের অনাচারের বিরুদ্ধে সরব হতে পেরেছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনে হিন্দু মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন, নিজের সন্তানদের নাম রেখেছিলেন কাজী সব্যসাচী, কাজী অনিরুদ্ধ। ধর্মীয় পরিচয় নয় মানুষের মনুষ্যত্বই ছিল তাঁর কাছে বিচার্য।

এই বইটির মাধ্যমে রাজনীতিক নজরুল সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হলে, তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকার পুনর্মূল্যায়ন হলে, রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রাপ্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হলে, পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

অরুণাভ ঘোষ

কলকাতা,

২৪শে মে, ২০০১ সাল

নজরুলের রাজনৈতিক চেতনা ও মানবতাবোধ

কল্পতরু সেনগুপ্ত

কাজী নজরুল ইসলাম কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা তাঁকে রাতারাতি খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তৎকালীন বাংলার যুবসমাজ এই কবিতাতে তাঁদের চেতনা উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলার বিপ্লববাদীরা বিদ্রোহী কবিতার মধ্যে তাঁদের লক্ষ্য উপলব্ধি করেছিলেন। এই কবিতার আগে কোন কবি এমনভাবে বিদ্রোহীর ভাবমূর্তি তুলে ধরেন নি। একমাত্র ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ, ও তাঁর কবিতা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'। 'বিদ্রোহী' কবিতাতে নজরুল ভেঙে আবার গড়ার কথা বলেছেন। তাঁর কবিতার শেষ স্তবক

"আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—"

এই শেষ স্তবকে বাংলার বিপ্লববাদীদের কাছে তিনি তুলে ধরেছিলেন এক সাম্যবাদী-সমাজচিত্র। তার আগে বিপ্লবীদের কাছে তাদের লক্ষ্যের শেষ কোথায় এ বিষয়ে কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। এমন কি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবও তাদের কাছে ছিল না। তাঁরা সংগ্রাম করছিলেন, আত্মদান করছিলেন, ফাঁসির মঞ্চে আত্মাহুতি দিচ্ছিলেন, কিন্তু স্বাধীন ভারতের রূপ কি হবে এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট চিত্র তাঁদের কাছে ছিল না। এই কারণে 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত হয়ে যায়। পাঁচটি কাগজে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কাজী নজরুলকে আলিঙ্গন করে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। সেকালের সাহিত্যিকেরা বলেছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের পরে যে বাণীর জন্য আমরা অপেক্ষা করেছিলাম এই কবিতায় আমরা তাই পেয়েছি। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে নজরুলের 'বিদ্রোহী' রাজনৈতিক কবিতার এক স্মারক।

'বিদ্রোহী'র পরবর্তী 'সব্যসাচী', 'রক্তাম্বরধারিণী মা', 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী', 'আমার কৈফিয়ৎ', 'ফরিয়াদ' ইত্যাদি কবিতায় তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর প্রবন্ধ 'ক্ষুদিরামের মা', 'ম্যায় ভুখা হুঁ', 'সৈনিক' ইত্যাদিতে তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। নজরুল তখন সম্পূর্ণভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লববাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। সেইসঙ্গে তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল মানবতাবোধ। এটাই নজরুলের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ। সেকালের দেশ ও সমাজ যা কামনা করত, নজরুল তাতে বাণীরূপ দিয়েছেন।

কাজী নজরুলের রাজনৈতিক চেতনার মূল নিয়ে প্রশ্ন জাগতে পারে। তাঁর রাজনৈতিক চেতনার মূলে রয়েছে বাল্যের অপরিসীম দারিদ্র্য যন্ত্রণা এবং সেই দারিদ্র্য

থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম। মসজিদের সেবক থেকে রুটির দোকানের চাকর, রেলওয়ে গার্ডের পাচক—কিনা কাজ করেছেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে স্কুলে ভর্তি হয়েছেন। স্কুলে মেধাবী ছাত্র হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের স্নেহাশিস লাভ করেছেন। মাথরুন হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। রেলওয়ে গার্ডের স্ত্রী নিরুপমা দেবীর কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখেছিলেন। তিনি ছাত্রকালে রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়া আর কোন গান গাইতেন না। আরও পরে 'গীতাঞ্জলি' তাঁর মুখস্থ ছিল। তার আগে তিনি লেটো গানের দলে ছিলেন। লেটো গানে কোন বিষয় নিয়ে দুই পক্ষের গানে গানে লড়াই এবং তাৎক্ষণিক গান রচনা করতে হয়, এই গান রচনার জন্য হিন্দু পুরাণ থেকে বিভিন্ন ধর্মের উপাখ্যান জানা দরকার হয়। এই লেটো গান তাঁর কৈশোরে কবিপ্রতিভা সঞ্চারে সাহায্য করেছে। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই লেটো গান গেয়েছেন, ফলে মানুষের জীবনের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ঘটেছে। মানুষের দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, বঞ্চনা, প্রতারণা তিনি দেখেছেন এবং তার প্রতিবিধানের কথা ভেবেছেন। সুতরাং গ্রামীণ সংস্কৃতি তাঁর কবি জীবনের ভিত্তি রচনা করেছে, এখানে অন্য কবিদের সঙ্গে তার তফাত। আর এক উল্লেখযোগ্য বিষয় নজরুলের উপর চণ্ডীদাসের প্রভাব। অজয়নদের ওপারে বীরভূম জেলা। বীরভূমের নান্নুর গ্রাম চণ্ডীদাসের পীঠস্থান। যে চণ্ডীদাস গেয়েছেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। এই বাণী নজরুলের মনের গভীরে ছিল। তাঁর সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকার শিরোনামের নীচে লেখা থাকত 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—চণ্ডীদাস। আরও একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন নজরুলের বাড়ী ছিল পীরপুকুরের ধারে। একজন সুফী মতাবলম্বী পীরের প্রতিষ্ঠা ছিল এখানে। সুতরাং উদার মানবতাবাদের প্রভাব তাঁর জীবনের সূচনা কাল থেকেই ছিল।

এইসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে শিয়ারশোল স্কুলে পড়ার সময় তিনি বিপ্লববাদী শিক্ষক নিবারণ ঘটকের স্নেহধন্য ছিলেন। নিবারণ ঘটক যুগান্তর বিপ্লবীদলের সদস্য ছিলেন। তিনি নজরুলকে ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবপথে আগ্রহী করে তুলেছিলেন, সশস্ত্র বিপ্লববাদে বিশ্বাসী করেছিলেন। এই নিবারণ ঘটকের মাসী দুকড়িবালা দেবী বাংলার প্রথম মহিলা বিপ্লবী, যাঁর তিনবছর কারাদণ্ড হয়েছিল। নিবারণ ঘটকও পরবর্তীকালে কারাদণ্ডিত হয়েছিলেন। নজরুলের বাল্য ও কৈশোর এই ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় তাঁর বিপ্লবী মানস কিভাবে গঠিত হয়েছিল।

এই মানসিকতার জন্য নজরুল প্রথম মহাযুদ্ধে ৪৯ নং বাঙালী রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছিলেন যুদ্ধবিদ্যা শিখে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বকে দেখার আগ্রহে। সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তাঁদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এখানেই তিনি পারস্যের গজল গান আয়ত্ত করেন। এখানে তিনি নানা ভাষার সঙ্গে পরিচিত হন। সৈনিক থাকাকালে তিনি শুনেছিলেন রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের কথা। সাম্যবাদী সমাজ

প্রতিষ্ঠার জন্য লালফৌজের বীরত্বের কথা। এই সময় কিছু সংখ্যক ভারতীয় যুবক সীমানা অতিক্রম করে লালফৌজে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা অসীম বীরত্বের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে উচ্চপদে উন্নীত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে মূর্তজা বশির নামে এক পাঞ্জাবী যুবক অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান হয়েছিলেন। তাঁর ভয়ে সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর নায়করা ভীত ছিল। এই অভিজ্ঞতা থেকেই ব্যারাকে বসে তাঁর বড়গল্প রচনা 'ব্যথার দান'। ভারতীয় ভাষায় এটিই বোধহয় প্রথম বড়গল্প যাতে রুশ বিপ্লবের কথা বলা হয়েছে। একই সময় তুরস্কে কামাল পাশার নেতৃত্বে গ্রীক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছিল। এই স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং সেকালে মধ্য এশিয়ায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকায় তিনি উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। এই উদ্দীপনার প্রকাশ 'কামাল পাশা' নামক দীর্ঘ কবিতায়। যে কবিতা ছন্দে, শব্দে অভিনব, বহু ভাষার মিশ্রণে উদ্দীপক। প্রসঙ্গত বলা দরকার নজরুল সাতটি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর কবিতায়, গানে এই ভাষাগুলোর প্রয়োগ উপলব্ধি করা যায়। আরও উল্লেখ করা দরকার দেশে ফিরে এসে নভেম্বর বিপ্লবকে ভারতে আহ্বান জানিয়ে ১৯২২ সালে তিনি গান লিখেছিলেন—

"তোরা সব জয়ধ্বনি কর, তোরা সব জয়ধ্বনি কর
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়,
সিন্ধুপারের আগল ভেঙে আসছে ভয়ঙ্কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।"

সুতরাং বলা যেতে পারে যুদ্ধে যোগদান, সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ এবং সে কারণে বহু সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় নজরুলের মধ্যে স্বদেশ প্রেম প্রবল করে তুলেছিল, দেশের মুক্তির জন্য তিনি আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বিশ্বদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। মানবতাবোধের সঙ্গে বিশ্বদৃষ্টি প্রকৃত দেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটায়। সুতরাং নজরুলের শিক্ষার ক্ষেত্রে যুদ্ধে যোগদান, তাঁকে বিদ্রোহী কবি রূপে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

কবি নজরুলের সৌভাগ্য যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তিনি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে একই ঘরে বাস করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কথা চিন্তা করছিলেন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সদস্য এম. এন. রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এই কারণে অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সূচনা-পর্বে চিন্তার দিক থেকে নজরুল যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে তালতলার বাড়িতে বাস করার সময় একরাত্রে তিনি বিদ্রোহী কবিতাটি লিখেছিলেন। নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা আলোচনা করার সময় এই পটভূমি বিবেচনা করা প্রয়োজন। এই সময়ে তিনি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সহযোগী আব্দুল হালিম, গোপেন চক্রবর্তী, কুতবুদ্দীন আহ্‌মদ, হেমন্ত সরকার প্রমুখের সঙ্গলাভ করেন। যাঁরা সাম্যবাদী চিন্তায় অগ্রগামী ছিলেন। এই সাম্যবাদী চিন্তার প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কাজী নজরুলকে

নিয়ে সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার আর্থিক দায়িত্ব নিয়েছিলেন এ. কে. ফজলুল হক। ফজলুল হক তখন বাংলার রাজনীতিতে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। তিনি চেয়েছিলেন মুসলমানের দ্বারা সম্পাদিত মুসলমান সমাজের হিতার্থে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করতে। কিন্তু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কাজী নজরুল ইসলাম যেভাবে পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তাতে পত্রিকাটি ধর্ম নিরপেক্ষ বামপন্থী পত্রিকায় পরিণত হয়। নজরুলের কলমের ছোঁয়ায় এবং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের পাণ্ডিত্যে 'নবযুগ' সংবাদপত্র জগতে সত্যই নবযুগের সূচনা করে। এই পত্রিকায় দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম, শ্রমিক কৃষকের আন্দোলন, নারী জাগরণ, বিশেষ করে মুসলিম নারীদের বোরখা থেকে মুক্ত করার আহ্বান প্রকাশ হতে থাকে। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়ে। সরকার পরপর দু'বার জামানত তলব করে। সেকালে পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে সরকারের দপ্তরে টাকা জমা দিয়ে অনুমতিপত্র নিতে হত। কোন লেখা সরকারের পছন্দ না হলে এ জমা টাকা জব্দ করে নিত। আবার টাকা জমা দিয়ে কাগজকে বাঁচিয়ে রাখতে হত। এটাই জামানত তলব। এই জামানত তলবের ফলে অসংখ্য পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং দু'বার জামানত তলব হওয়ায় নবযুগ টিকে থাকতে পারল না। নবযুগ বন্ধ হওয়ার পরে, নজরুল নিজের উদ্যোগে 'ধূমকেতু' প্রকাশ করেন। 'ধূমকেতু' ছিল অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা। পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত পত্রিকা। এই পত্রিকায় নজরুল সম্পাদকীয় লেখেন "ধূমকেতু চায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা"। নজরুলের আগে এভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করে কোন পত্রিকা সম্পাদকীয় লেখেনি। কোন রাজনৈতিক দল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। ১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলার বিপ্লবীরা সুভাষচন্দ্র বসুকে মুখপাত্র করে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজির বিরোধিতায় সেই প্রস্তাব পরাজিত হয়। মতিলাল নেহরুর ডোমিনিয়ান স্টেটাসের প্রস্তাব গৃহীত হয়। তখন নজরুল ব্যঙ্গ করে গীতি কবিতা লিখেছিলেন—

"দুলিয়ে মাজা বগল বাজা
মা হবেন আজ ডোমনী রে।"

১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে অবশ্য পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু লক্ষ করতে হবে যে ১৯২২ সালে নজরুল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। এই পত্রিকাতে শারদীয় সংখ্যায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লেখার জন্য নজরুল একবছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এই প্রথম একজন কবি রাজদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডিত হলেন। কিন্তু জেলে গিয়েও তিনি নীরব থাকেন নি। তিনি রাজনৈতিক বন্দীদের রাজনৈতিক মর্যাদাদানের দাবিতে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অনশন ধর্মঘটকে এক নৈতিক সংগ্রাম রূপে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। এই নৈতিক সংগ্রামের পথ দেখিয়েছিলেন আন্দামানে

নির্বাসিত রাজনৈতিক বন্দীদের প্রথম ও দ্বিতীয় দল। যে অনশন ধর্মঘটে তিনজন বন্দী শহীদ হয়েছিলেন। মূল ভূখণ্ডে কাজী নজরুল এই দুঃসাহসিক সংগ্রাম করে পথ দেখালেন। তিনি ঊনচল্লিশ দিন অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। গভীর রাজনৈতিক চেতনা ও আদর্শবোধ না থাকলে ঊনচল্লিশ দিন অনশন ধর্মঘট করা সম্ভব নয়। তাঁর অনশন ধর্মঘটে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হয়েছিলেন এবং তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন "আমাদের সাহিত্য তোমাকে চায়, অনশন ত্যাগ কর।" কবিগুরু তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাটিকা নজরুলকে উৎসর্গ করেছিলেন কবি স্বীকৃতি দিয়ে। নজরুলের প্রতি কবিগুরুর যে বিশ্বাস ও ভরসা ছিল তা বোঝা যেত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশও রাজনৈতিক সভা আহ্বান করে নজরুলের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।

কারামুক্তির পরে নজরুল গান ও কবিতা লেখার সঙ্গে 'লাঙল' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর পূর্বোক্ত সহযোগীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে 'লেবার স্বরাজ পার্টি' নামে কংগ্রেসের অভ্যন্তরেই একটি রাজনৈতিক দল গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এই লেবার স্বরাজ পার্টির গঠনতন্ত্র রচনায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। লেবার স্বরাজ পার্টির কর্মসূচী প্রকাশিত হয়েছিল। এই কর্মসূচীতে পাঠকদের অনুরোধ করা হয়েছিল ৩৭ নং হ্যারিসন রোডস্থিত লেবার স্বরাজ পার্টির কার্যালয়ে কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। এই লেবার স্বরাজ পার্টি পরবর্তী কালে 'শ্রমিক কৃষক দলে' পরিবর্তিত হয়। অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সূচনা পর্বে এই সংগঠনগুলো ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। 'লেবার স্বরাজ পার্টি'র মুখপত্র ছিল 'লাঙল' পত্রিকা। 'লাঙল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিল করার দাবি তোলে। নজরুল বুঝেছিলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার কৃষক সমাজ শোষিত ও নিপীড়িত। গ্রামজীবনে দারিদ্র্য ও সাম্প্রদায়িক রেষারেষির কারণও এই ভূমি ব্যবস্থা। কাজেই নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তিনি জমিদারী ব্যবস্থার বাতিল দাবি করেছিলেন। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে এরূপ দাবি করা কম সাহসের কথা নয় এবং প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচায়ক। পরবর্তী সময়ে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের দাবিতে জেলায় জেলায় কৃষক সমিতি গঠিত হয় এবং জমিদারী প্রথা ও ভূমিসংস্কারের দাবি তীব্র হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের তীব্রতার জন্যে জাতীয় কংগ্রেসকেও স্বীকার করতে হয়েছে দেশ স্বাধীন হলে জমিদারী ব্যবস্থা বাতিল করা হবে। এই 'লাঙল' পত্রিকাতেই নজরুল লিখেছিলেন 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছ। বাংলাকাব্য জগতে তো বটেই রাজনীতিতেও একটা নতুন বাণী ও সুর শোনা গেল, যা ইতিপূর্বে কোন রাজনৈতিক মঞ্চে এভাবে প্রকাশিত হয় নি। এই 'সাম্যবাদী' কবিতাগুচ্ছে কয়েকটি কবিতা আছে। যেমন—ঈশ্বর, কুলিমজুর, নারী, বারাঙ্গনা, মানুষ, পাপ, চোর-ডাকাত, মিথ্যাবাদী, রাজা-প্রজা, সাম্য। এই শিরোনামগুলি থেকেই বোঝা যায় কবি সবার নীচে পড়ে থাকা মানুষের কাছে যেতে

চান, তাদের কথা তুলে ধরতে চান। সমাজপতিরা ঈশ্বরের নামে, ধর্মের নামে, মানুষকে যে পঙ্গু করে রেখেছে, দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা তিনি খুলে দিতে চান। যেমন—'ঈশ্বর' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"শিহরি উঠ না, শাস্ত্রবিদেরে কোরো না কো বীর ভয়
তাহারা খোদার খোদ প্রাইভেট সেক্রেটারী তো নয়
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার, সকলের মাঝে তিনি"!

আবার তিনি লিখেছেন—

"হায়রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়।
মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি।
ওমুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে।
যাহারা আনিল গ্রন্থ কেতাব সেই মানুষের মেরে
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল। মূর্খরা সব শোন
মানুষ এনেছে গ্রন্থ। গ্রন্থ, আনেনি মানুষ কোন।"

নজরুল ইসলাম এই কবিতা লিখেছিলেন ১৯২৫ সালে। আজ থেকে কত বছর আগে। অথচ আজও এই গ্রন্থ কেতাব নিয়ে মারামারি চলছে। এই গ্রন্থ কেতাবের ভয় দেখিয়ে মানুষে মানুষে বিভেদ, সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ জাগিয়ে রেখেছে। ধর্মকে এভাবে বিভেদের হাতিয়ার করার বিরুদ্ধে দুই-এর দশকে তিনি লিখতে পেরেছেন—

"কোথা চেঙ্গিস গজনী, মামুদ, কোথায় কালা পাহাড়
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা দেওয়া দ্বার।"

'নারী' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"সাম্যের গান গাই
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোন ভেদাভেদ নাই
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।"

সেকালে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এমন কথা কে বলতে পেরেছেন? তারপরে নজরুল আরও বলেছেন,

"কোন কালে একা হয়নি জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়াছে শক্তি দিয়াছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।"

এই সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কবি মার্ক্স-এঙ্গেল্সের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো পাঠ করেছিলেন। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর মর্মবাণী এই কবিতাগুচ্ছে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি যে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' পাঠ করেছিলেন তা জানা গেছে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায়। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নজরুলকে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' পড়িয়েছিলেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই এদেশে বাংলায় প্রথম কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর অনুবাদ করেছিলেন, 'সাধারণ স্বত্ত্ববাদের ইশ্‌তেহার' নামে।

'লাঙল' বন্ধ হয়ে গেলে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সম্পাদনায় 'গণবাণী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় নজরুল নিয়মিত লেখক ছিলেন। গণবাণীতে তিনি 'কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল' গানের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন ১৯২৭ সালে। লালপতাকার গান, মে দিবসের গান ইত্যাদি গানেরও অনুবাদ করেছিলেন। সুতরাং পর্যায়ক্রমে নজরুলের সম্পাদিত পত্রিকায় এবং 'গণবাণী' পত্রিকার লেখাগুলো থেকে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশ বোঝা যায় । তাঁর চিন্তায় স্বদেশ চেতনার কাল থেকে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রেরণা এবং পরবর্তীকালে স্বাভাবিকভাবে সাম্যবাদী চিন্তার প্রকাশ দেখা গেছে। কিন্তু তিনি যেমন বিপ্লবী দলের সদস্য ছিলেন না, 'কমিউনিস্ট পার্টি'রও সদস্য ছিলেন না। কিন্তু জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের এবং সাম্যবাদী চিন্তাপ্রসারে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না। নজরুল রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের হওয়ার কাল পর্যন্ত তিনি রাজনৈতিক ছিলেন। ১৯৪১ সালে এ. কে. ফজলুল হক আবার 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নজরুলকে প্রায় জোর করে নবযুগের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণে রাজী করিয়েছিলেন। কিন্তু তখন নজরুল আর সেই নজরুল ছিলেন না। তিনি গানের জগতে মশগুল হয়ে গেছেন। বিশেষত তাঁর রাজনৈতিক সাথীদের থেকেও বিচ্ছিন্ন। তাঁর আর আগের ধার ছিল না। তথাপি পাকিস্তান দাবির ডামাডোলের সময়ে তাঁর লেখা সম্পাদকীয় 'পাকিস্তান না ফাঁকিস্তান' এক দুঃসাহসিক রচনা, যে সম্পাদকীয় প্রগতিশীল মুসলমানদের পাকিস্তান বিরোধিতায় ভাষা দিয়েছে।

তিনি তিনটি উপন্যাস লিখেছেন। এই উপন্যাসগুলোতে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা অনুভব করা যায়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তিনি রচনা করেন 'মৃত্যুক্ষুধা', 'কুহেলিকা', 'বাঁধনহারা'। এই তিনটি উপন্যাসেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। যেমন—'কুহেলিকা' বাংলার বিপ্লববাদী বিদ্রোহ প্রচেষ্টার পটভূমিতে লেখা। যেখানে মুসলমান যুবক যুবতীদের তিনি জাতীয়তাবাদী বিপ্লব প্রচেষ্টায় যুক্ত করেছেন। যদিও এটা বাস্তবে ততটা ছিল না, কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল বাংলার মুসলিম যুবক-যুবতীরা জাতীয়তাবাদী বিপ্লবে যোগদান করুক। 'কুহেলিকা'র নায়কের উক্তি "আমার ভারত এ মানচিত্রের ভারত নয় রে অনীম। আমি তোমাদের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ নই, তবুও আমি শুধু ভারতের জলবায়ু, মাটি, পর্বত, অরণ্যকেই ভালবাসিনি। আমার ভারতবর্ষ ভারতের এই মূক, দরিদ্র, নিরন্ন, পরপদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, গাছপালার ভারতবর্ষ নয়, আমার ভারতবর্ষ মানুষের, যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনতীর্থ। ওরে এ

ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়,—এ আমার মানুষের মহা—মানুষের মহাভারত'। বর্তমান স্বাধীন ভারতে নজরুলের সৃষ্ট চরিত্রের মুখের এই কথাগুলি বারবার শুনতে ও শোনাতে ইচ্ছে হয়।

নজরুলের আর একটা দিক তাঁর সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রবন্ধ, কবিতা এবং গান। যার উল্লেখ না করলে নজরুলকে ভাল করে জানা যায় না। যেমন ১৯২৬ সালে কলকাতায় বার বার দু'বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। সেই দাঙ্গায় নজরুল দাঙ্গাবিরোধী আন্দোলনে সাহসী ভূমিকা পালন করেছিলেন। যুবসমাজকে সাম্প্রদায়িকতার পরিবেশ থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে এবং দাঙ্গাবিরোধী প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য কৃষ্ণনগরে রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। এই রাজনৈতিক সম্মেলন তৎকালীন কংগ্রেসের দ্বারা আহূত হয়েছিল। নজরুল ছিলেন সম্মেলনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, তাদের শিক্ষাদান ইত্যাদিতে দিন রাত পরিশ্রমের মধ্যে তিনি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'। এই গান উদ্বোধন সঙ্গীত রূপে তিনি সম্মেলনে গেয়েছিলেন—

"কাণ্ডারী তব সম্মুখে ওই পলাশীর প্রান্তর
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর।"

এবং

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান"।

একটি গানের মধ্যে যেন বাংলার ইতিহাস প্রকাশ পেয়েছে।

"হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন
কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।"

সুভাষচন্দ্র বসু এই গানটি বড়ই ভালবাসতেন। নজরুলের সম্বর্ধনা সভায় ১৯২৯ সালে তিনি বলেছিলেন—আমি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গেছি, তাদের জাতীয় সঙ্গীত শুনেছি, কিন্তু নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ারের' মতো গান কোথাও শুনিনি।

এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় লেখা নজরুলের দুটি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি 'মন্দির ও মসজিদ' আরেকটি 'হিন্দু-মুসলমান'। 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধে তিনি শুরু করেছেন "মারো শালা যবনদের, 'মারো শালা কাফেরদের'—আবার হিন্দু-মুসলমানী কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপরে মাথা ফাটাফাটি আরম্ভ হইয়া গেল। আল্লার এবং মাকালীর 'প্রেস্টিজ' রক্ষার জন্য যাহারা এতক্ষণ মাতাল হইয়া চিৎকার করিতেছিল, তাহারাই যখন মার খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল দেখিলাম তখন আর তাহারা আল্লা মিঞা বা কালী ঠাকুরানীর নাম লইতেছে না। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি পড়িয়া থাকিয়া এক ভাষায় আর্তনাদ করিতেছে—'বাবা গো, মা গো'। মাতৃ পরিত্যক্ত দুটি বিভিন্ন ধর্মের শিশু যেমন করিয়া একস্বরে কাঁদিয়া তাহাদের মা-কে ডাকে। দেখিলাম, হত আহতদের ক্রন্দনে মসজিদ টলিল না, মন্দিরের

পাষাণ দেবতা সাড়া দিল না। শুধু নির্বোধ মানুষের রক্তে তাহাদের বেদী চিরকলঙ্কিত হইয়া রহিল।"

'হিন্দু—মুসলমান' প্রবন্ধে তিনি শুরু করেছেন এই বলে—"একদিন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল আমার, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে। গুরুদেব বললেন—দেখ্ যে ন্যাজ বাইরের, তাকে কাটা যায়, কিন্তু ভিতরের ন্যাজকে কাটবে কে? ...হিন্দু-মুসলমানের কথা মনে উঠলে বারে বারে গুরুদেবের ওই কথাটাই মনে হয়। সেই সঙ্গে মনে হয় এই ন্যাজ গজালো কি করে? এর আদি উদ্ভব কোথায়? এই সঙ্গে এটাও মনে হয়, ন্যাজ যাদের গজায় তা ভিতরেই হোক বা বাইরেই হোক তারা হয়ে ওঠে পশু। যে সব ন্যাজওয়ালা পশুর হিংস্রতা সরল হয় বেরিয়ে আসে—সিংহরূপে, তাদের তত ভয়ের কারণ নেই, যত ভয় হয় সেই সব পশুদের দেখে—যাদের হিংস্রতা ভিতরে, যাদের শিং মাথা ফুটে বেরোয় নি। ... ভিতরে থাকলে কি রকম হিংস্র হয়ে উঠতে হয়, তা হিন্দু-মুসলমানের ছোরা মারা না দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না।" সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় উত্তেজনার কালে এভাবে খোলাখুলি প্রবন্ধ লেখা কম সাহসের কথা নয়। ১৯২৬ সালের পরে দেশে বহুবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু কোন পত্রিকায় নজরুলের মতো এরকম কেউ লেখেননি, বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে দাঙ্গার বিষয়ে ব্যঙ্গাত্মক তিনি অনেক গান ও কবিতা লিখেছেন, যাতে মানুষের চেতনা ফেরে। এই ব্যঙ্গাত্মক কবিতা গান, তাঁর 'চন্দ্রবিন্দু' পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। লক্ষ করার বিষয় তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার 'চন্দ্রবিন্দু' পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। তাঁর লেখা 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান', 'ভারতের দুই নয়নমণি হিন্দু-মুসলমান' ইত্যাদি গানগুলি আজকের দিনেও ভীষণ প্রাসঙ্গিক।

চিন্তায়, লেখায়, কাজে যেমন ব্যক্তিগত জীবনযাপনেও নজরুল এক ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব। তিনি কোন ধর্ম অনুসরণ করে পারিবারিক জীবনযাপন করতেন না। রবীন্দ্রনাথের মতে ধর্মের পরিচয়ে যে নিজেকে পরিচয় দেয় সে হতভাগ্য। নজরুল বিবাহ করেছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ রীতিতে। হিন্দু বা মুসলমানের কোন ধর্মমতে নয়। প্রমীলাদেবীর বয়স আঠারো বছরের কম ছিল বলে রেজিষ্ট্রি বিবাহ হতে পারে নি। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে বিবাহ হয়েছিল আহ্‌লুল কেতাব মতে। সম্রাট আকবর এই মতে জিজাবাঈকে বিবাহ করেছিলেন। অর্থাৎ তোমার ধর্ম তোমার থাকবে, আমার ধর্ম আমার। আমরা পরস্পরকে ইচ্ছানুরূপ ধর্মপালনে সাহায্য করব। এই আদর্শে তাঁদের সন্তানের নামকরণেও তাঁরা বাঙালীর বাঙালীত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কোন ধর্মশাসনকে নয়। আর বলা দরকার, বিবাহের পূর্বে প্রমীলাদেবীর নাম ছিল আশালতা সেনগুপ্ত। বিবাহের সময়ে নজরুল তাঁর নতুন নাম দেন প্রমীলা। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের প্রমীলা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নজরুলকে মুগ্ধ করেছিল। সেই মুগ্ধতারই প্রকাশ আশালতার প্রমীলা নামকরণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি নজরুলের পাঁচটি পুস্তক ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল। একটি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লালবাজারে নিয়ে গেছিল—তা আর ফিরে আসেনি। সুতরাং পুস্তকটি অপ্রকাশিত। সম্প্রতি নজরুল সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে পুলিশের মহাফেজখানা থেকে উদ্ধারকৃত দলিলপত্রে দেখা যাচ্ছে তাঁর যে পুস্তক প্রকাশ হত সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ দপ্তর তা ইংরাজীতে অনুবাদ করে পুলিশ কমিশনারের কাছে পাঠাতেন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। এইরূপ অনুবাদ এবং তৎসংলগ্ন চিঠি দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছে। দেখা যাচ্ছে পুলিশের ওয়াচার সর্বক্ষণ তাঁকে অনুসরণ করত। তিনি যেখানে যেতেন ছায়ার মতো তাঁব পিছনে থাকত। তিনি কোন বৈঠকে কোন কিছু বললে সেই রিপোর্ট সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ দপ্তরে এসে পৌছত। নজরুল এটা জানতেন। তাই তাঁর কবিতায় তিনি লিখেছেন—

"বন্ধু তোমরা তো দিলে না মূল্য
যাহা কিছু লিখি অমূল্যে সরকার নেন
শুনেছ রাজার প্রহরী ঘুরিছে কার পিছু।"

এ থেকে বোঝা যায় ব্রিটিশ সরকার নজরুলকে ভয় করত। অথচ এই বিদ্রোহী কবি একদা নির্বাক হয়ে গেলেন। ৩৫ বছর অজ্ঞান জীবন কাটালেন। বাংলার সাহিত্য, সঙ্গীত ও রাজনীতির জগতে এটা এক বড় ট্রাজেডি। তবু মানুষ নজরুলকে মনে রাখে, তাঁর গান, কবিতায় উদ্বুদ্ধ হয়, তাঁর মানবতাবোধে নিজেদের বিবেক জাগ্রত করে আজও।

কাজী নজরুলের বিদ্রোহের স্বরূপ

গোলাম কুদ্দুস

জনচিত্তে নজরুলের সবচেয়ে বড় পরিচয় কী? 'বিদ্রোহী' কবি? প্রেমের কবি? গীতিকার ও সুরকার? বহুমুখী নজরুল-প্রতিভা, তবু 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনার পর প্রায় আশি বছর কেটে গেলেও লোকে আজও কেন তাঁকে 'বিদ্রোহী' কবি বলতে ভালবাসে? যেহেতু তাদের জীবনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয়ের পরেও 'বিদ্রোহ' ও বিপ্লবের প্রয়োজন ফুরায় নি। আশি বছর আগে যে উর্বর বা অনুর্বর জমি 'বিদ্রোহী'র জন্ম দিয়েছিল আজো তা বিদ্যমান রয়েছে নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও। মানুষ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের দিকে কান পেতে আছে। বিশ্বের যা অবস্থা তাতে শোষকেরা ঠেলে দিচ্ছে মানুষকে সেইদিকে। ভারতে বৃহৎ পুঁজির মাৎস্যন্যায়ের তাড়নায় চার লক্ষাধিক রুগ্ন শিল্পের শ্রমিকেরাই শুধু বেকার নয়, ছোট পুঁজিপতিরাও বিধ্বস্ত এবং বিরামহীন ভাবে কৃষকেরা জমি হারাচ্ছে।

সেদিনের যে সাম্রাজ্যবাদ নজরুলের রক্তে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, সেদিনের যে সামন্তবাদী শোষণ এবং চিন্তাধারা নজরুলকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল, সে দিনের যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ নজরুলকে বিষহরির ভূমিকায় নামিয়েছিল, আজ সেই সমাজ বাস্তবতা আরো সর্বনাশা রূপ ধরেছে। আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধে বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে মুনাফার পাহাড় জমিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে বিশ্বকে স্বীয় জমিদারীর প্রজা বলে ভাবছে, আজকের সামন্তবাদীরা সেদিনের তুলনায় অধিকতর বুর্জোয়া সমর্থনপুষ্ট হয়ে অধিকতর হিংস্র রূপ ধরেছে এবং সাম্প্রদায়িকতা আজ রাষ্ট্রীয় রূপ ধারণ করেছে।

এই বাস্তব পরিস্থিতিতে মানুষের উপলব্ধিতে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, নজরুলের বিদ্রোহ সংকীর্ণ বিদ্রোহ নয় সর্বাত্মক বিদ্রোহ। নজরুলের শিল্প সাহিত্য তাই চিরায়ত সাহিত্যের রূপ ধরতে চলেছে। যুগে যুগে মানুষের যে বিদ্রোহের ধারা মানুষকে বর্তমান স্তরে উন্নত করেছে নজরুলের বিদ্রোহ তারই শাশ্বত রূপ।

নজরুলের সর্বাত্মক বিদ্রোহ বলতে কী বোঝায়? নজরুল তাঁর 'কৈফিয়তে' লিখেছিলেন "বড় কথা বড় ভাব আসে না মাথায় বন্ধু বড় দুঃখে।" ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। সেদিন নজরুলের চেয়ে বড় কথা বড় ভাব কেউ দেশবাসীকে উপহার দিতে পারে নি। ভারতীয় বাস্তবতায় সেদিন নজরুলের কাব্যবীণার ঝঙ্কারে সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততন্ত্র এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে বাঙময় শিল্প-রূপ দেখা দিয়েছিল তার চেয়ে বড় ভাব বড় কথা সে যুগে আর কিছু ছিল না, আজকের যুগেও কিছু নেই। বিশ্ব জগতের বর্তমান ভাণ্ডারেও এর চেয়ে বড় কিছু নেই। এটাই নজরুলের সর্বাত্মক

বিপ্লবের স্বরূপ। এর জন্য তাঁকে অপরিসীম মূল্য দিতে হয়েছিল। কারণ তিনি হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন না যাদের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করছিলেন, তারা ছিল তাঁর মূর্তিমান শত্রু, তারা ছিল নির্মম, নিষ্ঠুর এবং ভয়ঙ্কর।

যে অবস্থায় একটি লাল পাগড়ী কনস্টেবল দেখলে লোকে দূরে সরে যেত সেই অবস্থায় দুর্দমনীয় নজরুল বের করলেন তাঁর 'ধূমকেতু'। ধূমকেতুর অনেক লেখাই ছিল আইনের চোখে দণ্ডনীয়। অবশেষে 'আনন্দময়ীর আগমনে'র জন্য নজরুলের কানে বেজে উঠল বিসর্জনের বাজনা। বঙ্গভূমিতে তো তখন কবিদলের অভাব ছিল না, কিন্তু কে সাধ করে বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হতে বাধ্য হয়েছিলেন। এতকাল যাঁরা সাম্রাজ্যবাদীদের দরবারে আবেদন নিবেদনের দরখাস্ত নিয়ে যেতেন তাঁরা ভালো ভাবেই জানতেন, তাঁরা জনগণের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করছেন না। তাই তাঁদের কণ্ঠ ছিল মিনমিনে। ধূমকেতুর ভাষায় ধ্বনিত হতে লাগল জনগণের কণ্ঠস্বর। নজরুল তাঁর জ্বালাময়ী 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে সেই কথাই বলেছেন অনন্য ভাষায় ঃ

"আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে তা হবে রাজদ্রোহ। কিন্তু এ যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বানানো—একি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন হয়েছিল, হয়ত সত্য উদাসীন ছিল বলে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুষ্মান জাগ্রত আত্মা মাত্রই বিশেষ রূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায় শাসন ক্লিষ্ট বন্দী সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী? এ ক্রন্দন কি একা আমার? না—এ আমার কণ্ঠে ঐ উৎপীড়িত নিখিল নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয়-হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আত্মার যন্ত্রণা চিৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না। হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারাবাণীটিই আর একজনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।"

এর পরের ঘটনাবলি সর্বজনবিদিত সাধারণ বন্দীদের উপর জেল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে নজরুলের আমরণ অনশন-ধর্মঘট এক হিসাবে অভিনব কারণ এর আগে জেলে অনশন-ধর্মঘট যে কোথাও হয়নি তা নয়, তবে তা ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং অনেক সময় একক ব্যক্তি বিশেষের। নজরুল এদিক দিয়েও পথ প্রদর্শক, নজরুলের এই অনশন-ধর্মঘট সম্ভবত শহীদ যতীন দাশকে প্রভাবিত করেছিল, তিনি ৬৩ দিনের অনশনে প্রাণত্যাগ করেন। নজরুলের ধর্মঘট প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম, চিত্তরঞ্জন দাশের জনসভা, শরৎচন্দ্রের প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি বিরজাসুন্দরীদেবীর ভূমিকা এই ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রেখেছে। তবে এই অনশন-ধর্মঘট গবেষকদের সামনে একটা প্রশ্ন রেখেছে। নজরুল অনশনের ৩৯ দিনের মাথায় বিরজাসুন্দরীর আদেশকে মাতৃআদেশ বলে মেনে নিলেন কেন। আমার মনে হয় না কোনো গবেষক স্রেফ গবেষণা দ্বারা এর হদিস পাবেন। লোকের মনের খবর নেওয়া

যাঁদের কারবার, তারা হয়ত সাংকেতিক ভাষায় কিছু বললেও বলতে পারেন। কুমিল্লার সেই যে তেজস্বিনী মেয়েটি, যাঁর গলায় নজরুল মালা দেবেন বলে এসেছিলেন, তিনি কি সরলা বালিকার মত সে সময় মনের সুখে হেসে খেলে বেড়াচ্ছিলেন? পাঠকেরা অনুমানে বুঝতে পারেন, সেনগুপ্ত পরিবারের পক্ষে তদানীন্তন অবস্থায় ঘরের কথা বাইরে ফাঁস করা লজ্জাজনক হত। সাধে কি নজরুল পরবর্তীকালে আশালতার নাম পাল্টে রেখেছিলেন প্রমীলা, যে প্রমীলা মেঘনাদ বধ কাব্যে তেজের সঙ্গে বলেছিলেন, রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী আমি কি ডরাই সখী ভিখারী রাঘবে? বিরজাসুন্দরীদেবী কি ফাঁপরে পড়ে কলকাতায় ছুটে আসেন নি? আর নজরুলের উপরও চাপের পর চাপ পড়ছিল। প্রচণ্ড বিপ্লবী কেন যে সে সময় জেলে বসে কাতর অন্তরে প্রেমের কবিতা লিখে চলেছিলেন, তার কোনো কি সূত্র থাকতে নেই? যাঁরা বিদ্রোহ আর প্রেমকে দুই মেরু বলে মনে করেন, এ দুয়ের মাঝখানে চীনের প্রাচীর তুলতে ভালোবাসেন, তাঁরা একটু আঁখি মেললেই দেখতে পাবেন নজরুলের প্রেমের কবিতাও বিদ্রোহের আর এক রূপ, বিদ্রোহ ছাড়া এই রকম প্রেমের অভিঘাতে তাঁকে পড়তে হত কী? লিখতে হত কি, বিদ্রোহীর রথের রক্তচূড়া এসে থামল তোমার দুয়ারে?

জেল থেকে বেরিয়ে নজরুল পেলেন জাতীয় বীরের মর্যাদা, অভ্যর্থনা-অভিনন্দনের হিড়িক লেগে গেল। একটা গুরুতর প্রশ্ন মনে জাগে। "নেতাজী সুভাষ ও কমিউনিস্ট আন্দোলন" শীর্ষক গবেষণায় এক গবেষক মন্তব্য করেছেন, সুভাষচন্দ্রের বিশ্ববীক্ষায় (World Outlook) কিছু ত্রুটি ছিল এবং কমিউনিস্টদের জাতীয় বীক্ষায় (National Outlook) কিছু অভাব ছিল, অন্যথায় ভারতের ইতিহাস অন্যরকম হত। এই ইঙ্গিত মারাত্মক। কিন্তু মিথ্যা কী? কমিউনিস্টদের সংখ্যা তখন ছিল মুষ্টিমেয়, নজরুলের পাশে দাঁড়িয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে অগ্রসর হলে কি তাঁরা পথের সাথীর সংখ্যা যথেষ্ট বাড়াতে পারতেন না? নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনায় উদ্দীপ্ত জনগণের পুরোভাগে এসে দাঁড়ানো কি একেবারেই অসম্ভব ছিল? চীন এবং ভিয়েতনামের নেতারা যাঁর জন্য সাফল্য অর্জন করেন, ভারতেও কি তেমন ঘটতে পারত না? এর বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি খাড়া করা যায় এবং এ কথা তো সত্য যে, ভারতে অনেক আগে থেকে বুর্জোয়া এবং তাদের কংগ্রেস পার্টির উত্থান ঘটেছিল, যেমনটি ভিয়েতনাম বা চীনে ঘটে নি। এতদ্‌সত্ত্বেও হয়ত এই আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে যে কমিউনিস্টরা নিজেদের মধ্যে সে সময় গুটিয়ে না থেকে নজরুলের মতই গণ্ডি ভেঙে ব্যাপকতর জন সমর্থনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারতেন।

সে-সময়ের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে, নজরুল তাঁর পক্ষ থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। ১৯২৫-এ কৃষ্ণনগরে বাস কালে আমরা নজরুলের মধ্যে

বিদ্রোহী থেকে বিপ্লবীতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি। তিনি এখানে সংগঠকে পরিণত হচ্ছেন। তিনি এখানে শ্রমিক কৃষকদের একটা পার্টি গঠনে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর বন্ধু শৈলজানন্দকে এক পত্রে লিখেছেন, "এ যজ্ঞের ভার মাত্র আমাকে ও হেমন্ত সরকারকে বহন করতে হচ্ছে, নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাচ্ছি না, সম্মেলনের মাত্র এক মাস বাকী।" জানা গেছে, এই নতুন পার্টির কর্মসূচীও নজরুলকে আবদুল হালিমের সঙ্গে মিলে রচনা করতে হয়েছিল। নজরুল মস্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন, কথা ও কাজে অসম্ভব মিল ঘটিয়েছেন। কে বলে তাঁকে বোহেমিয়ান? কতখানি একাগ্রতা থাকলে একটা পার্টির কর্মসূচী রচনার কাজে হাত দেওয়া যায় সহজেই বোধগম্য অথচ তাঁর বন্ধুদের অনেকেই ভেবেছিলেন, নজরুল তাঁর প্রাণোচ্ছলতার জন্য এলোমেলো অগোছালো। এত কাজের মধ্যেও সে সময় তাঁকে পার্টি-সম্মেলনের জন্য গান লিখতে হয়েছে। আবার এর কিছুদিন পরেই কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনেই সর্বপ্রথম গীত হয় 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু'।

নজরুলের অবসর ছিল না। অব্যবহিত পরেই 'লাঙল' পত্রিকা বের হয়, যার প্রধান পরিচালক হন নজরুল। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার, এই কাগজে লেখা হয় যে, উপরোক্ত পার্টির মতামতের সঙ্গে যাঁরা এক মত, তাঁরা কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে যেন যোগাযোগ করেন।

বলা বাহুল্য, 'লাঙলের' সূচীমুখ ছিল জমিদার, জোতদার, মহাজন প্রমুখ সামন্তবাদীদের বিরুদ্ধে। যারা কৃষকদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অতি সামান্য 'সেস' দেওয়ার প্রস্তাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, যারা দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্ট নাকচ করে তাঁর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ করে দিতে সাহায্য করেছিল। তারা কৃষক জাগরণকে কি নর-নারায়ণের উত্থান বলে 'লাঙল'কে অভিনন্দন জানাবে? তারা বরং বলেছিল, ছোটলোকদের বাড় বাড়ন্ত হচ্ছে, দেশে আর টিকে থাকা যাবে না। যারা নজরুলের মত স্বাধীনতার জন্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আপসহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়নি এবং হতে চায়নি, তারাই শ্রমিক কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে বলতে থাকে যে, আগে চাই স্বাধীনতা, তারপর অন্য কিছু। সুভাষচন্দ্র বা জওহরলালের মত দু-চারজন ছাড়া স্বীকার করতে চাইতেন না যে, কংগ্রেসের মধ্যে শ্রমিক কৃষক সংগঠনগুলির যৌথ যোগদান স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে। আর মুসলিম মৌলভী-মোল্লা যারা নজরুলকে 'কাফের' আখ্যা দিয়েছিল, সেটা শুধু কবির ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য নয়, তারা নজরুলের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিল কৃষক আন্দোলন চাগিয়ে তোলার জন্যও বটে, ওটা যে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে আক্রমণের চেয়েও ভয়ঙ্কর, কারণ ওতে যে তাদের সামন্ততান্ত্রিক কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাত নেমে আসতে পারে। তারা দেশবন্ধুর নেতৃত্বে তারকেশ্বরের সামন্ততান্ত্রিক দুশ্চরিত্র মোহান্তের বিরুদ্ধে নজরুলের দুর্দান্ত অভিযানও লক্ষ্য করেছিল। বহুকাল ধরে তারকেশ্বরের মন্দিরে সন্তান কামনায় যে সব নারী আসত, তাদের কারো কারো উপর মোহান্তরা পাশবিক

অত্যাচার চালাত। মোহান্তদের বিপুল সংখ্যক লাঠিয়ালের ভয়ে সাধারণ মানুষ সব জেনে শুনেও চুপ করে থাকত। এ নিয়ে অনেক খুন জখম হয়েছে কিন্তু প্রতিকার হয় নি। এমন একটা সময় এলো যখন দেশবন্ধুর নেতৃত্বে প্রতিকারের চেষ্টা হল। তিনি নজরুলকে চারণকবি রূপে প্রচারের দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের অন্যতম সত্যাগ্রহী এবং প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন নজরুলের অনুজপ্রতিম প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নিম্নোক্ত বর্ণনা লক্ষণীয়।

"কবি দেশবন্ধুর অনুরোধ মেনে যে গানটি লেখেন সেটির নাম 'মোহ-অন্তের গান'। গানটি নজরুল তাঁর বজ্রকণ্ঠে গেয়ে বেড়াতে লাগলেন হুগলী জেলার গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে এবং সারা বাংলাদেশে...এর ফলে সত্যাগ্রহে হাজার হাজার তরুণ, মধ্যবয়সী এবং বৃদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনের পতাকার নীচে এসে সামিল হয়েছিল। গানটির অমিত শক্তিসম্পন্ন অগ্নিময় বাণীতে শিবের ত্রিশূলচ্ছটা যেন বিচ্ছুরিত হত শ্রোতাদের মধ্যে। শ্রোতারাও শিরদাঁড়া খাড়া করে শপথ নিত মোহান্ত নিধনের।

মোহান্তর সহস্রাধিক লাঠিয়াল ছিল। এর সর্দার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ছিলেন যেমন দুর্বার চরিত্রের লোক, তেমনি নিষ্ঠুর। মোহান্তের জন্য তিনি করেন নি এমন কাজ ছিল না।

"তারকেশ্বর মন্দিরের মাঠে সত্যাগ্রহের প্রস্তুতি সভা। উপস্থিত ছিলেন দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, স্বামী বিশ্বানন্দ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, নজরুল প্রমুখ। আমরা স্বেচ্ছাসেবকেরা তো আছিই। দেশবন্ধু নজরুলকে উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইবার আহ্বান জানালেন। ওদের সহস্রাধিক লাঠিয়াল সহ সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় সভাকে ঘিরে রয়েছেন। লাঠিয়ালরা মন্দিরের নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে সভায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। সভাস্থ সকলেই শঙ্কিত হয়ে আছে কখন লাঠিয়ালরা ঝাঁপিয়ে পড়ে সভাকে তচনচ করে দেবে। এর পূর্বে এই আন্দোলন সংক্রান্ত সভা এখানে কেউই করতে পারে নি। নজরুল দৃপ্ত ভঙ্গিমায় কেশর (বাবরি) ফুলিয়ে ঝাঁকিয়ে গান ধরলেন 'জাগো আজ দণ্ড হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী' বলে। লাইনের পর লাইন গেয়ে যাচ্ছেন, সভাস্থ লোকেদের চোখে মুখে দুঃসাহসিকতার চিহ্ন ফুটে উঠছে। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চের এক কোণে দাঁড়িয়ে। দেশবন্ধু মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছেন, কিন্তু সত্যবাবু কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে। গান শেষ হলে সত্যবাবুই বললেন, 'কাজী গানটা আবার গাও'। আবার নজরুল গান ধরলেন। উদ্দীপনাময় সভায় উৎসাহের জোয়ার বয়ে গেল। নজরুলের কণ্ঠের দৃঢ়তায় সুর দ্বিগুণ হয়ে উঠল, লাঠিয়ালরা হতবাক। গান শেষ হলে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় নজরুল ও দেশবন্ধুর পায়ের কাছে নিজের হাতের লাঠি রেখে ঐ সভায় মোহান্তের সর্বনাশের শপথ নিলেন। আন্দোলনের মোড় ঘুরে গেল, বেশির ভাগ লাঠিয়াল নিয়ে সত্যবাবু বাল্মিকীর মত সত্যাগ্রহে সামিল হলেন।"

এই অমিত শক্তিধর সমাজ সচেতন আদর্শপুরুষ ও শিল্পী সম্পর্কে একজন

খ্যাতিমান সাহিত্যিকের উক্তি হচ্ছে, "তাঁর কাব্যে হৈ-চৈ অত্যন্ত বেশী...এই ধরনের কবি হওয়ার বিপদ এই যে জোর আওয়াজ হতে থাকলে মনটা খুশি হয়, সে আওয়াজ যে ফাঁকা আওয়াজ সে খেয়াল একেবারেই থাকেনা। নজরুলের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি—অনেক লেখা তিনি লিখেছেন যাতে শুধু হৈ চৈ আছে, কবিত্ব নেই।" এই ধরনের খ্যাতিমানদের সম্বন্ধেই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিলেন, "আমার বিশ্বাস তোমরা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করেছ। আর পড়ে থাকলেও রূপ ও রসের সন্ধান করনি, অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছ মাত্র"। স্বয়ং নজরুল বোধ হয় এদের সম্বন্ধে সচেতন হয়েই লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন, "আমার বিশ্বাস কাব্যকে ছাড়িয়ে উদ্দেশ্য বড় হয়ে উঠলে কাব্যের হানি হয়।" আসলে নতুন যুগে নজরুল যেভাবে কাব্যকে গণজীবনসংগ্রামের সঙ্গী করে তুলেছিলেন তার আনুষঙ্গিক আঙ্গিক, চিত্রকল্প, এবং কবিত্ব অনুধাবনের জন্য যে মানসিকতা এবং নতুন নন্দন তত্ত্বের প্রয়োজন, তা তাঁর সমালোচকদের আয়ত্ত্বাধীন ছিল না এবং আজো নেই। ফলে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এঁরা দ্রুত কবিত্ব শক্তি হারিয়ে 'কোটারী' বদ্ধ মানুষে পরিণত হয়েছেন ও হচ্ছেন এবং জনস্বার্থ বিরোধী 'এলিট'দের প্রিয়পাত্র হতে চেষ্টা করেন। এঁরা নিজেদের সূক্ষ্মরসের রসিক বলে প্রচার করতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না, ধনপতিরাও এঁদের জেনে শুনে বরণ করে থাকেন। না করবেনই বা কেন, সূক্ষ্মরসের নামে যদি অতি স্থূল স্বার্থ সাধিত হয়।

'এলিট' সমালোচক বৃন্দের চেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ নজরুল ইসলামকে অনেক ভালোভাবে চিনতে পেরেছিল। গোয়েন্দা পুলিশের যে সব প্রতিবেদন প্রকাশ পেয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে তাদের চোখে নজরুল আদৌ ক্ষণিকের স্ফুর্তিবাজ আড্ডাবাজ নন অত্যন্ত বিপজ্জনক মানুষ। নজরুলের গতিবিধি ছিল পুলিশের নখাগ্রে, খুঁটিনাটি রিপোর্ট দিয়েছে তারা, নজরুলের পিছু নিয়েছে তারা বছরের পর বছর। নজরুলও তা বিলক্ষণ জানতেন এবং সজাগ থাকতে হত তাঁকে। নজরুলের বহিরঙ্গ দেখে পুলিশ ভোলেনি, তাঁর কিছু আপাত বৈপরীত্যমূলক কাজের মধ্যে পুলিশ হ্যামলেটের "There is a system in his madness" দেখতে পেত। নজরুলের প্রাণবন্ত লেখনি যেভাবে দেশের মরা মানুষকে জাগিয়ে তুলছিল, তাতে ব্রিটিশ সরকার দিশেহারা হয়ে গদ্য-পদ্য গ্রন্থগুলিকে একের পর এক নিষিদ্ধ করছিল। একদিকে নিদারুণ দারিদ্র্য অন্যদিকে পুলিশের শকুনি-চক্ষু এবং হৃদয়হীন সমালোচকদের আক্রমণ সবই একসঙ্গে নজরুলকে সহ্য করতে হয়েছিল হাসিমুখে এবং বন্ধুদের সাহস ও ভরসা জুগিয়ে।

নতুন পার্টি গঠনের কাল থেকে 'বিদ্রোহী'র যে 'বিপ্লবী'তে উত্তরণ ঘটল তা নিয়ে চুলচেরা বিতর্কের অবকাশ নেই, কেননা নজরুলের একটা বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তিনি যুদ্ধের সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গে সাম্যবাদকেও অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রহণে উদগ্রীব ছিলেন। নতুন পার্টির মুখপত্র 'লাঙল'-এর এক ঘোষণায় বলা হল—

যাঁরা পার্টির মুদ্রিত কর্মসূচীতে আস্থাবান তাঁরা যেন কাগজের প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এটা বাস্তবিকই স্মরণীয় ঘটনা। যাঁরা নজরুলের বোহেমিয়ান স্বভাবকে বাড়িয়ে দেখাতে ব্যস্ত তাঁদের মানসিক আলস্য ত্যাগ করে ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হবে। এর ফল কী দাঁড়িয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই গবেষণা সাপেক্ষ। আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁকে লেখা সুদীর্ঘ পত্রে নজরুল জানাচ্ছেন, "আমার শক্তি স্বল্প, তবু এই আট বছর ধরে আমি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক-শ্রমিক-তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি. লিখেছি, বলেছি, চারণের মত পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি।"

শুধু শ্রমিক, কৃষক নয়, নজরুলের জীবনের এই পর্যায়ে নারী প্রসঙ্গে ও তাঁর বিখ্যাত উক্তিগুলি উচ্চারিত হয়। বিশ্বের আর কোন কবি কী বারাঙ্গনাকে মা বলে সম্বোধন করেছেন? পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি এক শীতের রাত্রে এক বারাঙ্গনাকে প্রতীক্ষা করতে দেখে তাকে 'মা' বলে সম্বোধন করে হাতে কয়েকটি টাকা গুঁজে দিয়ে ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন। নজরুল বোধ করি আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে প্রতিভাময়ী কিছু বারাঙ্গনাকে শিল্পীর মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পরিশ্রম সহকারে গানের তালিম দিয়েছিলেন।

নজরুল যেভাবে সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাতে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার জালে ধরা পড়তে পারতেন। সাম্রাজ্যবাদীদের হয়ত অন্য রকম হিসেব ছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছিল ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁকে কয়েদখানায় পাঠিয়ে, মীরাট মামলায় তাঁকে জড়ালে আরো বড় প্রতিবাদের যে ঝড় উঠত, সেটা ধুরন্ধররা আঁচ করেছিল নিশ্চয়। এই মামলার পর নজরুলের সঙ্গে সাম্যবাদীদের যোগসূত্রে বাধা সৃষ্টি হয়, সে বাধা পরে কেন অতিক্রম করা যায়নি তা একটা আলোচ্য বিষয় হতে পারে। নজরুলের অগ্নিবর্ষী লেখনি স্তব্ধ হয়নি। ১৯৩০-এ প্রকাশিত হয় 'প্রলয় শিখা'। নজরুলের ভাগ্যে এল আবার কারাদণ্ড। গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে হাইকোর্টে আপীল মামলায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আপত্তি না করায় নজরুল মুক্তি পেলেন।

কথিত আছে, মহামতি লেনিন সঙ্গীতের একনিষ্ঠ ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও একদা গোর্কির বাড়িতে বিটোফেনের সুর-মাধুর্যে নিমগ্ন হওয়ার পর সহসা উঠে পড়েন কেননা কদর্য পৃথিবীর চিত্র নাকি ম্লান হয়ে আসছিল, এতে তিনি কর্তব্য কর্মচ্যুত হতে পারেন। আর বিদ্রোহী-বিপ্লবী নজরুল তো সঙ্গীত রচনা ও সুর সৃষ্টির গভীরে ডুব দিয়েছিলেন, তবু তিনি তখনো মানুষের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সভা সমিতিতে যোগ দিয়েছেন, নাটকের জন্য বিপ্লবী গদ্য লিখেছেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় খাঁটি বিপ্লবী কর্মীর মতই প্যাকিস্তান আন্দোলনকে বাধা দেওয়ার জন্য নব পর্যায়ের দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছেন। সেই সময় তাঁকে গদ্যে-পদ্যে সম্পাদকীয় লিখতে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একদিন গানের জগতে সব

কিছু ভুলে ডুবে থাকার জন্য নিজের কঠোর আত্ম-সমালোচনা করে লিখলেন ঃ

কোন মায়া ঘুমে ঘুমিয়েছিলাম, বুঝি সেই অবসরে ক্ষুদ্রের দল বৃহতের বুকে বসে উৎপাত করে। কঠিন পারিবারিক ও দৈহিক বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি পাকিস্তানকে বাধা দেওয়ার শেষ চেষ্টা করেছিলেন—তাঁর বিপরীত মেরুতে বিরাজ করছিলেন আর এক কবি যাঁকে বলা হয় পাকিস্তান আইডিয়ার জনক। দুই জন কবিই ছিলেন ঈশ্বর ভক্ত, অথচ উভয়ের মধ্যে কী আকাশ পাতাল তফাৎ।

নজরুল তাঁর বিদ্রোহী সত্তা থেকেই হয়ে উঠেছিলেন ন্যাচরাল ডায়ালেক্টিসিয়ান, যথা,

শিকল পরেই শিকল তোদের
করব রে বিকল,

বা ক্ষুধা থেকে আনব সুধা,

কিংবা লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির চূড়া।
সেই লাঠি কাল প্রভাতে করিবে শত্রুদুর্গ গুঁড়া।

অথবা, বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী
যা হোক একটা কিছু দাও হাতে, একবার মরে বাঁচি।

এরকম একশ দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এই ন্যাচরাল ডায়ালেক্টিসিয়ানের হাতে যদি মার্কস এঙ্গেলসের ডায়ালেক্টিক্যাল মেটিরিয়ালিজ্ম এসে পৌঁছত, তাহলে যে কী যাদু মিলে যেত কল্পনা করা দুরূহ। ডায়ালেক্টিক্স লেনিনের ভাষায়, Dialectics is Algebra of Revolution অর্থাৎ ডায়ালেক্টিক্স বিপ্লবের বীজগণিত। সেটা হাতের কাছে পেলে চির বিপ্লবী নজরুল যে সহজেই আত্মস্থ করতে পারতেন এবং বিদ্রোহীর চেয়েও মহত্তর কবিতাবলির জন্ম দিতে পারতেন সে সম্বন্ধে বর্তমান লেখকের সন্দেহ নেই। কেননা, ডায়ালেক্টিক্সের বিচারে বিশ্বে শুধু ক্রমবিকাশ ঘটে না নিয়ত উল্লম্ফন বা বিপ্লব ঘটে। বিপ্লবই বিশ্বের নিয়ম, ব্যতিক্রম নয়। সব কিছুই যদি ভিতরের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দ্বারা বিকশিত হয়, তা হলে উপরওয়ালার তত্ত্ব বাতিল হয়ে যায়। নজরুল যথাসময়ে বৈজ্ঞানিক ডায়ালেক্টিক্সের সন্ধান পেলে আধ্যাত্মিকতার করাল গ্রাস থেকে ছাড়া পেয়ে স্ফূর্তিতে স্থিতধি থাকতে পারতেন এবং চির বিদ্রোহী পেতেন চিরমুক্তি। নজরুলের ক্ষেত্রে তা না ঘটলেও তিনি যে ভাবে মর্ত্যের ঈশ্বরদের বিরুদ্ধে আঘাত হানছেন, তাতে ঊর্ধ্বের ঈশ্বরের বয়ঃসীমা সংকুচিত হয়েছে।

নজরুল ইসলাম ঃ রাজনীতি ভাবনা

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

"*Art is one of the conditions of man's realisation of himself, and in its turn is one of the realities of man*."—Christopher Caudwell

শিল্প সাহিত্য বাস্তবতার অভিযোজনে ব্যক্তিচিত্তের উপলব্ধির অভিজ্ঞতার ফসল। সমস্ত কিছুর মতই সাহিত্যও নিয়মের ফল। শিল্প-সাহিত্য সমাজ আর্থ-রাজনীতি বিচ্ছিন্ন কোনো স্বাধীন স্বতন্ত্র সত্তা নয়। সাধারণ ভাবে মানুষ যে সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিবেশে বাস করে, তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে সাহিত্য রচিত হয় তাকে অনেক সময় যথার্থ সাহিত্য বলে মনে হয়। স্থিতাবস্থা বজায় রাখার সাহিত্যে নানা ছলনার, মোহের জাল, বিভ্রান্তি বা অতিবিপ্লবী বুলি এমনভাবে ভাষার প্রকৌশলের মাধ্যমে ছড়ানো হয় যে লোকে তাকেই যথার্থ সাহিত্য বলে মনে করে। আর সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে যে সাহিত্য তাকে অনেকে প্রচারধর্মী সাহিত্য আখ্যায় অভিহিত করেন। যে অভিযোগ উঠেছিল নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে। অথচ নজরুল ইসলামের শিল্পচৈতন্য গড়ে উঠেছিল তাঁর সমসাময়িক কাল পরিবেশের অভিজ্ঞতায়—যে অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর ছিল না। নজরুল ইসলামের শিল্পচেতনা কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, তাঁর মন যুগপৎ সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সামগ্রিকতা দ্বারা এবং সমাজের অন্যান্য সম্পর্কের অন্বয়ে গঠিত বলে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা আমাদের অভিনিবেশের দাবি রাখে। তিনি সমাজ রাষ্ট্রের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাঁর সৃষ্টিকর্মে মানবিকতা ও জীবনের সজীব রূপায়ণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তাঁর সাহিত্য কালজ হয়েও কালোত্তর। নজরুল ইসলামের রাজনীতি ভাবনা কোনো যান্ত্রিক ভাবনা প্রসূত নয়। তার উৎসে আছে বাস্তবতাবোধ, মানবপ্রীতি, নিগৃহীত মেহনতীদের জন্য দরদ; সর্বোপরি নতুন পৃথিবী গঠনের অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা।

নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবনের (১৯১৯-১৯৪২) দীর্ঘ তেইশ বছর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস নানা অস্থির ভাবতরঙ্গের আবর্তে মথিত। নজরুলের সাহিত্য জীবনের এই পর্বে বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রাম, বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫), কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসন দাবি (১৯০৬), রাজদ্রোহ, সভা ও সংবাদ দমন আইন (১৯০৮), সোভিয়েত বিপ্লব (১৯১৭), মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার ও তজ্জনিত অসন্তোষ (১৯১৯), অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০), নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন (১৯২০), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০), পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি (১৯২৯) চট্টগ্রামে সূর্যসেনের নেতৃত্বে

সশস্ত্র বিপ্লব (১৯৩০), গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩০-৩২), সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (১৯৩২), ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা (১৯২১), খড়্গপুর রেল ধর্মঘট (১৯২৬), জামসেদপুর লৌহ ইস্পাত কারখানায় শ্রমিক-ধর্মঘট (১৯২৮), বোম্বাই-এর বস্ত্রকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট (১৯২৯), মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯), উক্ত মামলার রায় প্রকাশ (১৯৩৩), দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯), ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২) প্রভৃতি ইতিহাস আলোড়নকারী ঘটনাগুলি সংঘটিত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের এই ভাবোদ্বেলিত পর্বে নজরুল ইসলামের কাব্যসাধনা। ফলত নজরুলের কাব্যে এক জাতীয় সমাজ—আর্থ-রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রতিফলিত হয়। নজরুলের রাজনৈতিক মতাদর্শ কোনো একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত ছিল এমন মনে হয় না। তিনি চেয়েছিলেন কুসংস্কারমুক্ত, শাস্ত্রানুগত্যহীন, দুর্নীতি, দুঃশাসন ও শোষণ-পীড়নমুক্ত সমাজ। আর এ চাওয়া যে কোনো সমাজসচেতন মানুষের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু সেই ব্যবস্থা রূপায়ণের জন্য কোন জাতীয় পদ্ধতি অবলম্বিত হওয়া উচিত সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ তাঁর ছিল না। একথা বলা যাবে না তিনি মানবদরদী, মানবতায় আস্থাশীল, সংবেদনশীল, পরদুঃখকাতর ছিলেন বলেই সাম্যবাদী চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নজরুল যখন বলেন, 'আমি মানি নাকো কোন আইন', তখন তাঁকে নৈরাজ্যবাদী মনে হয়। তাঁর মনে এ-জাতীয় চিন্তা উদয়ের কারণ হলো, নজরুলের স্বভাবত বন্ধন ভীরুতা ও আদিম আরণ্য স্বাধীনতার তথা স্বেচ্ছাচলনের প্রতি অনুরাগ। সুতরাং তাঁকে নৈরাজ্যবাদীও বলা. যাবে না—যদিও তাঁর অনেক রচনাই উক্ত মানসিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। নজরুল সম্পূর্ণত সাম্যবাদী নন; ১৯২০—২১ থেকে ১৯৩০-৩২ পর্যন্ত নজরুল যাঁদের সঙ্গে মিশেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাম্যবাদের মন্ত্রে ইতিমধ্যে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাছাড়া এই পর্বে রুশবিপ্লবও তরুণ রাজনৈতিক কর্মী, কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের আকৃষ্ট করেছিল। নজরুলের সমগ্র রচনাবলীর আলোচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে যে, তিনি পুরোপুরি মার্কসবাদী হয়তো ছিলেন না—যদিও তাঁর কাছে মানুষের কথাকার দস্তয়ভস্কি ও গোর্কি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয় লেখক। তিনি 'ধূমকেতু' প্রভৃতি পত্রিকা পরিচালনা করলেও সাম্যবাদের মূল মর্ম তাঁর সম্যক অধিগত ছিল না। নজরুল প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি চর্চা শুরু করেন সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকার মাধ্যমে। ১৯২০-তে এ. কে. ফজলুল হক প্রতিষ্ঠিত সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকা সম্পাদনাকালে পত্রিকার নীতির প্রতি আনুগত্য জানিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়। ১৯২২-এর ১২ আগস্ট 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং সেখানে নজরুলের স্বাধীন মত ও পথের প্রকাশ ঘটতে থাকে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার জন্য নজরুলকে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হয়। ১৯২১-এর নভেম্বরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সময় নজরুল মুজফফ্‌র আহ্‌মদের সঙ্গে থাকলেও তিনি কখনও কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হননি। এ

প্রসঙ্গে মুজফফ্‌র আহ্‌মদের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—"৩/৪ সি তালতলা লেনের বাড়িখানা আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বাড়ির উপর ঘরখানাতে বসেই ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে আমরা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। পার্টি গঠনের এই প্রথম পরিকল্পনায় নজরুলও আমার সঙ্গী ছিল। অবশ্য পরে সে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য কখনও হয়নি।"[১] ১৯২৫ সালে নজরুল ইসলাম, হেমন্তকুমার সরকার, কুতবুদ্দীন আহ্‌মদ ও শামসুদ্দীন হোসায়নের সক্রিয় উৎসাহে ও উদ্যোগে 'The Labour Swaraj Party of Indian National Congress' নামে একটি সমিতি গঠিত হয় এবং 'লাঙল' পত্রিকাটি এর মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রধান পরিচালক ছিলেন নজরুল ইসলাম। এ পত্রিকাতেও সাম্যের বাণী উচ্চারিত হয়। নজরুল ইসলাম শ্রমিক কৃষক, চোর, ডাকাত, কুলি, মজুর প্রভৃতি প্রায় সকলকেই আপন মনে করতেন—এ সম্পর্কে তাঁর বহু কবিতার উদাহরণ আমাদের মনে আসবে। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় নজরুল ইসলাম শিল্প-বাণিজ্য ও ব্যবসা ক্ষেত্রে বুর্জোয়া শোষণ সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তার সঙ্গে মার্কসীয় মতবাদের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়—'রেল, স্টীমার, বিদ্যুৎ, গাড়ি, কলকারখানা মানুষের আরামের জন্য সৃষ্টি হইতে লাগিল। আর কোটি কোটি মানুষ অপেক্ষাকৃত মুষ্টিমেয় প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্য পশুর কাছে দাসখৎ লিখিয়া দিতে বাধ্য হইতে লাগিল। কোটি কোটি জীবনকে দানব শৃঙ্খলে বন্ধ করিতে লাগিল"। 'লাঙল' পত্রিকায় শ্রমিক সমিতির কর্মসূচী, আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছিল নজরুলের লেখনীতে—"হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে মজুর ভাইরা, তোমার হাতের এ লাঙল অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক, উলটে ফেলুক। আনো তোমার হাতুড়ি, ভাঙো এ উৎপীড়কের প্রাসাদ, ধূলায় লুটাও অর্থ পিশাচ বলদর্পীর শির। ছোঁড় হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধর তোমার বুকের রক্তে মাখা লালে লাল ঝাণ্ডা। যারা তোমাদের পায়ের তলায় এনেছে, তাদের তোমরা পায়ের তলায় আনো।" অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, সর্বহারা, ফণিমনসা, সিন্ধু হিন্দোল, প্রলয়শিখা প্রভৃতিতে নজরুলের সামাজিক আর্থিক রাজনৈতিক শাস্ত্রীয় প্রভৃতি সর্ববিধ অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত এবং স্বদেশ ও স্বজাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে সমগ্র পৃথিবীতে সমাজ পরিবর্তনের যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, নজরুল সেই আকাঙ্ক্ষাকে বাংলাদেশে মূর্ত করে তুললেন তাঁর কবিতা গান গল্প উপন্যাসে। তিনি-মুসলিম জাগরণের চেয়েও হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রয়াসে অন্যতম উদ্যোগী। তাঁর কাব্যে মনুষ্য মহিমা অনুপস্থিত নয়। বিদ্রোহ বিপ্লব সংগ্রামে নজরুল ইসলাম আপসহীন শিল্পী। নজরুলের কবিমানসে এই সমস্ত চিন্তার প্রতিফলনের মূলে আছে তাঁর নিজস্ব সামাজিক অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা ও সমাজ পরিবেশ সচেতনতা। স্বাভাবিক মানবতাবোধ ও ন্যায় জ্ঞান নজরুলের সাম্য প্রেরণার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল। রাশিয়ার বলশেভিকদের সাফল্যের ফলে মার্কস-

এঙ্গেল্‌স-লেনিনের মতবাদের প্রভাবে একটা বিপ্লবী চেতনা ভারতবর্ষেও মন্থর গতিতে প্রসার লাভ করেছিল। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, এমনকি সাম্যবাদ, সমাজবাদও আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার মানুষকে নতুন স্বপ্নে, আশায় ও উদ্দীপনায় সাহসী ও উদ্যোগী করে তুলেছিল। যন্ত্রশক্তির ও প্রযুক্তির প্রসারে পুরোনো বিশ্বাস সংস্কারের নীতি নিয়মের মূল্যবোধ হচ্ছিল শিথিল। "রাজনীতিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নতুন যুগের হাওয়া বইয়ে দিয়েছিলেন নজরুল ইসলামই। কবির চিন্তাচেতনায় রাজনীতিক মত পথ কিংবা সাধন পদ্ধতি কোনও সুস্পষ্ট মূর্তরূপ না পেলেও এক যুগ ধরে তিনি উচ্চকণ্ঠে উদাত্ত স্বরে বিদ্রোহের, বিপ্লবের, সংগ্রামের বাণী অবিরাম অবিশ্রাম উচ্চারণ করেছেন। স্বীকার করতেই হবে যে বিপ্লবের একটা প্রথম রঙিন এষণা তাঁর দেশ। তাঁর কণ্ঠেই যান্ত্রিক-সামাজিক কুসংস্কারের, শোষণ-পীড়নের, দুর্নীতি-দুঃশাসনের সমকালীন জীবনবোধ নীতি-আদর্শের প্রতিকার লক্ষ্যে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে।"[২] নজরুল মার্ক্সীয় তত্ত্ব ভালভাবে অনুশাসন ও অনুধাবন না করলেও তাঁর চিন্তা-চেতনা উপলব্ধি ও উক্তিতে মার্ক্সবাদের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। "নজরুলের সাম্য কেন মার্ক্সীয় সাম্য নয় একথা বুঝতে হলে, মার্কসীয় সাম্যবাদের স্বরূপ জানা প্রয়োজন। মার্ক্স প্রচারিত সাম্যবাদ কতকগুলি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সূত্রগুলো হলো শ্রেণী সংগ্রাম, ধনসঞ্চয় ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

মনুষ্য সমাজকে কার্ল মার্ক্স ধনী ও নির্ধন, মালিক ও শ্রমিক দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো বা সাম্যবাদের ইশতেহারের শুরুতেই মার্ক্স শ্রেণী সংগ্রামের মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন। মার্ক্স তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ক্যাপিটাল-এ দেখিয়েছেন মানব সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার বিরাট অসমতা। ধনিক ও শ্রমিক এই দুটি শ্রেণী পরস্পর বিরোধী স্বার্থের প্রতিভূ। তাই তাদের মধ্যে সংঘাত ও সংগ্রাম অনিবার্য। মার্ক্সের মতে ধনবাদ সমাজ বিকাশের অপ্রতিরোধ্য পরিণতি এবং তা সমাজ বিবর্তনের ধারায় একটি অস্থায়ী স্তর। সামন্তবাদের মত ধনবাদও একদিন পরাজিত ও বিলুপ্ত হবে।

ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সম্পত্তি নিশ্চয় জমা হতে থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিস্বত্ব শ্রেণী বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ। ব্যক্তিস্বত্বের এই শ্রেণীগত রূপই এই সমাজের ধনোৎপাদন প্রণালীর মূল নিয়ন্তা। ধনতন্ত্রের স্বধর্ম উৎপাদিকা সম্পত্তির অধিকারী শ্রেণীর উত্তরোত্তর সংখ্যা সংকোচ। তার এই বৈশিষ্ট্যই কালে তার ধ্বংসের কারণ হয় এবং উত্তর ধনতান্ত্রিক যুগে অধিকারচ্যুত জনগণের মধ্য হতে অধিকারের পুনঃপ্রসারণ ঘটে। প্রাচীন সমাজ যখন নতুন সমাজকে জন্ম দেয়, তখন শক্তি হয় ধাত্রী। এ শক্তি অর্থনৈতিক।

অর্থনীতিই মার্ক্সের মতে সমাজ ব্যবস্থার মূলশক্তি, মানুষের ধর্ম, নীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইনকানুন যুগে যুগে আর্থিক ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবিত। সামাজিক অন্যায় অবিচারের মূল কারণ সম্পত্তির ওপর ব্যক্তির অধিকার। মার্ক্স দেখিয়েছেন, মুষ্টিমেয়

ধনিকের হাতে সমাজ সম্পদের সিংহভাগ কেন্দ্রীভূত হয়। সমাজ বিবর্তনের ধারায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধীরে ধীরে নির্বিত্ত ও নিঃস্ব শ্রেণীতে পরিণত হয়। এই সমাজ সংকটের মধ্যে ধনবাদের মৃত্যুঘণ্টা ধ্বনিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তিরও আয়ু ফুরিয়ে আসে। মার্ক্সীয় সমাজ বিজ্ঞানের আলোকে বিচার করলে নজরুলের সাম্যবাদ অপাংক্তেয় হয়ে যায় না। তাঁর সাহিত্যে প্রথম থেকেই নির্যাতিত মানুষের দুঃখ ও বেদনা প্রতিফলিত হয়েছে। 'লাঙল' পত্রিকার পরিচালক নজরুল সচেতন সাম্যবাদী। এই পর্যায়ে কবি নিপীড়িত শোষিত শ্রেণীর কথা বলেছেন একটা বিশেষ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। নজরুলের কাব্যের এই নবীনতার সুর অবশ্যই সাম্যের সুর। তাঁর 'সাম্যবাদী' ও 'সর্বহারা' কাব্যের ভাবসত্য মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির বহু লক্ষণ বহন করেছে। সর্বহারা শব্দটি ইংরাজী 'Proletariat' বা 'Have nots' শব্দের বাংলা অনুবাদ। কাজেই সাম্যবাদের অন্তর্গত 'সাম্যের গান' রচনার সময় নজরুলের মনে মার্ক্সীয় বা রুশীয় সাম্যবাদ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল একথা অস্বীকার করা যায় না। বিশ্ব ইতিহাসের সাম্যবাদী আন্দোলনের ধারা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন বলেই নিজেকে তাঁর সমসাময়িক কালের প্রগতিশীল রাজনৈতিক কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত করেছিলেন। শ্রমিকের গান, ধীবরদের গান, কৃষাণের গান, রাজা-প্রজা, চোর ডাকাত, কুলি মজুর, ফরিয়াদ এবং চাষার গান, শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র (প্রলয়শিখা) প্রভৃতি কবিতা সমাজ ব্যবস্থার আর্থিক অসাম্যকে ভিত্তি করেই রচিত। এছাড়া অসংখ্য কবিতায়, গানে, গদ্য রচনায় তিনি নির্বিত্ত ও নিঃস্ব শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশার প্রতিকারার্থে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তাঁর কবিতা, গান ও গদ্য ভাষাকে অনেক ক্ষেত্রে মার্কসের সাম্যবাদী ইশতেহারের প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। নজরুলের সাহিত্যের সর্বত্রই শ্রেণী সচেতনতা। এবং সাম্যের চেতনা প্রকাশ পেয়েছে।"[৩]

'লাঙল' ও 'গণবাণীর' যুগের অধিকাংশ রচনাই কৃষক শ্রমিক জীবন ও শ্রেণী সংগ্রামকে কেন্দ্র করে লেখা। নজরুলের রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ না করেও বলা চলে যে তিনি বিদ্রোহ বিপ্লবের আজীবন সমর্থক; সাম্যবাদের সমর্থক এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিরোধী। যদিও তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মতবাদ তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা সুসংহত নয়। তাঁর আবেগ ও চিন্তার মধ্যে যথেষ্ট অসঙ্গতি থাকার ফলে হৃদয়লব্ধ প্রজ্ঞার সঙ্গে চিন্তালব্ধ বাস্তব জ্ঞানের সমন্বয় অনুপস্থিত থেকে গেছে। ফলে তাঁর কবিতায় অনেক সময় আবেগ ও কল্পনার অসংযত প্রকাশ লক্ষ করা যায়—যা তাঁর কবিতার অন্যতম ত্রুটি। নজরুলেরও কবিতায় বঞ্চিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত মানুষের জন্য যে বেদনাবোধ প্রকাশিত এবং নিপীড়ন, অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্য যে প্রবল বিদ্রোহ ও বিপ্লবাকাঙ্ক্ষা তা শুধু কোনো বিশেষ দেশকালের মানুষের উদ্দেশে লিখিত নয়, সমগ্র জগৎ সম্পর্কে তা প্রযোজ্য। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর চিত্ত আলোড়িত। তিনি স্বাধীনতা বলতে রাজনৈতিক স্বাধীনতাই বুঝতেন না। তিনি বিদেশীদের হাত থেকে

মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রেণী শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সর্বপ্রকার বন্ধন ও অধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন। এই জন্য মনে হয়, নজরুলের কাব্যদর্শনের পেছনে কোনো উচ্চতর জীবনবোধের ও জীবনাদর্শের ধারণা সক্রিয় ছিল। তিনি মূলত কবি বলেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা, সমাজচেতনা একেবারে নির্ভুল হওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি দার্শনিক নন, ফলে কোনো তত্ত্বের অনুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ ও প্রতিষ্ঠা তাঁর কাম্য নয়। কল্পনা চিন্তা উপলব্ধি অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে খণ্ড চিত্রগুলি অখণ্ডতা লাভ করে কবিতায় পরিণত হয়ে একটি দার্শনিক মূর্তি পরিগ্রহ করতে চেয়েছিল।

নজরুলের কাব্যকবিতা বিশ্লেষণ করলে মনে হয় তিনি নৈরাজ্যবাদী ছিলেন— 'দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।' প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ওপর তার তীব্র ঘৃণা অনাস্থা ছিল। অরাজকতা পূর্ণ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে মুক্তির পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি তরুণদের আহ্বান জানিয়েছেন—'বেরিয়ে এসো বিবরের অন্ধকার হতে হে আমার বিষধর কালফণার দল,—তোমাদের ছোবলে ছোবলে ধরণী জর্জরিত হয়ে উঠুক, আসুক নিখিল অগ্নিগিরির বিশ্বধ্বংসী অগ্নিস্রাব, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হোক এ অরাজক বিশ্ব।' প্রচলিত নীতিবোধ, সমাজব্যবস্থা ও রীতি নীতিকে তিনি মানতে পারেননি বলেই সামাজিক ব্যবস্থার অসংগতি তাঁকে পীড়িত করেছে এবং তিনি বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত হয়েছেন । ধর্মীয় রাষ্ট্রীয় শাস্ত্রীয় ও সামাজিক আইন কানুনকে তিনি গ্রহণীয় বলে মনে করেননি।

> তোমার দণ্ড হস্তের বাঁধে কার নিপীড়ন চেড়ী ?
> আমার স্বাধীন বিচরণ রোধে কার আইনের বেড়ী?
> ক্ষুধা তৃষা আছে মোর প্রাণ,
> আমিও মানুষ, আমিও মহান।
> আমার অধীন এ মোর রসনা, এই খাড়া গর্দান,
> মনের শিকল ছিঁড়েছি, পড়েছে হাতের শিকলে টান
> এতদিনে ভগবান।

সর্বপ্রকার বন্ধনকে অস্বীকার করার মাধ্যমেই ফুটে উঠেছে অবাধ স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা, পদ্ধতির শিকল ভাঙাই তাঁর জীবনের ব্রত। নজরুল মনে করতেন, বিশ্ব ইতিহাস বঞ্চনার ইতিহাস। সমাজ জীবনের অসঙ্গতি ও অসাম্যের দিকে তিনি বার বার দৃষ্টিপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'চোর ডাকাত' 'দ্বীপান্তরের বন্দিনী', 'ফরিয়াদ', 'বিদ্রোহী' কবিতাগুলির কথা পাঠকের মনে আসে। ''নজরুলের বাণী বিশ্বাসের বাণী—জীবনের মহৎ মূল্যে আস্থার বাণী। সমাজকে ভেঙে গড়বার স্বপ্ন ও উদ্যম ছিল তাঁর ক্লান্তিহীন। নজরুল মানসিকতাকে উনিশ শতাব্দীর স্বাধীনতা সাম্য ও মানবতাবোধের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।''[৪]

''নজরুলের সাম্যবাদী চেতনা পূর্ণ বৈজ্ঞানিক না হলেও মানবেতিহাসের বিপ্লবী

প্রয়াস সম্পর্কে জাগ্রত ছিল। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা শক্তি সংগ্রহ করেছে ফরাসী বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের ঐতিহ্য থেকে এবং শেলী, হুইটম্যান ও গোর্কির সাহিত্যে থেকে। স্বাধীনতা প্রীতি ও বিপ্লবী আবেগের সমন্বয়ে তিনি শেলীর যথার্থ উত্তরসূরী এবং শওকত ওসমানের ভাষায় 'গোর্কির মানসপুত্র'। নজরুলের স্বাধীনতাবোধ রুশোর মতই সাম্যবাদের সমর্থক।"[৫] এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচিত নজরুলের রাজনৈতিক মতাদর্শে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। স্বাজাত্য ও স্বাদেশিক চেতনা, দলিত-পীড়িতদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং সর্বাত্মক মুক্তির জন্য জেহাদ ঘোষণা ইত্যাদি তাঁর কবিধর্মের বৈশিষ্ট্য হলেও "কাজী নজরুল ইসলামের মনের উদ্দেশ্য, মুখের কথায় ও বুকের সত্যে কোন সঙ্গতি শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য ছিল না। ফলে কথায় কাজে ও বিশ্বাসে ছিল সর্বক্ষণিক অসঙ্গতি এবং বৈপরীত্যও। তিনি লেখক জীবনে মতে, পথে, বিশ্বাসে, আচরণে সব সময়ই বহুধা বিভক্ত পাপড়ি প্রায় বিযুক্ত সত্তায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। কোন রচনায় তিনি সাম্যবাদী, কোন রচনায় ইসলামী সাম্যে বিশ্বাসী, কোন রচনায় তিনি আস্তিক ও নিরপেক্ষ পিতৃবৎ ঈশ্বর কাম্য সন্তান বা সৃষ্ট মানব সাম্যে আস্থাবান, আবার কখনো বা বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী, কখনো তিনি কেবলই শোষিত, পীড়িত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত বাঙালীর একজন, কখনো বা তিনি পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ বিতাড়নকামী ভারতীয় কবি। কখনো তিনি দ্রোহী, কখনো সংগ্রামী কখনো বিপ্লবী কখনো সমাজসংস্কারক, কখনো বিশ্বমানবতার বাহক ও প্রচারক। এ মানুষই আন্তরিকভাবে সাম্প্রদায়িক মিলনকামী। আবার তিনিই বাস্তবে অসম্ভব অনভিপ্রেত জেনেও দুনিয়ার সব অজ্ঞ ও আবেগপ্রবণ মুসলিমের মতো, দেশকাল-জাত জন্ম-বর্ণ সমাজ সংস্কৃতি ভাষা এবং আর্থিক শৈক্ষিক রাষ্ট্রীয় অবস্থান নির্বিশেষে বিশ্ব মুসলিমের অভিন্ন ঐহিক পারত্রিক ও আদর্শিক অভিন্নতায়, ঐক্যে মৈত্রে ও ভ্রাতৃত্বে গভীরভাবে আশৈশব সংস্কার বশে আস্থাবান। কবি যখন ইসলামের ঐতিহ্যে ও মুসলিমদের ইতিহাসে মানস বিচরণ করেন, তখন তাঁকে সময় ও ভূগোল শাসিত কোন বিশেষ দেশকাল জাতির অবস্থানের বলে ক্বচিৎ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। তখন তিনি কেবলই মুসলমান। আর কিছু নন, আর কেউ নন, এবং তখন তিনি ইসলামের ও মুসলিমের হৃত গৌরবে ক্ষুব্ধ, ঐতিহ্য স্মরণে স্ফীত বক্ষ, জাগরণ ও গানে চারণ কবি।"[৬] মনে হয়, নজরুল ইসলাম দ্বৈতসত্তা মুক্ত ছিলেন না। মুসলিম সত্তায় তিনি বিশ্ব মুসলিম চেতনায় উদ্বুদ্ধ, আবার রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের মিলনে, সহযোগিতায় ও যৌথ সংগ্রামের প্রয়োজনে বিশ্বাসী। নজরুল ইসলামের মধ্যে দ্বিধা ছিল, আর এ দ্বিধা অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না বলে তিনি বহুধাবিভক্ত কবি ব্যক্তিত্ব। "মার্ক্স এঙ্গেল্স লেনিনের বাণী দূরাগত ধ্বনির প্রভাবে তিনি জুলুম-জালিম বিহীন শোষণ-পীড়নমুক্ত মানুষের সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন বটে, কিন্তু তাঁর চিন্তা চেতনার ও বোধ-বুদ্ধির জগতে মার্কসবাদ কোন সুস্পষ্ট রূপ পায়নি, ফলে তাঁর উচ্চারিত সাম্যের আবেদন, শোষণ পীড়ন বঞ্চনা মুক্তির সংগ্রামে ঐহিকতা সর্বস্ব

বুল-বুদ্ধি-বিবেক নির্ভরতা ছিল না, ছিল আল্লাহ ভগবানের দোহাই, ছিল ধর্মধ্বজী কপট মোল্লা-পুরুত, পাদরী ভিক্ষুর কবলমুক্ত বিশুদ্ধ শাস্ত্রানুগত্য। ফলে গণমানবের মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর বিঘোষিত নীতি আদর্শ না ছিল মার্কস লেনিন সমন্বিত; না ছিল শাস্ত্রসম্মত।"[৭] কিন্তু তবুও একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, নজরুল ইসলাম দলিত বঞ্চিত লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তির জন্য স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায়, আর্থসামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, সর্বমতের সহাবস্থানে, সহিষ্ণুতার, সহযোগিতার মানবপ্রেমিক কবি। মানবজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা তাঁর সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ছিল। "কাব্য বা সাহিত্য তাঁর কৃত্রিম অনুশীলনের মনোবিলাসের বিষয় ছিল না, ছিল না সত্তার ও আত্মার, আদর্শের ও আকাঙ্ক্ষার, দায়িত্বের ও কর্তব্যের অভিব্যক্তি দানের মাধ্যম ও অবলম্বন। তাঁর মর্ত্যে আবির্ভাব ভালোবাসা দেওয়ার এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মানুষকে আহ্বান জানানোর ব্রত নিয়েই—তিনি তাঁর কথায় ও কাজে প্রমাণ করে গেছেন। এ জন্যই ছন্দে ও প্রবন্ধে, গল্পে, ও উপন্যাসে সর্বত্র তাঁর একই দাবি ও লক্ষ্য উচ্চারিত। নজরুল ছিলেন গণমানবের স্বশাসন ও স্বাধিকারকামী।"[৮]

অবশ্য একথা ঠিক যে নজরুলের রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে মার্ক্স কথিত রাজনৈতিক মতবাদের সাদৃশ্য অন্বেষণ অনুচিত। কেননা, মার্ক্স ইতিহাসকে দেখেছেন শ্রেণী সংগ্রামের দৃষ্টি দিয়ে; নজরুল সে দর্শন অস্বীকার না করলেও তিনি মানব সমাজের অগ্রগতিকে অন্যতম পুরোধা শক্তি বলে মনে করেছেন। নজরুল ইসলামের এই মানসিক প্রকাশ থেকেই সম্ভবত অরবিন্দ পোদ্দার মনে করেছেন, "তার নিকট সাম্যবাদ একটা দুরবস্থিত আদর্শ, ভাব—একটা দুর্গম অভিযানের শেষ, একটা সংগ্রামের অবসান। গভীর ইতিহাসবোধ অথবা সমাজ প্রবাহের আন্তরিক উপলব্ধি থেকে যে নজরুল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা কোনমতেই বলা যায় না।" কিন্তু এ বক্তব্য কতখানি যথার্থ তা বিতর্কিত। কেননা দুরবস্থিত আদর্শের আবেগে অনুরঞ্জিত হলেই নজরুলের সাম্যদর্শন মার্ক্সীয় সাম্যবাদী দর্শনের বিরোধী হবে, এমন ভাবা যায় না। তাছাড়া কোনো নীতি বা তত্ত্ব কবিতা হতে পারে না। মার্ক্সবাদ নজরুলের জীবনদর্শন নাহলেও তিনি মার্ক্স নির্দেশিত সামাজিক অর্থনৈতিক সমতাকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। নজরুলের সাম্যবাদের প্রেরণা গভীর ইতিহাসবোধ থেকে উদ্ভূত কিনা তার সাক্ষ্য দেবে নজরুল ইসলামের কবিতা উপন্যাস গদ্য রচনা। বুদ্ধদেব বসুর কথাতেই বলা যায়—"আজকাল যে সাম্যের বাণী লোকের মুখের বুলিতে পরিণত হয়েছে, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নজরুলই তার প্রথম উদ্যোক্তা।"

একজন কবি বা শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা প্রকাশিত হয় সেই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি স্বীকৃতিতে এবং সংগ্রামী অংশগ্রহণে—সে অংশগ্রহণ কখনো প্রত্যক্ষ বা কখনো বা অপ্রত্যক্ষ। মজফ্ফরপুরের ঘটনার সময় নজরুল ৯-১০ বছরের বালক অথচ সেই ঘটনা পরবর্তীকালে তাঁর অনেক কবিতার প্রেরণা হয়েছে। তিনি

বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে 'ভাঙা বাংলার রাঙাযুগের আদি পুরোহিত' রূপে প্রণাম জানিয়েছেন। নজরুল যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন তখন এদেশে অসহযোগ এবং খেলাফৎ আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। সেই আন্দোলনের নায়ক গান্ধীজি, মহম্মদ আলি, চিত্তরঞ্জন দাশ, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ও তুরস্কের খলিফার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অহিংস অসহযোগ পথ গ্রহণ করা হয়েছিল, ঠিক সেই সময় অনেকে বিপ্লবীদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। নজরুল কিন্তু এই প্রচলিত ধারণায় অভ্যস্ত না হয়ে বিপ্লবের হাতে বন্ধুত্বের রাখী পরিয়ে বিপ্লবাত্মক ভাবের কবিতা ও গান লিখে জাতীয় সংগ্রামকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'ধূমকেতু' সংবাদপত্রে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করা হয়েছিল এবং পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিদ্রোহের সংগ্রামী মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল। কেউ কেউ 'ধূমকেতু'র সুরে নৈরাজ্যবাদী বিদ্রোহের সুর শুনেছেন। কেউ মনে করেন, নজরুল ইসলামের 'আমি সৈনিক' রচনায় তাঁর নৈরাজ্যবাদী জীবনদর্শন চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এমনকি তাঁর কোন কোন লেখায় ইউরোপ ও আমেরিকায় নৈরাজ্যবাদের ঔদ্ধত্য ও নাস্তিকতার পরিচয়ও আছে। কিন্তু নজরুলের রচনায় সামগ্রিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী অভিযান চালিত হয়েছে বলে তাঁর রচনা নৈরাজ্যবাদী দর্শনমূলক রচনা, এমন বলা অনুচিত।

নজরুল ইসলামের 'কুহেলিকা' উপন্যাস রচিত হয়েছে বিপ্লবীদের নিয়ে, এই উপন্যাসে বিপ্লবী আন্দোলন এবং তাব নেতা ও কর্মীদের চরিত্র সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নেতা ও কর্মীদের সংলাপে সে যুগের জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে। রাজনীতির চেতনায় নজরুল ইসলামকে চূড়ান্ত বিপ্লববাদী বলা যেতে পারে। যদি কেউ এই বিপ্লবী চিন্তায় নৈরাজ্যবাদের সন্ধান পান তাহলে গান্ধীজিকেও নৈরাজ্যবাদী বলতে হয়। কেননা নজরুল ইসলামের বক্তব্যের সঙ্গে গান্ধীজির বক্তব্যের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।

1) "We have to learn and to teach others, that we do not want the tyrany of either English rule or Indian rule." (গান্ধীজি)

২) "বল, কারুর অধীনতা মানি না, স্বদেশীরও না, বিদেশীরও না।"

নজরুলের বিদ্রোহ শুধুমাত্র বিদেশী রাজনৈতিক শক্তির বিতাড়নের জন্য নয়, তিনি সত্যকে জাগাবার জন্য সর্বাঙ্গীণ বিদ্রোহের কথা বলেছেন। বাংলা দেশের বিপ্লবী আন্দোলনকে নজরুল ইসলাম যে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন তার পরিচয় আছে 'পূর্ণ অভিনন্দন' (ভাঙার গান) কবিতাটিতে যেখানে মাদারিপুর শান্তিসেনা বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র দাস (১৮৮৯-১৯৫৬) মহাশয়ের কারামুক্তি উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্রোতে নানা জটিলতায়, দ্বন্দ্বে, বাধায় ব্যাহত গতি হলেও জাতীয় নেতৃত্ব শ্রেণীস্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে না পারলেও, কৃষক

মজুরের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে জাতীয় নেতৃত্ব দৃষ্টিপাত না করলেও, নজরুল ইসলাম এই সমস্ত স্বার্থপরতা এবং ফাঁকিকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি মোহগ্রস্ত জাতীয় নেতৃত্বের মুখে বিদ্রূপের ধুলি ছুঁড়েছেন। 'আমার কৈফিয়ৎ' কবিতায় এই মোহমুক্তির প্রকাশ যেমন স্পষ্ট তেমনি উজ্জ্বল। তাঁর বিশ্বাস ছিল সর্বহারাদের শ্রেণী সংগ্রামে আর সাম্যবদের পথে—

বিপ্লবের লালঘোড়া ডাকে, ঐ
ঐ শোনো শোনো, তার হ্রেষার চিক্কুর
ঐ তার ক্ষুরহানা মেঘে।

হে বিদ্রোহী বন্ধু মোর। তুমি থেকো জেগে।
তুমি রক্ষী এ রক্ত অশ্বের
হে বিদ্রোহী অন্তর্দেবতা।

১৯২০-র দশকে বাংলা কাব্য সাম্যবাদী চেতনায়িত হতে শুরু করে এবং তা অহিংস বুর্জোয়া মানবতাবাদী দর্শনকে আঘাত দেয়। কার্ল মার্কসের বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী দর্শনের বাস্তব প্রয়োগের দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে রুশ বিপ্লব। বাংলায় সাম্যবাদী সংগঠন গড়ে তোলার কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ, তাঁর সাহচর্যে সাম্যবাদী চেতনায় নজরুল উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। নজরুল ইসলামকে বাংলার প্রথম বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী বলা যেতে পারে। নজরুল ইসলাম মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে যেমন সহযোগিতা করেছেন তেমনি শ্রমিক কৃষকের রাজনীতিতেও ছিলেন। বিশের দশকের নবযুগ, ধূমকেতু, লাঙল, গণবাণী প্রভৃতি, নজরুলের ভূমিকা ও সক্রিয় কর্মতৎপরতা কৃষক শ্রমিকের মুক্তির লক্ষ্যে ছিল। কাজী আবদুল ওদুদ নজরুল ইসলামের সাম্যবাদী চিন্তায় ভারতের সুফীসাধক বা মুসলিম সাধকের প্রভাব আছে বলে মনে করেছেন। কিন্তু সাম্যবাদী চিন্তা সম্পর্কে এই মন্তব্য যথাযথ নয়। ১৯২০ সালে 'নবযুগ'-এ নজরুল ইসলাম যে সমস্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন সেগুলোর মধ্যে অনেক প্রবন্ধ ছিল শ্রমজীবী মানুষের স্বপক্ষে। ১৯২২-এ 'ধূমকেতু'তে তিনি ভারতীয় দুঃখ-ক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য ফরাসী ও রুশ বিপ্লবকে স্মরণ করেছেন—

"কে আছো পতিত, লাঞ্ছিত, কে আছো দীন, হীন, ঘৃণিত এসো, যে শক্তিবলে ভাইরা ফরাসির হাজার বছরের অত্যাচার ও আভিজাত্য দুইদিনে লোপ করিয়া দিয়াছিল, যে অন্যায় সাইবেরিয়ার লক্ষ বন্দী সন্ত্রাসদাতা দুর্ধর্ষ প্রতিষ্ঠিত শাসন ভাসিয়া গিয়াছিল, যে শক্তিময়ীর বিকট হাস্য সমস্ত জগতের বুকে উপহাস করিয়া ধনগর্বিতদের গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—শক্তিময়ী সেই সর্ব্বনাশের বন্যা লইয়া তোমার দুয়ারে উপস্থিত।"

নজরুলের সাম্য প্রেরণার মূলে ছিল মার্ক্স লেনিনের শিক্ষা, তার চেয়ে বেশি

ছিল স্বাভাবিক মানবতাবোধও। নজরুল ইসলাম ভারতীয় দুর্দশার কারণ রূপে পুঁজিবাদী শোষণকে দায়ী করেছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শোষক এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী দালাল, দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণী—এই সর্ববিধ শোষকদের হাত থেকে মুক্তির জন্য তিনি নিঃশর্ত স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করেছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি দ্বিধাহীনভাবে জানিয়েছিলেন—"স্বরাজ টরাজ বুঝিনা, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে, কোন বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না"। নজরুল ইসলামের নানা কাব্যে স্বাধীনতার জন্য দুর্মর সংগ্রামী চেতনা সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে ভারতবর্ষের মুক্তির মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে। বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, প্রলয় শিখা প্রভৃতি গ্রন্থের নানা কবিতায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রবল। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতায় নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ বিরোধী বক্তব্য উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে কামাল পাশা, জাগরণী, দুঃশাসনের রক্তপান প্রভৃতি কবিতায় ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী অত্যাচারের চিত্রাঙ্কন করেছেন। সাম্রাজ্যবাদের ক্রূর উন্মত্ততা, কঠিন পীড়ন, দুর্বিষহ অত্যাচার কবিকে পীড়িত করে, তার মনে উত্তেজনার অগ্নিময়তা সঞ্চার করে বলে তিনি ভারতবাসীকে জাগরণের মন্ত্র দিলেন, ঘোষণা করলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বাণী—

"আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ
এই দুলালাম বিজয় নিশান মরতে আছি মরব শেষ"

তিনি যুদ্ধ ও সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা যেমন করেছেন তেমনি তার আশার কথাও ব্যক্ত হয়েছে। সংগ্রামে যারা হয়েছে দ্বীপান্তরিত বন্দী, কবি তাঁদেরও বরণ করেছেন কবিতায়—

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝন্‌ঝনা
এ যে মুক্তির পথে অগ্রদূতের চরণ বন্দনা।।

বাংলা কবিতায় চরিতধর্মী কবিতা রচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা পিপাসু সংগ্রামী যোদ্ধাদের মধ্যে উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টির জন্য তিনি একটি বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কামালপাশা, আনোয়ার পাশা, খালেদ, চিরঞ্জীব, জগলুল প্রভৃতি কবিতায় ব্যক্তি চরিত্র উপস্থিত হয়েছে বিপ্লবের আদর্শ ও শক্তিমত্তার প্রতীক রূপে। যদিও নজরুল ইসলাম গান্ধীবাদকে সমর্থন জানিয়ে 'চরকার গান' কবিতাটি লিখেছিলেন, তবুও গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন কিংবা দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের দুর্বলতা ও ব্যর্থতাকে সমলোচনা করে নিজের সত্যানুসন্ধান ও সত্যনিষ্ঠার প্রতি অবিচলিত থেকেছেন—"আমি যতটুকু বুঝতে পারি তার বেশি বুঝবার ভান করে যেন কারুর শ্রদ্ধা বা প্রশংসা পাবার লোভ না করি। তা সে মহাত্মা গান্ধীরই মত

হোক আর মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মত হোক কিংবা ঋষি অরবিন্দের মত হোক, আমি প্রাণ থেকে যেটুকু সাড়া পাই রবীন্দ্র, অরবিন্দ বা গান্ধীজির বাণীর আহ্বান ঠিক ততটুকু মানবো। তাঁদের বাণীর আহ্বান যদি আমার প্রাণে প্রতিধ্বনি না তোলে তবে তাঁদের মানবো না।" নজরুল জীবনের প্রথম পর্যায়ে স্বরাজ ও চরকার গুণগান করলেও পরে তার অন্তঃসারশূন্যতা উপলব্ধি করেছেন। নজরুল জীবনে সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী ছিলেন বিপ্লববাদের রক্ত ঝরা পথের পথিক হতে। তিনি সহিংস বিপ্লববাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তাঁর 'অগ্নিবীণা' আর 'বিষের বাঁশীতে' নবযুগের তূর্যবাদন। এমনকি ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তাঁর কবিতায় বন্দিত। 'প্রলয়শিখা' কাব্যে 'নবভারতের হলদিঘাট' কবিতায় বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে এবং যতীন দাসকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি দেশমাতৃকার জন্য মহান আত্মত্যাগে উৎসর্গীকৃত যতীনদাসের উদ্দেশে বলেছেন—

> কে যতী ইন্দ্র তরুণ তাপস দিয়া গেলে তুমি একি এ দান?
> শবে শবে গেলে প্রাণ সঞ্চারি কেশব, বিলায়ে তোমার প্রাণ!
> তিলে তিলে ক্ষয় করি আপনারে তিলোত্তমারে সৃজিলে হায়!
> সুন্দ ও উপসুন্দ অসুর বিনাশিতে তব তপ-প্রভায়!

নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী শাসন নির্মূল করতে হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নজরুল ইসলাম ইতিহাসের চেতনায় দীক্ষিত হয়েছিলেন বলেই তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ছিল পূর্ণায়ত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ব্যতীত কোন রাজনৈতিক সংগ্রাম যে সম্পূর্ণ হতে পারে না এ বিষয়ে নজরুল ইসলাম যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর এই চিন্তার প্রকাশ আছে 'রুদ্রমঙ্গল' গ্রন্থের 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে, 'বিষের বাঁশির' জাতের বজ্জাতির, 'সর্বহারা'র কাণ্ডারী হুঁশিয়ার এবং 'ফণিমনসা'র হিন্দু মুসলমান যুদ্ধ কবিতায়। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও বঞ্চনার পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষ কিভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে শোষিত তার সঠিক চিত্র নজরুলের কবিতায় উদ্ভাসিত। অন্নবস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, ও বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদা থেকে শ্রমজীবী বঞ্চিত হয় আর সেই শোষণ বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরে তিনি সমাজ বিপ্লবের নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর 'সাম্যবাদী' ও 'সর্বহারা' কাব্য গ্রন্থে স্বদেশ ও স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহের পর সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির জন্য সমাজ বিপ্লবের মন্ত্র প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন সমালোচক এ-দুটি গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কার্ল মার্ক্সের চিন্তার সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। নজরুল তাঁর কবিতায় মার্ক্স কথিত সর্বহারা শ্রেণীর মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা ঘোষণা করেছেন। অন্নের অভাব সম্পর্কে তার উপলব্ধি প্রকাশিত হয়েছে 'সাম্যবাদীর 'চোর ডাকাত', 'নতুন চাঁদের', 'উঠরে চাষী' শেষ সওগত-এর 'শোধকর ঋণ' কবিতায়। মানুষের অর্থনৈতিক দুর্গতির কারণ যেমন সাম্রাজ্যবাদী শোষণ তেমনি আবার ধনিক বণিকের অর্থনৈতিক শোষণও বটে। পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক চিন্তার অধিকারী নজরুল ইসলাম ১৯৪১ সালে

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজতজয়ন্তী উৎসবে প্রধান অতিথির ভাষণে বলেছিলেন—"মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, আর অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষাণ স্তূপের মতো জমা হয়ে আছে। এই অসাম্য এই ভেদ জ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম"। তাঁর রাজনৈতিক চেতনা যে শ্রমজীবী ও অন্ত্যজ মানুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'ধূমকেতু' পত্রিকার রচনায়—"ভারতবর্ষের শতকরা ৭০ জন চাষী তারা আজ অহরহ পরিশ্রম করিয়া দুবেলা খাবার অন্ন জোগাড় করিতে পারে না। রোগ লইয়া দুর্ভিক্ষ ঘরে ঘরে মহাজনের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।" কার্ল মার্ক্স শ্রমিক শ্রেণীকেই প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী রূপে ঘোষণা করেছিলেন এবং শ্রম শোষণের প্রধান শিকার রূপে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর বক্তব্যে ধনিক গোষ্ঠীর মুনাফা লাভকেই মুখ্য বলা হয়েছিল। নজরুল ইসলামও শ্রমিক শোষণকে ইতিহাসের অন্যতম নির্মমতা, নির্লজ্জ পাশবিক শোষণ রূপে অভিহিত করেছেন। নজরুল ইসলামের কাব্য সাহিত্যের মৌল উপাদান যে শ্রেণীসচেতনতা ও সাম্যচেতনা তার মূলে রয়েছে আন্তর্জাতিকতাবোধ। আর এই আন্তর্জাতিকতা বোধের ক্ষেত্রে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের নাম স্মরণীয়। নজরুল ইসলাম শুধু ধর্মীয় নয়, ভৌগোলিক জাতীয়তাও সমর্থন করেন না। তাঁর মতে, তিনিই যথার্থ কবি যিনি সর্বাঙ্গীণ আন্তর্জাতিক চেতনায় দীক্ষিত। তিনি মূলত কবি বলে এবং সমকালীন আন্তর্জাতিকতাবাদ তাকে শিক্ষিত করেছিল বলে তিনি ধর্ম ও ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন। নজরুলের 'রুদ্রমঙ্গল' গ্রন্থে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রবল উৎসারণ লক্ষ করা যায়। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্থূল প্রচার না করে তিনি শোষণভিত্তিক সমাজের মূলকাঠামোর সমালোচনায় প্রবৃত্ত। ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপদ সম্বন্ধে নজরুল সাবধান করে দিয়েছিলেন তিরিশের প্রারম্ভে—"হঠাৎ চমকে উঠি, শুনি আবার যুদ্ধ বাজনা বাজছে। এ যুদ্ধবাদ্য বহু শতাব্দীর পশ্চাতের, দেখি তালে তালে পা ফেলে আসছে—সাম্রাজ্যবাদী ফাসিস্ত সেনা"। বিভিন্ন কবিতায়, প্রবন্ধে, গদ্যভাষণে, চিঠিপত্রে নজরুলের আন্তর্জাতিক চিন্তা চেতনার প্রকাশ লক্ষ্যগোচর একথা স্বীকার করে নিয়ে বলা চলে—তার আন্তর্জাতিক চেতনার সর্বোত্তম প্রকাশ 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত'। সাপ্তাহিক 'গণবাণীতে' প্রকাশের জন্যই নজরুল এই আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের অনুবাদ করেন। ১৯২৭-এর ২১ এপ্রিলের 'গণবাণীতে নজরুলের 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়। মূল সঙ্গীতটি হলো 'দি ইন্টারন্যাশনাল' রচনাকাল ১৮৭১, রচয়িতা পাতিয়ের। মুজফফ্‌র আহ্‌মদ তাঁর কাজী নজরুল ইসলাম 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে জানিয়েছেন—"নজরুল ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের নাম দিয়েছে অন্তর ন্যাশনাল সংগীত। ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই গানটির ভিতর দিয়েই মজুর শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা বিশেষভাবে ফুটে ওঠে।"

নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক চেতনা জাতিভেদ, বর্ণ, কৌলিন্য ছুঁৎমার্গহীন

এবং তিনি ধর্মীয় ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। অর্থনৈতিক বৈষম্য সামাজিক শোষণ, শ্রেণী বিভক্ত সমাজের ভেদাভেদ ইত্যাদি নজরুল ইসলাম তার রাজনৈতিক চিন্তায় বরণ করে নিতে পারেন নি। ধর্ম যে শোষণদণ্ড রূপে ব্যবহৃত হয় তার কথা আছে নজরুল ইসলামের 'মানুষ' কবিতায়। কার্ল মার্কস্ ধর্মীয় অনুশাসনের আড়ালে ধর্মধ্বজীদের শোষণ ক্রিয়া লক্ষ করেছিলেন। নজরুল ইসলাম তাঁর সাম্যবাদীর 'পাপ' কবিতায় উচ্চারণ করেছেন—

এ দুনিয়া পাপশালা
ধর্ম গাধার পৃষ্ঠে এখানে শূন্য পুণ্য শালা।

শোষণ সর্বস্ব স্বার্থ চরিতার্থকারী আড়ম্বরময় ধর্মীয় ভণ্ডামি ও ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটনের পক্ষে নজরুল ইসলাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাঁর 'ফণিমনসা'র 'পথের দিশা' কবিতায়—

"মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার,
রে অগ্রদূত, ভাঙতে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড়।"

ঔপনিবেশিক শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ যেমন নজরুলের কবিতায় ধ্বনিত তেমনি ধনিক-বণিক তথা বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার সামগ্রিক শোষণ থেকে মুক্তির জন্য তিনি সমাজবিপ্লবের কথাও বারবার ঘোষণা করেছেন। চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সাম্যবাদী সমাজের অভ্যুদয় ঘটে নজরুলের 'সাম্যবাদী' ও 'সর্বহারা' কাব্যে সেই মার্কসীয় তত্ত্বের সফল প্রয়োগ ঘটেছে। 'অগ্নিবীণার' প্রথম কবিতা 'প্রলয়োল্লাসের' বিপ্লব ও ধ্বংসের ভেতর দিয়ে নতুনতর সৃজন সম্ভাবনার দর্শন কবি প্রকাশ করেছেন। শ্রমজীবী মানুষের আত্মজাগরণ ও মুক্তির জন্য কবি শুধুমাত্র জাতীয় চেতনাকেই মুখ্য বলে মনে করেন নি। শ্রমজীবী মানুষের আত্মজাগরণ ও মুক্তি সংগ্রামে নজরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক চেতনায় বার বার উদ্বোধিত হয়েছেন। স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমর্থক হলেও শ্রমজীবীর মুক্তি প্রসঙ্গে তিনি আন্তর্জাতিক। কবিব নানা কাব্যগন্থে কৃষাণের গান, চাষার গান, শ্রমিকের গান, ধীবরদের গান প্রভৃতি কবিতায় এই চিন্তা প্রকাশিত। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা রূপায়িত হলে যে বৈষম্যহীন শ্রেণীহীন জগৎ গড়ে উঠবে সেই আর্থিক বৈষম্যহীন, ধর্মীয় ব্যবধান, বর্ণবিভেদহীন ব্যবস্থার মার্কসীয় চিন্তার সঙ্গে নজরুল ইসলামের চিন্তার পার্থক্য দুর্লক্ষ্য। বলা যেতে পারে, নজরুল ইসলামের কাব্যের উপজীব্য হল মার্কসীয় চেতনার সংক্রমণ। তাঁর সেই রাজনৈতিক চিন্তায় অসাম্প্রদায়িক চিন্তা আছে, সাম্যবাদী দর্শন আছে, আন্তর্জাতিক ভাবনা আছে, সর্বোপরি আছে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদবিরোধী মনোভাব, ধনতান্ত্রিক শাসন শোষণের অবসান আর সাম্যবাদী চিন্তা যা মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী চেতনার নানা উপাদান অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত।

তথ্যসূত্র

১। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা, কলকাতা, ১৯৮৯।
২। আহ্‌মদ শরীফ, একালে নজরুল, ঢাকা, ১৯৯০।
৩। আতাউর রহ্‌মান, "নজরুলের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা", মুস্তাফা নুরউল ইসলাম (সম্পাদিত), নজরুল ইসলাম ঃ নানা প্রসঙ্গ, ঢাকা, ১৯৯১।
৪। আতাউর রহ্‌মান, নজরুল কাব্যসমীক্ষা, ঢাকা, ১৯৭১।
৫। আতাউর রহ্‌মান, নজরুলের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা, পূর্বোক্ত।
৬। একালে নজরুল, পূর্বোক্ত।
৭। তদেব।
৮। তদেব।

তথ্যগ্রন্থ

১। রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৯১।
২। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম ঃ কবিমানস ও কবিতা, কলকাতা, ১৯৯২।
৩। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম ঃ সম্পাদক সাংবাদিক এবং পত্র পত্রিকায়, কলকাতা, ১৯৯৯।
৪। অনীক মাহ্‌মুদ, আধুনিক বাংলাকাব্যে সাম্যবাদী চেতনা, ঢাকা, ১৯৯৫।

নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তাঃ একটি ভিন্নধর্মী সমীক্ষা

বাঁধন সেনগুপ্ত

নজরুল-চর্চার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত প্রকাশিত অধিকাংশ গ্রন্থ থেকে যে কোনো পাঠক বা নজরুল অনুরাগী কবির রাজনৈতিক চিন্তার বিশ্লেষণ করতে গেলে তাঁর বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনাই বেশি। কেননা প্রথমত, নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা বিষয়ে এইসব আলোচনার মধ্যে লেখকদের নিজস্ব রাজনৈতিক ভাবনা, বিশ্বাস বা বিভ্রান্তি যেন সুকৌশলে অধিক পরিমাণে অনুপ্রবেশ করে এসেছে । ফলে, নজরুলের রাজনৈতিক ভাবনা সেখানে যথাযথ বিশ্লেষিত হয়নি। যে কারণে কবির রাজনৈতিক যে ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য তা এইসব আলোচনায় প্রথম থেকেই উপেক্ষিত। দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ আলোচক বা লেখক নিরপেক্ষতার নাম করে কবির রাজনৈতিক ভূমিকাকে পুরোপুরি এড়িয়ে গিয়ে কৌশলে তাঁকে অ-রাজনৈতিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতেই সচেষ্ট। এঁদের মতে নজরুলের কাব্য ও সাহিত্য নেহাতই আবেগ ও সমকালীন ঘটনা প্রবাহের তাড়নার ফলমাত্র। এঁরা কেউ কেউ নজরুলের কবিতাকে কলা-কৈবল্যের বিচারে ব্রাত্য বিবেচনা করেও পাতার পর পাতায় নজরুলের কবিতার ব্যর্থতার ধারাবাহিকতা প্রচারেই সচেষ্ট।বাকিরা ব্যস্ত নজরুলের গানের অন্তঃসারশূন্যতা প্রচার কার্যে। নজরুলের জন্মশতবর্ষে এইসব আলোচক বা তথাকথিত তথ্যনিষ্ঠ গবেষকদের মধ্যে রাতারাতি ধরি মাছ না ছুঁই পানি জাতীয় প্রবণতারই প্রাধান্য এখন অধিকাংশ সংকলনে স্থান পেয়ে চলেছে।

মনে পড়ে, বছর সাতেক আগে শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায় 'নজরুল একটি রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব' শীর্ষক একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। কবির রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তা বিষয়ক আলোচনার সেটাই ছিল প্রথম প্রয়াস । তা খণ্ডিত, অথচ আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ । এর আগে নজরুল বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থে জীবনী বা স্মৃতিকথার আড়ালে কবির রাজনৈতিক উল্লেখ থাকলেও স্পষ্টত কবির রাজনৈতিক চিন্তার বিশ্লেষণ প্রায় অনুপস্থিত। এর পর কবির কবিতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে সব রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ছায়াপাত ঘটেছিল সেগুলি নিয়েই প্রধানত আলোচনা করেছেন দুই বাংলার লেখকেরা । বাংলাদেশ হবার পরপর সেখানে নজরুল বিষয়ক আলোচনার ও নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে যেন জোয়ার নেমে এসেছিল সম্ভবত স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলামের উপস্থিতির টানে। ভাষা আন্দোলনের প্রাবল্যে ও কবির প্রভাব সত্ত্বেও নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা সেখানেও স্পষ্টত অনুপস্থিত।

পশ্চিমবাংলায় তারও আগে প্রকাশিত মুজফ্ফর আহ্‌মদ, ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত ও আজহারউদ্দীন খান বা প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থে কবির রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড

যতখানি চিত্রিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ অবশ্য কবির রাজনৈতিক ভূমিকা বিশ্লেষণে তাঁর অতিরিক্ত কোনো উৎসাহ দেখায়নি। পাকিস্তান আমলে দুর্ভাগ্যবশত নজরুল ছিলেন মৌলবাদ প্রচারকদের হাতে তাঁদের পছন্দ মত ব্যবহৃত ও চিত্রিত এক অসহায় কবি। তিনি প্রতিবাদে তখন অক্ষম। অসুস্থ, মূক, অসহায় কবির যথার্থ রাজনৈতিক ভাবনা বা বিকাশের ব্যাপারে তখন সেখানে কারো উৎসাহ আশা করাটাই অন্যায়। নজরুল তখন নেতাদের সুবিধাবাদী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত। ফলে বেপরোয়া হয়ে সে সময় বদলে দেওয়া হয়েছিল কবির ব্যবহৃত অনেক শব্দ। হিন্দু দেবদেবীদের নাম ও প্রাত্যহিক জীবনের বহু শব্দ কেটে সে সময় তাই লেখা হত ধর্মীয় উন্মাদনার প্রাধান্য জড়িত আরবি-ফারসি শব্দাবলী। নজরুলের কোনো নিজস্ব রাজনৈতিক ভাবনা চিন্তার প্রাধান্য বিষয়েও সেই সময় ছিল আশ্চর্য উদাসীন। চাকা ঘুরতে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশ জন্মগ্রহণের পর থেকে। এর কিছু আগে থেকেই পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ববাংলায় কেন্দ্রীয় ভাষা উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রকাশিত আব্দুল কাদির সম্পাদিত যে নজরুল রচনাবলী প্রকাশন শুরু হয়েছিল তখন থেকেই বলতে গেলে শুরু হয়েছিল কবির রচনার রাহুমুক্তির কাল। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত 'নজরুল সমীক্ষণ' শীর্ষক প্রবন্ধ সংকলনে আতাউর রহমানের রচনা 'নজরুলের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারা' শীর্ষক আলোচনায় রাজনৈতিক মার্কসীয় ভাবনা তথা রুশী চিন্তাধারার উল্লেখ আমরা লক্ষ করি। ফলে স্বাধীন বাংলাদেশে নজরুল-চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ করে কবির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে গভীর মনোযোগ লক্ষ করা যায় । যদিও কবির কবিতায় যে সাম্যবাদী প্রবণতা ও ভাবনার প্রভাব ইতোপূর্বে মুজফ্ফর আহ্মদ বা প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থগুলিতে উল্লেখিত তার বেশি বা অতিরিক্ত সেখানেও কিছু নেই। তবু এই রচনায় সে দিক্-বলয়ের পরিবর্তন শুরু হল সে কথা বলাই বাহুল্য। আসলে নজরুলের কবিতা বা গান নিয়ে লেখায় গোড়া থেকেই যে উৎসাহ ও প্রাধান্য দু-দেশে বর্তমান তার সিকিভাগও তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র বিশ্লেষণে ব্যয়িত হয়নি। নজরুল চর্চার অসম্পূর্ণতা বা সংকটও এখান থেকেই শুরু। পাশাপাশি, তাঁর রাজনৈতিক চরিত্র বিশ্লেষণের নামে গত এক দশক ধরে শুরু হয়েছে আর এক ধরনের রাজনীতির খেলা। সেখানে কবির রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তার চরিত্র হননে ব্যস্ত কতিপয় নজরুল ব্যবসায়ী। দলগত বিচারে বা সংখ্যায় এঁরা নেহাৎ কম নন। ব্যক্তি নজরুলের সামাজিক সুনাম এবং চরিত্র হননের কাজেই এঁরা নিয়োজিত। একাজে এঁদের ক্লান্তি নেই। শতবর্ষে এজাতীয় রচনার উঁকিঝুঁকি সহজেই নজরে পড়ে।

তবে কি নজরুলের কখনোই কোনো সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল না? কারো কারো মতে বলতে গেলে এসব ক্ষেত্রে নজরুলের কোন সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট মতামত ছিল না, শাস্ত্র কি এবং কেন, সমাজের ও ব্যক্তির সত্তা ও স্বার্থ কিরূপ, শাসক স্বদেশী-স্বজাতি ও স্বজন হলেই দেশ বা মানুষ স্বাধীন হয় কিনা—

এসব প্রয়োজনীয় প্রশ্ন তাঁর মনে কোন দিনই জাগেনি। তিনি সারা জাগ্রত জীবনে বিদ্রোহ, বিপ্লব ও সংগ্রামের বাণী ও সংকল্প উচ্চারণ করেছেন বটে, কিন্তু বিদ্রোহের আয়োজনে, বিপ্লবের প্রয়োজনে এবং সংগ্রামের উদ্যোগে কি কি পুঁজি ও পরিকল্পনা থাকা পূর্বশর্ত, তা কখনো তাঁর চিন্তায়, কথায় ও কাজে আভাসিত হয়নি।

পাশাপাশি একই লেখকের উক্তি ঃ নজরুলের স্বাজাত্য ও স্বাদেশিক চেতনা, দলিত-বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-শোষিত মানবতার প্রতি দরদ, তাদের দুঃখ যন্ত্রণা মোচন লক্ষ্যে, তাদের আর্থিক-সামাজিক-শৈক্ষিক-নৈতিক মুক্তির জন্যে সর্বাত্মক জেহাদ ঘোষণা ছিল কবি-ধর্ম এবং বাস্তবে লেখায় ও সংবাদপত্র মাধ্যমে বাংলাদেশে সংগ্রাম পরিচালনা করেন—অরবিন্দ ঘোষকে বাদ দিলে কেবল নজরুল ইসলামই। অন্য কবি লেখকদের কাছে যা ছিল পার্বণিক ও সাময়িক প্রয়োজনের ও উত্তেজনার বিষয়, নজরুলের কাছে তাই ছিল জীবনের ব্রত।

বলা বাহুল্য, নজরুলের রাজনৈতিক বিশ্বাস আদর্শ বা ধ্যানধারণা বিষয়ে লিখতে গিয়ে এমন দ্বিচারিতা প্রায়শই নজরে পড়ে। যেমন বছর দুই আগে প্রকাশিত নজরুল বিষয়ক একটি দীর্ঘ রচনায় আমরা বলতে শুনি, কোন কোন সমালোচকের মতে নজরুল ইসলাম নাকি বিপ্লবমার্গের কবি। কিন্তু বিশেষ মনোযোগ সহকারে বিচার করলে দেখা যায় তাঁর কবিতায় বিপ্লববাদের বিন্দুবিসর্গও নেই। জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট হয়ে ব্রিটিশ রাজত্বে সন্ত্রাসবাদীরা যেমন আমাদের দেশে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখতেন, নজরুলও তেমনি 'ধর, মার, জ্বালা, পোড়া' এইসব সস্তা জিগির তুলে বিপ্লবী হবার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন।

কিন্তু এ থেকে বোঝা গেল না যে লেখকের আসল মতলবটা কি! কবিতায় বিপ্লববাদের বিন্দুবিসর্গ বলতে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন আলোচক? আর তাছাড়া শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে এসে এই সমালোচকের এখনও কি বিশ্বাস যে, নজরুল সস্তা জিগির তুলে বিপ্লবী হবার স্বপ্নে ছিলেন বিভোর? বোঝা যাচ্ছে, সজনীকান্ত, মোহিতলাল বা নীরদ চন্দ্র চৌধুরীদের মত এখনও নজরুল বিরোধী ভ্রান্তির আবর্তে এই শতবর্ষেও অনেকেই আকণ্ঠ নিমজ্জিত। নজরুল বিষয়ক বিভ্রান্তির এ জাতীয় উদাহরণ নেহাৎ কম নয়।

নজরুলের জীবনে সমকালীন ঘটনা সমূহের প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। রুশ বিপ্লব (১৯১৭), রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৯১৯) মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট, আইন অমান্য আন্দোলন (১৯২২), দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলা (১৯২৫), পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি (১৯২৯), চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহ (১৯৩০), রাউন্ড টেবিল বৈঠক (১৯৩০-৩২) ইত্যাদির পাশাপাশি বিপ্লবী অনুশীলন ও যুগান্তর দলের বৈপ্লবিক তৎপরতা নজরুলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেইসঙ্গে বিশের দশকের প্রথমার্ধে (১৯২১) কলকাতায় গোপনে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে কবির আগ্রহ বা প্রাথমিক প্রয়াসে আন্তরিক সহযোগ—এগুলির প্রভাবও কবির জীবনে

পড়েছিল। তারও আগে সেই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রয়াস, ১৯০৬ সালে স্বায়ত্বশাসনের দাবি, ১৯০৮ সালের রাজদ্রোহমূলক সভা ও সংবাদ দমন আইন, ১৯০৮ সালের ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর জজ হত্যার প্রয়াস বা মাণিকতলায় বোমা তৈরির কারখানা স্থাপন, ভি ভি সাভারকার-শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা-গণেশ সাভারকারের গুপ্ত কর্মকাণ্ড, ১৯২১ সালের নিরন্তর শ্রমিক ধর্মঘট ও মোপলা বিদ্রোহ যুবক নজরুলকে যে নিরন্তর প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহই নেই।

একথা ঠিকই যে, নজরুলের নিজস্ব বিশেষ কোনো ছাপযুক্ত রাজনৈতিক তত্ত্ব বা দর্শন সে অর্থে ছিল না। যদিও চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাবে তিনি জীবনের প্রথম পর্বে কংগ্রেসের স্বরাজ্য দলের সংস্পর্শে এসেছিলেন । ওই দলের প্রার্থী হিসেবেই ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে পূর্ববঙ্গ থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চ পরিষদের সদস্য পদের জন্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা (ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল ও ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে গঠিত ঢাকা বিভাগের প্রার্থী) করে তিনি পরাজিতও হন। অবশ্য তার আগে থেকেই শুরু হয়েছিল জনসংযোগের পালা। সৈন্যবাহিনী থেকে ফিরে আসার পর মাস দুয়েকের মধ্যেই নজরুল যে দৈনিক 'নবযুগ' (সান্ধ্য) পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব মাত্র একুশ বছর বয়সে গ্রহণ করেন তার মধ্যেই কবির রাজনৈতিক সচেতনতার সন্ধান পাওয়া যায়। পত্রিকার সম্পাদকীয় অংশে তৎকালীন সমাজ ও যুগ সচেতনতার কথাই প্রচারিত হত। 'মুহাজিরীন হত্যার জন্যে দায়ী কে' রচনাটি 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর (সেপ্টেম্বর ১৯২০) 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। কিন্তু তার পরেও 'নবযুগ'-এর প্রতিনিধি হিসেবেই নজরুল ও মুজফ্‌ফর লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতায় আহূত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। তখন থেকেই নজরুল প্রতিটি জেলা সফরে বেরিয়ে পড়তেন। বলতে গেলে, প্রতিটি রাজনৈতিক সম্মেলন বা অধিবেশনে যোগ দিতেন। সমকালীন কোনো লেখক বা কবিদের ক্ষেত্রে কিন্তু এমন উদাহরণ দ্বিতীয়টি নেই। কবি বরিশাল, কুমিল্লা, ফরিদপুর, বাঁকুড়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুষ্টিয়া ও বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, মেদিনীপুর ইত্যাদি স্থানে একাধিকবার অসংখ্য সভা ও রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সে কাজে উৎসাহের ঘাটতি ছিল না। সেইসঙ্গে গান্ধীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ, সুভাষচন্দ্র ও দেশবন্ধুর প্রভাব, মুজফ্‌ফর, কুতবউদ্দীন, হালিম বা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্য নানাভাবে কবির জীবনকে নানা দিক থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। বিশেষ করে, ধূমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর কবি গ্রেপ্তার হবার ফলে (২৩শে নভেম্বর ১৯২২) এবং এক বছর কারাদণ্ড ভোগ করার দরুন তিনি রাতারাতি বাঙলার যুব ও তরুণ সমাজের চোখে আকর্ষণীয় এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। দেশের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই তখন নজরুলের প্রতি সহানুভূতিশীল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বারীণ ঘোষ, সহ দেশের রাজনৈতিক

নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র, গান্ধী, দেশবন্ধু, বিপিন পাল সকলেই নজরুলের বৈপ্লবিক মনন ও কর্মকাণ্ডের প্রশংসায় মুখর ছিলেন। ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে হুগলী জেলে কারাবাসকালে ৩৯ দিন অনশন করে জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নজরুল ; যে কারণে সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন উদ্বিগ্ন। তখন সেই ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল সুদূর-প্রসারী। সর্বোপরি, কবির পরপর পাঁচটি গ্রন্থ সে সময় বাজেয়াপ্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষণার ফলে দেশবাসীও তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সরকারী তৎপরতার কারণ বুঝতে পেরেছিলেন।

তিনি যে ভারতবর্ষে অর্থাৎ কলকাতায় সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার গোপন প্রচেষ্টার প্রাথমিক পর্বে যুক্ত হতে চেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রণয়নে দলের লক্ষ্য ও আদর্শ বিষয়ক যে খসড়া প্রথম তৈরি হবার কথা সেই খসড়া প্রণয়নে কবির বন্ধুদের সঙ্গে নজরুলেরও সহযোগ ছিল। পরবর্তীকালে এ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে কবির বন্ধুগণ প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই নজরুল সাম্যবাদী ভাবনা চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর রচনার মাধ্যমে সাম্যবাদের কথা প্রচার করতে থাকেন। তাঁর সম্পাদিত 'নবযুগ' (১৯২০, ১২ই জুলাই) প্রথম প্রকাশের পরেই মস্কোয় তৃতীয় আন্তর্জাতিক বা কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অথচ নজরুলের 'নবযুগ'ই ছিল বাংলা ভাষায় শ্রমিক ও কৃষকদের সমস্যা বিষয়ক প্রথম পত্রিকা। মজুর আন্দোলনের সমস্ত খবরাখবর প্রথম এখানেই প্রকাশিত হত। এই পত্রিকায় প্রকাশ্যেই রুশ বিপ্লব অভিনন্দিত হয়। ধর্মঘটে, শ্রমিক আন্দোলনে নজরুলের সমর্থন ও সহানুভূতি স্পষ্টতই ছিল আন্দোলনের পক্ষে। 'নবযুগ'-এর মাধ্যমে এ দেশে প্রথম সাম্যবাদী চিন্তার প্রকাশ ও চর্চার পথিকৃৎ হয়ে উঠেছিলেন নজরুল। পাশাপাশি ঐ পত্রিকাতেই খিলাফৎ কমিটির একটি বিজ্ঞপ্তি ছাপা হবার ফলে পত্রিকার সেই সংখ্যার সমস্ত কপি ও জামানতের এক হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হয়েছিল। এর ফলে দ্বিতীয়বার হাজার টাকা জমা রেখে 'নবযুগ' পুনরায় (২০শে সেপ্টেম্বর ১৯২০) প্রকাশের ঘোষণাপত্র জমা দিতে হয়। কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার ভাবনা থেকেই গোড়ায় 'ন্যাশনাল জার্নালস লিমিটেড' নাম দিয়ে মুজফ্‌ফর ও তাঁর সঙ্গীরা যে কোম্পানীর রেজিষ্ট্রি করেছিলেন তাতে সর্বহারাদের কথা বলার উদ্যোগ গ্রহণ করা সত্ত্বেও সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল প্রয়োজনীয় শেয়ার বিক্রির অভাবে। কিন্তু সর্বহারাদের কথাই নজরুলের সেই সময়ের রচনায় ক্রমশ প্রাধান্য পেতে থাকে। ফলে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রভাব যেমন বিশের দশক জুড়ে নজরুলের কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছিল তেমনি বিশেষ কোনো একটি রাজনৈতিক ভাবনা বা দর্শনের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে নজরুলের কবিতা ক্রমশ বিপ্লবের সমর্থনে এবং নিপীড়িত শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থ রক্ষার কাজেই ব্যবহৃত হতে থাকে। কবির অলক্ষ্যে তাঁর কবিতা যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র একটি পরিপূরক

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের প্রতিভূ হয়ে ওঠে। বিশের দশকের প্রথমার্ধে দেখা যাচ্ছে নজরুলই প্রথম দেশবন্ধুর নীতি, সন্ত্রাসবাদীদের বৈপ্লবিক নীতি ও সাম্যবাদের ভাবনাকে একত্রে গ্রথিত করে তাঁর রচনার বিষয় হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৯২৬ সালে 'লাঙল' পত্রিকায় (৫ম সংখ্যা) কানপুর কমিউনিস্ট সম্মেলনের রিপোর্ট সহ বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার আবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সংখ্যাটি ছিল 'সুভাষচন্দ্র বসু বিশেষ সংখ্যা'। সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন স্মরণে প্রকাশিত সেই সংখ্যায় নেতাজীর কোষ্ঠীটিও করেছিলেন নজরুল। আবার গোর্কির 'মা' উপন্যাসের অনুবাদ তখন ছাপা হচ্ছিল যার অনুবাদক ছিলেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। একই সময়ে কার্ল মার্ক্সের জীবনী লিখতেন দেবব্রত বসু। এতগুলি দিককে নজরুল সে সময় কি করে সামাল দিয়েছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। একদা বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল যার মুখপত্র হিসেবে 'লাঙল' প্রকাশিত হত তা যেমন কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত হয়নি তেমনি বন্ধু অগ্রজ মুজফ্‌ফর সঙ্গী থাকায় 'লাঙল'ই সেদিন সর্বপ্রথম কমিউনিজ্‌ম বা সাম্যবাদ সম্পর্কে এ দেশের জনসাধারণকে স্পষ্ট একটা ধারণা প্রদান করার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিল । কারো কারো মতে, 'ধূমকেতু'র চেয়েও সাম্যবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ভাবনা-চিন্তা প্রচারের কাজে লাঙলের ভূমিকা ছিল আরও সক্রিয়। এম. এন. রায় তো এ বিষয়ে স্পষ্টতই বলেছিলেন, "It represents the tendency of to the masses....The talents of the revolutionary bird Nazrul Islam should be devoted to voice the sufferings and aspirations of the down-trodden 'dumb millions'. Let him sing for them—inspire them with the courage to revolt against exploitation and with the hope for a new era of freedom and prosperity." (Masses, March 1926).

কিন্তু পাশাপাশি এ কথাও মনে রাখতে হবে যে সমকালীন প্রতিটি রাজনৈতিকদল নজরুলের বিপুল জনপ্রিয়তা এবং জনসংযোগকে সম্ভবত আপনাপন দলের স্বার্থে মূলধন হিসাবে প্রথম থেকেই ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের স্বরাজ্য দলের সদস্যপদ থাকা সত্ত্বেও নির্বাচন প্রার্থী নজরুলের ভরাডুবির পর কংগ্রেস দল তাঁর সম্পর্কে অকস্মাৎ যেন অধিক পরিমাণে উদাসীন হয়ে পড়েছিলেন। যে বিধানচন্দ্র রায় তাঁকে নির্বাচনী লড়াই ক্ষেত্রে মাত্র তিনশো টাকা দিয়ে ১৯২৬ সালে ঢাকা কেন্দ্রে পাঠিয়ে ছিলেন নির্বাচনে অসম আর্থিক লড়াইয়ের জন্যে তিনিই তারপর বছর পনেরো নজরুল সম্পর্কে কঠিন শীতল নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন। স্বাধীনতার পরে লন্ডন ও ভিয়েনায় চিকিৎসার কাজে পাঠানোর ব্যাপারে বিধানচন্দ্র সাহায্য করেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু অসুস্থ হবার পর কবিকে কয়েকবার দেখতে আসা ছাড়া তেমন সক্রিয় হয়ে কবির অসুস্থতার ব্যাপারে তাঁকে উদ্যোগী হতে দেখা গেল না কেন তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় কংগ্রেস সম্ভবত নজরুল

বিষয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের আড়ালে বিদ্রোহী নজরুলের দুর্ভাগ্যও আড়ালে চলে যাওয়ায় অসুস্থ নজরুল সম্ভবত সমগ্র দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়েছিলেন। শতবর্ষে এসেও জাতীয় কংগ্রেস যেন নজরুলের ব্যাপারে তাই আড়ালেই থেকে গেলেন। সেই তুলনায় অন্যান্য বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে নজরুলকে শতবর্ষে স্মরণ করতে অকস্মাৎ উদ্যোগী হয়েছেন সন্দেহ নেই। কেন্দ্রীয় স্তরে বিশাল কর্মসূচীর কথাও ঘোষিত হয়েছে। এঁদের এই তৎপরতা খুবই আকস্মিক। সেই কারণেই এ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত নজর রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অন্যদিকে বামপন্থী রাজনীতিতে নজরুল স্বাগত হওয়ায় গোড়া থেকেই তাঁকে কেন্দ্র করে দেশের বামপন্থীদের উৎসাহ অন্তহীন। এ ব্যাপারে অগ্রজ সুহৃদ মুজফ্ফর আহ্মদ নিঃসন্দেহে প্রথম থেকেই যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। মুজফ্ফরের সঙ্গীসাথীরাও অবশ্য এ কাজে মদত দিয়েছিলেন। যেমন হালিম, কুতবউদ্দীন, শামসুদ্দীন তথা কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুরা। যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে অসুস্থ নজরুল বিষয়ে দু'একটি ক্ষেত্রে সাম্যবাদীরাও নজরুলকে যথার্থ বিশ্লেষণে অক্ষম হয়েছিলেন। ফলে সুস্থ অবস্থায়ও ফ্যাসী বিরোধী লেখক সঙ্ঘের আন্দোলনে নজরুলের অনুপস্থিতি আজও অস্বস্তির কারণ হয়ে আছে, অথচ তিনি কেন সেদিন ব্রাত্য বলে বিবেচিত হয়েছিলেন তারও কোনো সংগত কারণ জানা যায়নি। অনেকেই তাঁর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, যোগচর্চা এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা ও চর্চাকে মেনে নিতে পারেননি। যোগী বরদাচরণের সঙ্গে নজরুলের যোগাযোগকে কবির জীবনে অন্যতম 'একটি দুর্ঘটনা' বলেও অনেকের বিশ্বাস। আর এসবের ফলেই তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা চিন্তা সংগ্রাম ও লড়াইকে অনেকেই গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করেছিলেন। 'ধামাধরা' হতে না পারায় কবির জীবনে তখন নিরন্তর শুধু বিড়ম্বনাই জুটেছিল। আসলে তাঁর জীবনদর্শনের মূল কথাই ছিল মানবতাবাদ। মানুষের জয়গানে তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকর্ম নিবেদিত। সাম্য, স্বাধীনতা, সম্প্রীতি ও সম অধিকারের দাবিতে নজরুলের জীবন ও ভাবনার আত্মনিবেদন সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল আর ঠিক সেই কারণেই উভয় সম্প্রদায়ের কিছু ভেকধারী নেতাকে বাদ দিলে বিশাল এক অংশের কাছে কবির জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা ও দর্শনও সম্পূর্ণ ভিন্ন এক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই রূপ গ্রহণ করেছিল। অধিকার অর্জন ও রক্ষা, স্বাধীনতা ও ন্যায়ের সপক্ষে কবি যে প্রতিবাদী আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন সেটা তাই কখনোই কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের পুরোপুরি নেতৃত্বে একটানা পরিচালিত হয়নি। নজরুলের সেই আত্মবিশ্বাস ও স্বঘোষিত সংগ্রামের ডাক একান্ত ভাবেই তাঁর নিজস্ব প্রবণতার প্রতীক। আবেগে মথিত সততার গুণেই তা দেশবাসীর হৃদয়কে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর অভিভাষণ এবং সেই আবেগ ও সততার চিহ্ন বর্তমান। একবার পত্রে নজরুল এ প্রসঙ্গে

লিখেছিলেন, "আমার শক্তি স্বল্প, তবু এই আট বছর ধরে আমি দেশে, গ্রামে গ্রামে কৃষক শ্রমিক তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি—লিখেছি, বলেছি চারণের মত পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি। ... আমার এই দেশ-সেবার, সমাজ সেবার 'অপরাধের' জন্য শ্রীমৎ সরকার বাবাজির আমার উপর দৃষ্টি অতি মাত্রায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। আমার সবচেয়ে চলতি বইগুলোই গেল বাজেয়াপ্ত হয়ে। এই সে-দিনও পুলিশ আবার আমায় জানিয়ে দিয়েছে, আমার নব-প্রকাশিত 'রুদ্রমঙ্গল' আর বিক্রি করলে আমাকে রাজদ্রোহ অপরাধে ধৃত করা হবে। আমি যদি পাশ্চাত্য ঋষি হুইটম্যানের সুরে সুর মিলিয়ে বলি ঃ "Behold, I do not give a little charity,/ When I give, I give myself" ... তা হ'লে সেটাকে অহঙ্কার বলে ভুল করবেন না"।

নজরুলের সেই আত্মত্যাগ আসলে তাঁর দেশপ্রেমের ফল যা কিনা দল-মত নির্বিশেষে পরিচালিত হয়েছিল। তাঁর রাজনীতিও সেদিক থেকে বলতে গেলে আত্মত্যাগ ও আত্মনিবেদনের মন্ত্রে সঞ্জীবিত সম্পূর্ণ ভিন্ন অথচ নিজস্ব এক রাজনৈতিক চিন্তা প্রসূত। এই চিন্তায় তথাকথিত রাজনৈতিক ফর্মুলার সম্পূর্ণ মিল হওয়া অসম্ভব। তারই ফলে পেশাদার রাজনৈতিক আবহাওয়ায় তিনি চিরকালই যেন বেমানান। কবির 'আমার কৈফিয়ৎ' তারই প্রমাণ দেয়। কবি স্বয়ং পেশাদার রাজনীতির পরিণতি ও কুফল সম্পর্কে চিরকালই অনাস্থা প্রকাশ করে এসেছিলেন। সমকালীন নেতৃত্বের বৃহৎ অংশ সম্ভবত সেই কারণেই নজরুলকে মেনে নিতে পারেননি। এঁরাই দল বেঁধে গোড়া থেকে নজরুলকে বিভ্রান্ত ও অ-রাজনৈতিক বলে প্রচার করে এসেছেন। এঁদের মতে "নীতিহীন দোদুল্যমানতা, অন্তঃসারশূন্য প্রগলভতা এবং ভারসাম্যহীন মানসিকতা দিন দিন নজরুলকে চঞ্চল অস্থির, উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছিল যার শেষ পরিণতি সম্পূর্ণ উন্মাদ হওয়া।" হিন্দু-মুসলিম জয়গান সত্ত্বেও নজরুলকে উগ্র জাতীয়তাবাদী, উগ্র আন্তর্জাতিক বিপ্লবী, নাস্তিকতার আতিশয্যের কারণে এঁরাই আজও তাকে 'মূলত মুসলিম মৌলবাদী' হিসেবেই চিহ্নিত করে চলেছেন। এঁরাই অস্বীকার করেন 'ধূমকেতু'র সম্পাদকীয়, যেখানে কবি নজরুল প্রথম প্রকাশ্যে লিখিতভাবে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলেছিলেন। এঁরাই মেনে নিতে অক্ষম তাঁর কারাবাস ও আত্মত্যাগের স্মৃতি। বিস্মৃত হন তাঁর দীর্ঘ আট বছরের তুলকালাম রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড। অথচ তাঁরই মধ্যে সাম্য ও সম্প্রীতি, স্বাধীনতা ও মানবতার জয়গান, নারীর অধিকার বিষয়ক প্রশ্নগুলি একই সঙ্গে প্রথম সোচ্চারিত হয়েছিল। এগুলি নিশ্চয়ই রাজনীতির বহির্ভূত বিষয় নয়। অথচ সেদিনের মত সুবিধাবাদী মহল এগুলোকে আজও গুলিয়ে দেবার জন্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয়। কবির জন্মশতবর্ষে এসব নিয়ে দেশবাসীর সতর্ক হবার প্রয়োজন বর্তমান প্রেক্ষাপটে অবশ্যই আরও জরুরী হয়ে উঠেছে। মনে রাখতে হবে, নজরুল যেমন রাজনীতি বহির্ভূত ছিলেন না তেমন তাঁর দেশপ্রেম ও মানবিক বোধগুলি নিঃসন্দেহে তাঁর নিজস্ব বোধতাড়িত এক

রাজনীতিবোধেরই প্রত্যক্ষ ফল। সুতরাং নজরুলের অজ্ঞাতেই তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও বিস্তার। তথাকথিত পেশাদার চলতি রাজনীতি থেকে তা পৃথক অথচ অনস্বীকার্য।

তথ্যসূত্র

১। শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, নজরুল একটি রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব।
২। আহ্মদ শরীফ, একালে নজরুল ।
৩। রুদ্রলোক (সম্পাদনা ঃ সুন্দরবনের বাঘ), নববর্ষ সংখ্যা, ১৪০২ ও ১৪০৩।
৪। কোরক সাহিত্য পত্রিকা (নজরুল সংখ্যা, সম্পাদনা ঃ তাপস ভৌমিক) বইমেলা ১৪০৫।
৫। নজরুল সমীক্ষণ (প্রবন্ধ সংকলন ঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান)।
৬। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল।
৭। ড. বাঁধন সেনগুপ্ত, নজরুল কাব্যগীতি ঃ বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন ।

নজরুলের রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তা

অরুণাভ ঘোষ

নজরুলের জন্ম ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে, অর্থাৎ ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার। মৃত্যু ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অগস্ট, অর্থাৎ ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১৩ই ভাদ্র রবিবার। ১৯১৯ সালে তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু। ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে বাকশক্তিহীন হয়ে পড়ার মাঝে মাত্র ২২ বছরের সাহিত্য জীবনে নজরুল প্রায় ৩০০০ গান, ৮০০ কবিতা, ১০০ প্রবন্ধ, ১৮টি ছোট গল্প, ৩০টি নাটক ও ৩টি উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে তাঁর প্রতিবাদী চরিত্র, সংবেদনশীল মন ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক জীবন

রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র নজরুল ১৯১৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার আগে সৈন্যদলে নাম লেখান। নজরুল কিন্তু ক্লাসে প্রথম হতেন। তাই পরীক্ষাভীতি নয়; তাঁর দেশপ্রেমই তাঁকে এই সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সামরিক বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করার ব্যাপারে সেই বিদ্যাকে কাজে লাগানো। নজরুল ঊনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্টের দলে ছিলেন। তাঁদের সদর দপ্তর ছিল করাচিতে। সৈনিক হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে নজরুল হাবিলদার পদে উন্নীত হন। বেঙ্গলী রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হলে তিনি ১৯২০ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় আসেন। ইতিপূর্বেই অবশ্য ১৯১৯ সালের মে মাসে 'সওগাত' পত্রিকায় 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' নামে নজরুলের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়েছে। একই বছরে জুলাই মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় 'মুক্তি' শিরোনামে তাঁর একটি কবিতাও ছাপা হয়। কলকাতায় এসে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সংস্পর্শে এসে নজরুলের চিন্তায়-চেতনায় বিপ্লব ঘটে যায়, যা তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপকে এক নতুন খাতে প্রবাহিত করে। ইতিপূর্বে শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক-সন্ত্রাসবাদী যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘটকের সংস্পর্শে এসে নজরুল তাঁদের মতবাদ ও কার্যকলাপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড নজরুলকে অত্যন্ত ব্যথিত করে। 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' নামক প্রবন্ধে তিনি লেখেন, "এই যে সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল যেখানে আমাদের ভাইরা নিজের ত্বকের রক্ত দিয়া আমাদিগকে এমন উদ্বুদ্ধ করিয়া গেল, সেই

জালিয়ানওয়ালাবাগে নিহত সব হতভাগ্যেরই স্মৃতিস্তম্ভ বেদনাশৈলের মত আমাদের সামনে জাগিয়া থাক্... এ ডায়ারকে ভুলিব না, আমাদের মুমূর্ষু জাতিকে চিরসজাগ রাখিতে যুগে যুগে এমনই জল্লাদ কসাই-এর আবির্ভাব মস্ত বড় মঙ্গলের কথা ।... ডায়ারের মত দুর্দান্ত কসাই সেনানী যদি সেদিন আমাদিগকে এমন কুকুরের মত করিয়া না মারিত, তাহা হইলে কি আজিকার মত আমাদের এই হিম নিরেট প্রাণ অভিমান-ক্ষোভে গুমরিয়া উঠিতে পারিত—না, আহত আত্মসম্মান আমাদের এমন দলিত সর্পের মত গর্জিয়া উঠিতে পারিত? কখনই না'।

১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে প্রিন্স অফ্ ওয়েল্সের ভারত ভ্রমণের সময় কংগ্রেস দেশব্যাপী হরতালের ডাক দেয়। নজরুল সেসময় ছিলেন কুমিল্লায়। সেখানে তিনি প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নিয়ে তাঁর স্বরচিত 'জাগরণী' গানটি গেয়েছিলেন—

"ছি ছি ছি ছি
এিকি দেখি
গাহিস তাদেরই বন্দনা গান,
দাস সম নিস্ হাত পেতে দান।
ছি-ছি-ছি ছি-ছি-ছি ওরে তরুণ ওরে অরুণ
নরসূত তুমি, দাসত্বের এ ঘৃণ্য চিহ্ন
মুছিয়া দাও!
ভাঙিয়া দাও, এ-কারা এ-বেড়ী ভাঙিয়া দাও!"

এই গানের মধ্য দিয়ে বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে পরাধীনতার বিরুদ্ধে, দাসত্বের মানসিকতার বিরুদ্ধে দেশের তরুণদের বিবেককে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন নজরুল।

১৯২১ সালের ১লা নভেম্বর করাচিতে বিচারে খিলাফৎ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের দু' বছর কারাদণ্ড হয়। তাঁদের কারাদণ্ডের পটভূমিকায় লিখিত 'বন্দনাগান' কবিতাটিতে নজরুল লিখেছিলেন—

"কাঁদিব না মোরা, যাও কারা-মাঝে যাও তবে বীর সঙ্ঘ হে ,
ঐ শৃঙ্খলই বরিবে মোদের ত্রিশ কোটি ভ্রাতৃ অঙ্গ হে।"

একইভাবে ১৯২২ সালের মার্চ মাসে গান্ধীজিকে বিদেশী শাসকরা ছয় বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলে নজরুল দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর 'অভয়মন্ত্র' কবিতাতে লিখলেন—

"বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয়!
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!
বল্, হউক গান্ধী বন্দী, মোদের সত্য বন্দী নয়!"

ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে গান্ধীজির আবির্ভাব এবং পরাধীন দেশবাসীর মধ্যে তাঁর অসীম প্রভাবের কথা নজরুল বলেছেন তাঁর 'পাগল পথিক' কবিতায়—

"এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙিনায়
ত্রিশকোটি ভাই মরণ হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।
অধীন দেশের বাঁধন বেদন
কে এলো রে করতে ছেদন ?
শিকল দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি শঙ্খ কে বাজায়।।"

এইভাবে সমকালীন প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনায় নজরুলের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। নজরুল যে কতটা রাজনীতি সচেতন ছিলেন, তাঁর এই লেখাগুলিই তার প্রমাণ। ১৯২২ সালেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতিনাট্য 'বসন্ত' নজরুলের নামে উৎসর্গ করে লেখেন—"জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল।"

১৯২০ সালের জুলাই মাসে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও নজরুল যৌথভাবে ফজলুল হকের সহযোগিতায় সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশ করেন। 'নবযুগ' বন্ধ হয়ে গেলে নজরুল নিজের উদ্যোগে 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২২ সালের ১১ই আগস্ট 'ধূমকেতু' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ঐ একই বছরের সেপ্টেম্বরে পূজা সংখ্যায় নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। রাজদ্রোহিতার অভিযোগে 'ধূমকেতু'র ঐ সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত হয়। অক্টোবর মাসে 'ধূমকেতু'তে 'ধূমকেতুর পথ' নামের সম্পাদকীয়তে নজরুল ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবি তোলেন। নভেম্বর মাসে নজরুলের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয় এবং ২৩শে নভেম্বর কুমিল্লায় তিনি গ্রেপ্তার হন। ১৯২৩ সালে ১৬ই জানুয়ারী চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট-এর আদালতে রাজদ্রোহের অভিযোগে নজরুলের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। হুগলি জেলে বন্দী থাকাকালীন বন্দীদের উপর জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে নজরুল ১৫ই এপ্রিল থেকে টানা ৩৯ দিন অনশন করেন। ১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বহরমপুর জেল থেকে নজরুল মুক্তি পান। ১৯২৪ সালের অগস্ট মাসে নজরুলের 'বিষের বাঁশি' এবং 'ভাঙার গান' এই দুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং কয়েকমাসের মধ্যেই দুটি গ্রন্থই সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯২৫ সালের শেষদিকে কলকাতায় 'The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress' গঠিত হয়। হেমন্তকুমার সরকার, কুতবউদ্দীন আহ্‌মদ, শামসুদ্দীন হোসায়ন প্রমুখের সঙ্গে নজরুলও ছিলেন ঐ পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইতিমধ্যে 'ধূমকেতু' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলে ১৯২৫ সালের ১৬ই ডিসেম্বর শ্রমিক, প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়ের মুখপত্র রূপে কলকাতা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকার সঙ্গে নজরুল ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। এই পত্রিকায় তাঁর কৃষক শ্রমিক মজুর সম্পর্কিত কবিতাগুলি পরপর প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক 'কল্লোল' পত্রিকাতেও নজরুলের 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' 'দারিদ্র্য' প্রভৃতি কবিতা প্রকাশিত হয়। 'লাঙল' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাবার পর গঙ্গাধর বিশ্বাস সম্পাদিত 'গণবাণী' পত্রিকাতেও নজরুলের 'রক্ত পতাকার গান', 'জগরু-তূর্য' প্রভৃতি কবিতা

প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯২৬ সালে ব্রিটেনে অনুষ্ঠিত সাধারণ ধর্মঘটের প্রেক্ষাপটে নজরুল 'যা শত্রু পরে পরে' কবিতাটি রচনা করেন। বর্ধমান থেকে প্রকাশিত 'শক্তি' পত্রিকায় কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়, পরে তা পুনর্মুদ্রিত হয় 'গণবাণী'তে ১৯২৬ সালের ১২ই অক্টোবর। শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সংগীত 'ইন্টারন্যাশনাল'-এর নজরুলকৃত অনুবাদ 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত' গণবাণীতে ছাপা হয় ১৯২৭ সালের ২১শে এপ্রিল। ১৯২৬ সালের ২২শে মে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নজরুল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন সভ্য ছিলেন। সম্মেলন উপলক্ষ্যে তিনি একটি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তোলেন। সম্মেলন শুরু হবার আগের দিন, ২১শে মে, নজরুল ফিল্ড মার্শালের পোষাক পরে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী পরিচালনা করেছিলেন। ঐ একই বছরে নজরুল কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ২৯শে নভেম্বর অনুষ্ঠিত ঐ নির্বাচনে নজরুল অবশ্য পরাজিত হন।

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হবার একমাসের মধ্যে নজরুলের কাব্যগ্রন্থ 'প্রলয় শিখা' সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। অক্টোবরের ২৫ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হয় এবং নভেম্বরের ৬ তারিখে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০ নজরুলের ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়, তিনি অবশ্য ২৩শে ডিসেম্বর পর্যন্ত জামিন পান। পরবর্তীকালে নজরুল রাজদ্রোহিতার অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলেও 'প্রলয়শিখার' উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা পরাধীন ভারতে আর ওঠেনি। একই ভাবে ১৯৩১ সালের ১৪ই অক্টোবর নজরুলের হাস্যরসাত্মক সঙ্গীত গ্রন্থ 'চন্দ্রবিন্দু'র উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ১৯৪২ সালে কবি বাক্‌শক্তিহীন হবার পরে ১৯৪৫ সালের ৩০শে নভেম্বর গ্রন্থটির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়।

সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায় নজরুল

নজরুলের বিদ্রোহী চেতনা এবং প্রতিবাদী লেখনী ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে উজ্জীবিত করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে বৈদেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে মুখর কবিকে একাধিকবার কারাবরণ করতে হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন লেখা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল, ১৯২২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর দুর্গাপুজোর ঠিক আগে 'ধূমকেতু' পত্রিকায় নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক কবিতাটি ছাপা হয়। নজরুল লিখলেন—

"আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল ?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসী,
ভূভারত আজ কসাইখানা,—আসবি কখন সর্বনাশী ?"

সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক এই কবিতা প্রকাশিত হবার পর নজরুলকে কারান্তরাল যেতে হয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সরাসরি অত্যাচারী চণ্ডাল বলার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন নজরুল। ইংরেজ বণিকদের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকে নিন্দা করে নজরুল লিখেছিলেন—

"অন্যায় রণে যারা যত দড় তারা তত বড় জীবন্ত
মহারথী শিশুরে বাঁধিয়া ফুলায় বেহায়া ছাতি ।
তোমার চক্র রুধিয়াছে আজ
বেনের রৌপ্য চাকায়, কি লাজ!"

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের স্বরূপ উদঘাটন করে নজরুল লিখেছিলেন—

"পরের মুলুক লুট করে খায়, ডাকাত তারা ডাকাত
তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত।"

১৯২২ সালের ১৩ই অক্টোবর 'ধূমকেতু' পত্রিকায় নজরুল লেখেন ঃ 'স্বরাজ-টরাজ বুঝিনা, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশ ও বিদেশীদের অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুঁটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষে করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে", অর্থাৎ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী নজরুল তুলেছেন ১৯২২ সালেই, যখন গান্ধীজি, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ জাতীয় নেতারা 'ডোমিনিয়ন স্টেটাসের' বেশী কিছু চাইবার কথা ভাবতে পারেন নি। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে প্রথম পূর্ণ স্বরাজের দাবী তোলা হয়, যা নজরুলের লেখায় স্থান পেয়েছিল সাত বছর আগেই।

গান্ধীজির 'ডোমিনিয়ন স্টেটাসের' দাবী নজরুল পছন্দ করেন নি। 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' নামে তিনি একটি ব্যঙ্গ কবিতাও লেখেন। কবিতাটি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'চন্দ্রবিন্দু'তে স্থান পায়। কবিতাটিতে নজরুল লেখেন—

"ঠুঁটো হলেও হাত পেলি তো!
ছিলি যে একদম বেহাত!
একেবারে ঠ্যাং ছিল না,
পেলি ত এক ঠ্যাং নেহাৎ।
ভিক্ষের চাল কাঁড়াই হোক আর
আঁকাড়া—তাই ঝোলায় ভর।

ওই চিবিয়ে জল খেয়ে থাক।
ফেন্‌ও পাবি অতঃপর।।
ধৈর্য ধরে থাকে বেড়াল
তাই ত শেষে পায় কাঁটা
পাত হতে সে মাছ তুলে নেয়,
তেমনি সে যে খায় ঝাঁটা।"

'মোরা সবাই স্বাধীন, মোরা সবাই রাজা' নামক প্রবন্ধে নজরুল লিখেছেন—'স্বরাজ মানে কি? স্বরাজ মানে নিজেই রাজা বা সবাই রাজা, আমি কারুর অধীন নই, আমরা কারুর সিংহাসন বা পতাকাতলে আসীন নই। ... এই অহম জ্ঞান, আত্মজ্ঞান—অহঙ্কার নয়, এ হচ্ছে আপনার উপর অটল বিরাট বিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাস না থাকলে মানুষ কাপুরুষ হয়ে যায়, 'ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়।' স্বরাজ আসলেই যে স্বাধীনতা আসবেনা সে বিষয়ে নজরুলের স্পষ্ট ধারণা ছিল। তিনি ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন—

"রবে নাক ম্যালেরিয়া মহামারী,
স্বরাজ আসিছে চড়ে জুড়ি গাড়ী"

তিনি আরও লিখেছিলেন—'ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন।' ১৯২০ সালে প্রকাশিত সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগে'র সম্পাদকীয় নিবন্ধে স্বাধীনতা সম্পর্কে নজরুল লেখেন—"কাহাকেও কেহ কখনো চিরদিন অধীন করিয়া রাখিতে পারে নাই, কারণ ইহা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কেহ কখনো জয়ী হইতে পারে না। আজ যাহারা স্বাধীন হইয়া নিজের অধীনতার কথা ভুলিয়া অন্যকেও আবার অধীনতার যাঁতায় পিষ্ট করিতেছে তাহারাও চিরকাল স্বাধীন ছিল না। শক্তি লাভ করিয়া যাহারা শক্তির এমন অপব্যবহার করিতেছে কে জানে প্রকৃতি তাহাদের এই অপরাধের পরিণাম কত নির্মম হইয়া লিখিয়া রাখিয়াছে। ... অত্যাচারীকে অত্যাচারের প্রতিফল ভোগ করিতেই হইবে। আজ আমি যাহার উপর প্রভুত্ব করিয়া তাহার প্রকৃতিদত্ত স্বাধীনতা মনুষ্যত্ব ও সম্মানকে হনন করিতেছি, কাল যে সেই আমারই মাথায় পদাঘাত করিবে না তাহা কে বলিতে পারে? শক্তি সম্পদের ন্যায্য ব্যবহারেই বৃদ্ধি, অন্যায় অপচয়ে তাহার লয়।"

নজরুল মনে করতেন স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হল আত্মবিশ্বাস, আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস। নিজের উপর যার বিশ্বাস নেই, আত্মশক্তিকে যে উপলব্ধি করে না, সে পরনির্ভরশীলতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়, স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। তাই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার অর্থ শুধুমাত্র দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়ন নয়, আত্মশক্তির জাগরণ, আত্মশক্তির উপলব্ধি। নজরুল লিখেছিলেন—"তোমার আত্মশক্তি যদি উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে তবে বিশ্বে এত বড় দানব শক্তি নেই যা তোমাকে পায়ের তলায় ফেলে রাখে। নির্যাতন যদি সয়ে থাকে, তবে সে দোষ তোমারি। নিজের দুর্বলতার জন্য অন্যের শক্তির নিন্দা করো না।' তিনি বিশ্বাস করতেন 'পরাবলম্বন মানেই দাসত্ব। এই মনের

পরাবলম্বন বা—আমাদের চির গোলাম করে রেখেছে।" ধর্মীয়সংস্কার, ধর্মভীরুতা থেকেই আসে পরনির্ভর-শীলতা। ভগবানে বিশ্বাসী মানুষ, আত্মশক্তিহীন মানুষ নিজের সকল দায় দায়িত্ব ঈশ্বরের উপর অর্পণ করে। কিন্তু নজরুলের মতে, মানুষ আত্মশক্তিকে হারিয়ে ফেললে ঈশ্বরকেও হারায় আত্মশক্তি জাগলে তবেই ঈশ্বর জাগেন ।

নিরস্ত্র জনগণের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করার পথ হিসাবে নজরুল 'গণ আন্দোলনের' উপর জোর দিয়েছিলেন, শ্রমিক প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়ের গঠনতন্ত্রে তিনি লিখেছিলেন—"বোমা এবং পিস্তলের শক্তি অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী গণ-আন্দোলনের চলমান শক্তির প্রয়োগ দ্বারাই নিরস্ত্র জাতির পক্ষে স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া বোধ হইতেছে।" ঐ গঠনতন্ত্রে আরও লেখা হয় "শ্রমিক প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায় এই ঘোষণা করিতেছে যে, ভারতের জাতীয় দাবী পূরণের একমাত্র অবশিষ্ট উপায় এই যে, দেশের শতকরা আশিজন যাহারা—সেই শ্রমিক ও কৃষকগণকে সংঘবদ্ধ করা এবং তাহাদিগকে জন্মগত অধিকার লাভে সাহায্য করা, যাহাতে তাহারা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে আরও সচেতন হইয়া নিজের ক্ষমতায় এবং নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাশালী স্বার্থপর ব্যক্তিগণের হাত হইতে স্বাধীনতা আনিতে পারে। "

শান্তিপূর্ণ, অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব বলে নজরুল মনে করেন নি । তাই তিনি লিখেছিলেন—

"সুতো কেটে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুনি,
জাগোরে জোয়ান বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি।"

আপসের পথে যে স্বাধীনতা আসবে না, আবেদন নিবেদনে কাজ হবে না, প্রয়োজন সশস্ত্র সংগ্রামের সে ব্যাপারে নজরুল নিশ্চিত ছিলেন। ১৯২২ সালের ১৩ই অক্টোবর 'ধূমকেতু' পত্রিকায় তিনি লেখেন—

"আজাদী মেলে না দস্তানায়।
দস্তা নয় সে সস্তা নয়,"

অর্থাৎ স্বাধীনতা অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। দস্তার মত স্বল্প মূল্যের ধাতব বস্তু নয়। স্বাধীনতা সহজলভ্য নয়। তার জন্য অনেক মূল্য দিতে হয় ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। 'আজাদী'র জন্য তিনি বলেছেন—

"কুরবানী কর শ্রেষ্ঠ পুত্রধন।"

অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র সন্তানকেও উৎসর্গ করার কথা তিনি বলেছেন। সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগের' সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—"এখনো বিশ্বে দানব শক্তির বজ্রমুষ্টি আমাদের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। এ অসুর শক্তি ধ্বংস না হইলে দেবতা বাঁচিবে না। যজ্ঞ জ্বলুক। হোমশিখায় যদি কেহ যোগ না দেয়, আমরা আমাদের প্রাণ আহুতি দিব।" তিনি আরও লিখলেন—'আমরা আমাদের

দেশের জন্য, মুক্তির জন্য কি দুঃখ দৈন্যকে বরণ করিয়া লইতে পারিব না? তুমি কি চাও? কুকুর বিড়ালের মত ঘৃণ্য মরা মরিতে, না মানুষের মত মরিয়া অমর হইতে? তুমি কি চাও? শৃঙ্খল না স্বাধীনতা? তুমি কি চাও? তোমাকে লোকে মানুষের মত ভক্তি শ্রদ্ধা করুক, না পা-চাটা কুকুরের মত মুখে লাথি মারুক? তুমি কি চাও ? উষ্ণীষ মস্তকে উন্নতশীর্ষ হইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া পুরুষের মত গৌরব দৃষ্টিতে অসঙ্কোচে তাকাইতে, না নাঙ্গা শিরে প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া কুব্জ পৃষ্ঠে গোলামের মত অবনত হইয়া হুজুরীর মতলবে শরমে চক্ষু নত করিয়া থাকিতে? যদি এই শেষের দিকটাই তোমার লক্ষ্য হয় তবে তুমি জাহান্নমে যাও। তোমার শরমের গোষ্ঠী লইয়া খাও আর পা চাট, আর যাহারা ত্যাগকে বরণ করিয়া লইতে পারিবে, যাহারা ঘরে মুখ মলিন দেখিয়া গলিয়া যাইবে না, যাহাদের জান দিবার মত গোর্দা আছে, আঘাত সহিবার মত বুকের পাটা আছে, তাহারা বাহির হইয়া আইস।" নজরুল এখানে দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীকে ত্যাগের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন, আঘাত সইবার মত মানসিকতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন এবং সর্বোপরি আত্মবলিদানে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। স্বাধীনতার জন্য প্রাণ 'আহুতি' দেওয়াকে তিনি মহান কর্তব্য বলে মনে করেছেন। তিনি লিখেছিলেন—

"দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের,
সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের ।"

'শিকল পরার গান' কবিতায় নজরুল লিখেছেন—

"তোমরা ভয় দেখিয়ে কর্‌ছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধর্‌ব টিপে কর্‌ব তারে লয়,
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আন্‌ব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি পরে আন্‌ব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল ।।

* * *

মোদের অস্থি দিয়েই জ্বল্‌বে দেশে আবার বজ্রানল।।"

এখানে দেশের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী রণকৌশলের সমর্থন লক্ষ করা যায়। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে নজরুল দেশে আগুন জ্বালাবার কথা বলেছেন। হাসি মুখে মৃত্যুবরণের আহ্বান জানিয়েছেন। বিদ্রোহীদের মুখ দিয়ে নজরুল 'যুগান্তরের গান' কবিতায় বলিয়েছেন—

"দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি
হাসি জোর জয়ের হাসি,
অ-বিনাশী নাইক মোদের ডর রে।"

অর্থাৎ অহিংসা নয়, প্রার্থনা বা করুণা ভিক্ষা নয় 'আঘাত', বলপ্রয়োগ ও সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব বলে নজরুল মনে করেছিলেন। "সেবক" কবিতায় নজরুল লিখেছেন—

"সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারী খাঁড়ায়,
নেই কি রে কেউ সত্য সাধক বুক খুলে আজ দাঁড়ায়?—
শিকলগুলো বিকল ক'রে পায়ের তলায় মাড়ায়,—
বজ্র হাতে জিন্দানের ঐ ভিত্তিটাকে নাড়ায়?"

তিনি আরও লেখেন—

"বিশ্বগ্রাসীর ত্রাস নাশি' আজ আসবে কে বীর এসো
ঝুট শাসনে করতে শাসন, শ্বাস যদি হয় শেষও!
—কে আছ বীর এসো!"

এখানে সাম্রাজ্যবাদী 'ঝুট' শাসন থেকে মুক্ত হবার জন্য মৃত্যুবরণের কথা বলেছেন নজরুল।

মহাশক্তিধর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সিংহের সাম্রাজ্যের ভিত যে নড়বড়ে হয়ে পড়েছে নজরুল তা বুঝতে পেরেছিলেন । সারা পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের জয়ের বার্তা তিনি ঘোষণা করেছিলেন তাঁর কবিতার মাধ্যমে—

"রাজ্যে যাদের সূর্য অস্ত যায় না কখনো, শুনিস হায়,
মেরে মেরে যারা ভাবিছে অমর, মরিবে না কভু মৃত্যু ঘায়,
তাদের সন্ধ্যা ঐ ঘনায়!
চেয়ে দেখ্ ঐ ধূম্রচূড়
অসন্তোষের মেঘ গরুড়
সূর্য তাদের গ্রাসিল প্রায়।
ডুবেছে যে পথে রোম-গ্রীক-প্যারী—সেই পথে যায়
অস্ত যায়
ওদের সূর্য!—দেখিবি আয়;
অর্ধ পৃথিবী জুড়ে হাহাকার, মড়ক, বন্যা, মৃত্যুত্রাস ।
বিপ্লব, পাপ, অসূয়া, হিংসা, যুদ্ধ শোষণ রজ্জুপাশ,
আনিল যাদের ক্ষুধিত গ্রাস—
তাদের সে লোভ—বহ্নি শিখ্
জ্বালায়ে জগৎ, দিগ্বিদিক,
ঘিরেছে তাদেরি গৃহ—সাবাস।
যে আগুনে তারা জ্বালালো ধরা তা' এনেছে তাদেরি সর্বনাশ!
আপনার গলে আপন ফাঁস!"

সাম্যবাদের কবি

নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন যে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতাই যথেষ্ট নয়, মানুষের সার্বিক মুক্তিই পারে মানুষকে প্রকৃত স্বাধীনতার সন্ধান দিতে। তাই শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন। নজরুলের লেখনী শুধু ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, গর্জে উঠেছিল দেশীয় বণিক, জমিদার, জোতদার, মোল্লা ও পুরোহিতদের বিরুদ্ধেও। তিনি জানতেন বিদেশী শোষকদের মত স্বদেশী শোষকরাও মানুষের শত্রু । মানুষের মুক্তির জন্য তাদের শোষণ বন্ধ করা প্রয়োজন। শ্রমিক কৃষক, জেলে, তাঁতী প্রভৃতি সমাজের খেটে খাওয়া, নীচের তলার মানুষের সুখ-দুঃখ নজরুলের কবিতায় স্থান পেয়েছে ।তাঁর 'সর্বহারা' 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান', 'ধীবরদের গান', 'কুলী ও মজুর' তাঁর শ্রেণীচেতনা এবং সমাজের অবহেলিত অংশের মানুষদের প্রতি তাঁর সংবেদনশীলতার প্রমাণ। তাঁর কবিতায় ঐ সব হৃতদরিদ্র মানুষ শুধু স্থানই পায়নি, তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তাদের প্রেরণা জুগিয়েছেন। সহজ সরল ভাষায় তাদের উৎসাহিত করেছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন।'কৃষাণের গান' কবিতায় নজরুল লিখেছেন—

> "আজ জাগরে কৃষাণ, সব ত গেছে কিসের বা আর ভয়,
> এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।"

'চোর ডাকাত' কবিতায় তিনি লিখেছেন—

> "রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত ইটে,
> ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে।
> দিব্যি পেতেছ খল কলও'লা মানুষ পেষানো কল,
> আখ-পেষা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব-দল!
> কোটি মানুষের মনুষ্যত্ব নিঙাড়িয়া কলওয়ালা
> ভরিছে তাহার মদিরা পাত্র, পুরিছে স্বর্ণজালা!
> বিপন্নদের অন্ন ঠাসিয়া ফোলে মহাজন ভুঁড়ি
> নিরন্নদের ভিটে নাশ ক'রে জমিদার চড়ে জুড়ি !
> পেতেছে বিশ্বে বণিক-বৈশ্য অর্থ-বেশ্যালয়
> নীচে সেথা পাপ-শয়তান-সাকী, গাহে যক্ষের জয়!
> অন্ন, স্বাস্থ্য, প্রাণ, আশা, ভাষা হারায়ে সকল কিছু
> দেউলিয়া হ'য়ে চলেছে মানব ধ্বংসের পিছু পিছু ।"

'ডাকু ধনিকের কারখানা'য় শোষণের স্বরূপ, মহাজন ও জমিদারের প্রতি নজরুলের ঘৃণা এখানে স্পষ্ট রূপ পেয়েছে। 'কুলী ও মজুর' কবিতায় নজরুল লিখেছেন—

> "আসিতেছে শুভদিন,
> দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!

হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান,
তাঁদের বক্ষে পা ফেলে মোদের আসে নব উত্থান।
তুমি শুয়ে র'বে তেতালার 'পরে আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে-ভরসা আজ মিছে!
সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটির মমতা রসে
এই ধরণীর তরণীর হাল র'বে তাহাদেরই বশে!"

নজরুল এখানে আশাবাদী। খেটে খাওয়া মানুষই যে ভবিষ্যতের ভাগ্য নিয়ন্তা, সেই প্রকৃত 'মানুষদের হাতেই যে 'এই ধরণীর তরণীর হাল' থাকবে সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। তিনি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষারত। 'শ্রমিকের গান' কবিতায় নজরুল লিখেছেন—

"ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রী দল!
ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।।
আমরা হাতের মুখে পড়েছি ভাই,
পায়ের সুখে ভাঙ্ব চল।
ধর হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।।
ও ভাই আমাদেরই শক্তি বলে
পাহাড় টলে তুষার গলে
মরুভূমে সোনার ফসল ফলে রে !
মোরা সিন্ধু ম'থে এনে সুধা
পাই না ক্ষুধায় বিন্দু-জল।
ধর্ হাতুড়ি তোল্ কাঁধে শাবল ।।"

এখানে সমাজ গড়ার কাজে, উৎপাদনের কাজে শ্রমিকদের ভূমিকা স্মরণ ক'রে নজরুল তাদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হ'তে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

"প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ ।"

নিম্নশ্রেণীর মানুষের সুখ-দুঃখ অনুভূতি নিয়ে কাব্য রচনায় বাংলা সাহিত্যে নজরুলকে অনায়াসেই পথিকৃতের আসনে বসানো যায় ।

সমাজ-পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে নজরুল তাঁর 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় লিখেছেন—

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন!
আসছে নবীন—জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন!
তাই সে এমন কেশে-বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে
মধুর হেসে!
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির সুন্দর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।"

নজরুলের কাছে প্রলয় ও ধ্বংস নতুন সৃষ্টির, নতুন সমাজের ইঙ্গিতবাহী। প্রলয়ের অন্তরালে 'নূতন সৃজনের সম্ভাবনার কথাই নজরুল বলেছেন। এই 'প্রলয়োল্লাস' কবিতাটি সম্বন্ধে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন—"১৯২১ সালের শেষাংশে আমরা দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলব স্থির করেছিলাম। কাজী নজরুল ইসলামও আমাদের এই পরিকল্পনায় ছিল। আমাদের এই পরিকল্পনা হ'তেই সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর সুবিখ্যাত 'প্রলয়োল্লাস' কবিতা তার 'সিন্ধুপারের আগল ভাঙা' মানে রুশ বিপ্লব"।

'প্রলয়োল্লাস' ছাড়াও নজরুলের 'বিদ্রোহী', 'ঝড়' 'ধূমকেতু', ভাঙার গান', 'ফরিয়াদ' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর বৈপ্লবিক মানসিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। বিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে 'ভাঙার গান' কবিতায় নজরুল লিখেছেন—

"কারার এ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল্, কর্‌রে লোপাট
রক্ত-জমাট শিকল-পূজার পাষাণ বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈষাণ!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ!
ধ্বংস-নিশান উড়ুক প্রাচীন প্রাচীর ভেদি!"

"কারার ঐ লৌহ কপাট" এখানে প্রতীকী অর্থে সামাজিক শোষণের কারাগার। 'নিপীড়িত জনগণ'কে শোষণের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে বলে নজরুল তাঁর 'ফরিয়াদ' কবিতায় লিখেছেন—

"ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা, শঙ্কা নাহিক' আর!
মরিয়ার মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে 'মার মার'।
রক্ত যা ছিল করেছে শোষণ,
নিরক্ত দেহ হাড় দিয়ে রণ!
শত শতাব্দী ভাঙেনি যে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান—
"জয় নিপীড়িত জনগণ জয়!" জয় নব উত্থান!"

নজরুল এখানে আসন্ন বিপ্লবের জয়গান করেছেন, শোষিত, নিপীড়িত জনগণের উত্থানকে স্বাগত জানিয়েছেন। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া 'মরিয়া' মানুষ প্রতিবাদের পথে যাওয়ায় ভবিষ্যৎ সমাজ সম্পর্কে তিনি আশাবাদী। 'ভাঙার গান' কবিতাটিতে

সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে নজরুলের বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন—

"লাথি মার্, ভাঙরে তালা!
যত সব বন্দীশালায়—
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি!"

আবার 'দুঃশাসনের রক্তগান' কবিতায় অত্যাচারী বিদেশী শাসকদের উদ্দেশে নজরুল লিখেছেন—

"অত্যাচারী সে দুঃশাসন
চাই খুন তার চাই শাসন।"

নজরুল যে আপসকামী নন, তিনি যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পক্ষে তা এখানে সুস্পষ্ট। বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত মানুষের পক্ষ নিয়ে সংগ্রামে নজরুল ছিলেন সোচ্চার। শুধু সমবেদনা জ্ঞাপন নয়, তিনি সর্বহারাদের সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সামিল করতে চেয়েছিলেন নিজেকে। তাঁর এই ভূমিকা তাঁকে 'সাম্যবাদের কবি' আখ্যা দিয়েছিল। ১৯২৫ সালে নজরুল 'সাম্যবাদী' নামে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি 'লাঙল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। নজরুল পরিচালিত ঐ পত্রিকায় সাম্যবাদের উপর অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। মার্ক্স ও লেনিনের জীবন ও দর্শন নিয়েও কয়েকটি প্রবন্ধ ঐ পত্রিকায় স্থান পায়। 'সাম্যবাদী' কবিতায় নজরুল লেখেন—

"সাম্যের গান গাই
যেখানে আসিয়া সমবেদনায় সকলে হয়েছি ভাই।
এ প্রশ্ন অতি সোজা,
এই ধরণীর সন্তান, কেন কেউ রাজা, কেউ প্রজা?
অদ্ভুত দর্শন—
এই সোজাকথা বলি যদি ভাই, হবে তাহা 'সিডিশন'।"

রাজা ও প্রজার মধ্যে ভেদাভেদির অদ্ভুত দর্শন নজরুল মেনে নিতে পারেন নি। শোষণের বিরুদ্ধে, শোষকের বিরুদ্ধে, শোষিতের হয়ে তাঁর লড়াই সাম্যের পক্ষে। অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তিই যে প্রকৃত মুক্তি সে ব্যাপারে নজরুলের ধারণা ছিল স্বচ্ছ। কেবল বিদেশী শোষক নয়, দেশীয় শোষকদের থেকেও নজরুল সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় তিনি লিখেছিলেন—

"মহা বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না—
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—"

বিশ্বাস করতেন সকল উৎপীড়ন আর অত্যাচারের অবসান হওয়া সম্ভব একমাত্র সাম্যবাদী সমাজে। 'ফরিয়াদ' কবিতায় নজরুল লিখেছেন—

"রবি-শশী তারা প্রভাত সন্ধ্যা তোমার আদেশ বহে—
এই দিবা রাতি আকাশ বাতাস নহে একা কারো নহে।
এই ধরণীর যাহা সম্বল,
বাসে-ভরা ফুল, রসে-ভরা ফল,
সুস্নিগ্ধ মাটি, সুধাসম জল, পাখীর কণ্ঠে গান, —
সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর 'ফরমান'—"

অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত ভোগ্যবস্তুর উপর সকলের সমান অধিকার আছে। নজরুল এখানে বঞ্চনার বিরুদ্ধে, সাম্যের পক্ষে, সমান সুযোগ সুবিধার পক্ষে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কবি

প্রবাদপ্রতিম কবি অন্নদাশংকর রায় অত্যন্ত সঠিক ভাবেই বলেছিলেন—

"ভুল হ'য়ে গেছে বিলকুল
আর সবকিছু ভাগ হ'য়ে গেছে
ভাগ হয়নি কো নজরুল ।"

সত্যিই নজরুল ইসলাম নামে মুসলমান হলেও ছিলেন প্রকৃত অর্থেই একজন 'সেকুলার' মানুষ। ধর্মীয় পরিচয় তাঁকে কোন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করতে পারেনি। মানুষকে তিনি প্রকৃত অর্থেই 'মানুষ' হিসাবে দেখেছেন, কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীর অংশ হিসাবে নয়। নজরুল লিখেছিলেন—

"মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান,
মুসলিম তার নয়নমণি হিন্দু তাহার প্রাণ।"

এ শুধু কথার কথা নয়, এ তাঁর অন্তরের উপলব্ধির অভিব্যক্তি। 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায় নজরুল দেশের কাণ্ডারী, জাতির নায়কের উদ্দেশে লিখেছিলেন—

"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!"

ধর্মীয় পরিচয় নয়, জাত-পাতের হিসাব নয় 'মানুষ' পরিচয়টাই ছিল তাঁর কাছে প্রধান। 'সাম্যবাদী' কবিতায় নজরুল লিখেছিলেন—

"মানুষেরে ঘৃণা করি'
ও কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল, চুম্বিছে মরি মরি!
ও'মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর ক'রে কেড়ে,
যাহারা আনিল গ্রন্থ-কেতাব সেই মানুষেরে মেরে
পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল!—মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ,—গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো!"

'সাম্যবাদী'তেই নজরুল লিখেছেন—

"কোথা চেঙ্গিস্, গজনী মামুদ, কোথায় কালাপাহাড়?
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার!
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা,
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা।"

ধর্মীয় ভণ্ডামির বিরুদ্ধে, ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে নজরুল এখানে সরব। ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে মানুষকে আবদ্ধ রাখার বিরুদ্ধে তিনি।

১৯২৬ সালের এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে কলকাতায় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বারবার দাঙ্গা বেধে যায়। ব্যথিত নজরুলের মনোভাব ধরা পড়ে তাঁর 'মন্দির ও মসজিদ' এবং 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধ দুটিতে। ধর্মীয় বিভেদে কাতর হ'য়ে মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধে নজরুল লিখেছেন—"ভূতে পাওয়ার মত ইহাদের মন্দিরে পাইয়াছে, ইহাদের মসজিদে পাইয়াছে। ইহাদের বহু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। ... আমি শুনিতেছি মসজিদের আজান আর মন্দিরের শঙ্খধ্বনি। তাহা একসাথে উত্থিত হইতেছে ঊর্ধ্বে—স্রষ্টার সিংহাসন পানে।" 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে নজরুল লিখেছিলেন "টিকি-দাড়ির উপর আমার এত আক্রোশ এই জন্যে যে, এরা সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে যে, তুমি আলাদা আমি আলাদা। মানুষকে তার চিরন্তন রক্তের সম্পর্ক ভুলিয়ে দেয় এই বাইরের চিহ্নগুলো।" এখানেও সেই মানবসত্তার কথা, মনুষ্যত্বের কথা এবং ধর্মভিত্তিক বিভাজনের বিরুদ্ধে নজরুলের অসন্তোষ ব্যক্ত হয়েছে। আশাবাদী কবি তাঁর 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' কবিতাতে লিখেছেন—

"যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির-চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া।
প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।"

'ছুঁতমার্গ' নামক প্রবন্ধে নজরুল লিখেছিলেন—"আমাদের গভীর বিশ্বাস যে, হিন্দু-মুসলমান মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে যে ছোঁয়া-ছুঁয়ির জঘন্য ব্যাপারটাই। ইহা যে কোনো ধর্মেরই অঙ্গ হইতে পারে না তাহা কোনো ধর্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান না থাকিলেও আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। কেননা একটা ধর্ম কখনো এত সঙ্কীর্ণ হতে পারে না। ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য।" 'জাত জালিয়াৎ' নামক কবিতায় নজরুল লিখেছিলেন—

"এখন দেখি ভারত জোড়া,
পড়ে আছে বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া।।
জানিস না কি ধর্ম সে যে বর্মসম সহনশীল,
তাকে কি ভাই ভাঙতে পারে ছোঁয়া ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল'।।

যে জাত-ধর্ম ঠুনকো এত,
আজ নয় কাল ভাঙবে সেত,
যাক্ না সে জাত জাহান্নমে, রইবে মানুষ নাই পরোয়া।।"

নজরুল এখানে ধর্মের সহনশীলতার কথা বলেছেন, মহানতার কথা বলেছেন,—যা জাত পাত, 'ছোঁওয়া ছুঁয়ি' প্রভৃতি সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে। এখানেও তিনি 'মানুষের' জয়গান করেছেন। নজরুল লিখেছিলেন, (ছুঁতমার্গ)—"হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমাহারা মুক্তির মাঠে দাঁড়াইয়া—মানব! তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি! বলো দেখি, "আমার মানুষ ধর্ম।" ধর্মীয় বিভেদ, জাত-পাতের ঊর্ধ্বে উঠে সকল ভারতীয়কে দেশমাতৃকার সন্তান হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছিলেন নজরুল। তিনি এমন একটা সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন "যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান যেখানে মিলিছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।" নজরুল চেয়েছিলেন বাংলা তথা ভারতের মানুষের আত্মিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে। ধর্মীয় বিভেদ বা জাত পাতের বিচার যাতে সেখানে ফাটল ধরাতে না পারে, যাতে অনৈক্য সৃষ্টি করতে না পারে—সেটাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। তিনি লিখেছিলেন—"হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, এ আমিও মানি। এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ অশ্রদ্ধা দূর হ'তে পারে।"

নজরুল কবি, সঙ্গীতকার, প্রাবন্ধিক। তাঁর সাহিত্যিক পরিচয় সর্বজনবিদিত। কিন্তু তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির পশ্চাতে রাজনৈতিক আবেগ কাজ করেছিল। তাঁর অসন্তোষ, তাঁর প্রতিবাদ, তাঁর সংগ্রামী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। নজরুলের এই রাজনৈতিক সত্তাকে গুরুত্ব না দিয়ে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের প্রকৃত রসাস্বাদন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নজরুলকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব না দিলে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হবে।

নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম ঃ একটি পর্যবেক্ষণ

অঞ্জন বেরা

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) জন্মশতবর্ষে যেন নতুনতর তাৎপর্য নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। জাতীয় জীবনের এক কঠিন পর্বে জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে নজরুল স্মরণ পেয়েছে এক ভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা। নজরুলের সৃষ্টি— কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ নিয়ে এমন কি শতবর্ষেও নানা মতের বিচিত্র সমাবেশ অবাক করার মতো। এই মতের অনেকটাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবজ্ঞা-জাত, এমন কথাও অস্বীকার করা যায় না। যদিও অবদানের বিশাল, বহুমাত্রিক পার্থক্য সত্ত্বেও কবি ও সঙ্গীতকার হিসাবে জনমানসে নজরুলের গ্রহণযোগ্যতা ও স্থায়িত্ব বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই। এটা বাস্তব সত্য।

অবাক করার মতো বিষয় হলো নজরুল সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গিগত সংঘাত সেই বিশের দশকের গোড়া থেকেই। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের গোড়া থেকেই। এর কারণ বহুবিধ ও বহুমাত্রিক। কিন্তু যদি একটি কেন্দ্রীয় কারণকে চিহ্নিত করতে হয় তবে নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মকাণ্ডকেই প্রথম নজর না করে উপায় নেই।

সাতাত্তর বছর বাঁচলেও, জীবনের শেষ পঁয়ত্রিশ বছর নজরুল ছিলেন জীবন্মৃত। থেমে গিয়েছিল তাঁর কণ্ঠ ও কলম। ফলে তাঁর সৃষ্টিশীল জীবন প্রকৃত অর্থে খুব বেশি হলে বাইশ-তেইশ বছরের। ছাপার অক্ষরে নজরুলের প্রথম লেখা 'বাউণ্ডুলের আত্মকাহিনী' প্রকাশিত হয় মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন সম্পাদিত মাসিক 'সওগাত' পত্রিকার ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। ইংরাজী ক্যালেন্ডারে ১৯১৯ সালের মে-জুন। আর স্থায়ীভাবেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ১৯৪২-এর জুলাই মাসে। ফলে তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনের এই তেইশ বছরই সাধারণের কাছে উন্মোচিত। কিন্তু ক্যালেন্ডারের পাতায় তেইশ বছর সময় হিসেবে সামান্য হলেও আমাদের জাতীয় জীবনে তা তুলনাহীন তাৎপর্যে মণ্ডিত একটি পর্ব। ঐ সময়ের অভিঘাতই কখনও কখনও ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবিত করে। যেমনটি হয়েছিল নজরুলের ক্ষেত্রে। তার রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে।

নজরুলের রাজনৈতিক জীবন প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি আলোচিত সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। বিশেষত মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রসঙ্গ সর্বাধিকআলোচিত বিষয়। এটা বাস্তব যে এদেশে, বিশেষত অবিভক্ত বাংলায় সাম্যবাদী আন্দোলনের বিকাশের পর্বে নজরুল তার খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। কিন্তু নজরুল কমিউনিস্ট ছিলেন না। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য তিনি কখনও হননি। কিন্তু সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে নৈকট্য নজরুলের সৃষ্টিশীল জীবনে অনপনেয় ছাপ

ফেলেছিল। এ বিষয়টিকে তার যথার্থ মাত্রাতেই বিচার করতে হবে ; যান্ত্রিক ভাবে নয়।

নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে অন্তত পাঁচটি স্তরকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রথম স্তর স্কুলে পড়াকালীন যুগান্তর দলভুক্ত বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র ঘটকের প্রভাব। দ্বিতীয় স্তর বেঙ্গলি রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে করাচিতে যোগদান পর্ব। তৃতীয় স্তর কলকাতায় ফেরার পর 'নবযুগ' দৈনিক থেকে 'ধূমকেতু' ও তারপর চিত্তরঞ্জন দাশের প্রভাব। চতুর্থ স্তর শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দল ও পরবর্তীকালে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সংগঠক হিসেবে কাজ করা। পঞ্চম স্তর তিরিশের দশকে সক্রিয় রাজনৈতিক সংগঠকের জীবন থেকে দূরে সরে যাওয়া।

প্রথমযুদ্ধকালীন পর্বে বর্ধমান জেলা, বিশেষত আসানসোল রাণীগঞ্জ এলাকায় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রচার ছিল। রাণীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ স্কুলে পড়ার সময়ই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র ঘটকের সংস্পর্শে আসেন নজরুল। নিবারণচন্দ্র ছিলেন ঐ স্কুলেরই শিক্ষক। ছাত্রাবস্থাতেই নজরুল তাঁর শিক্ষকের রাজনৈতিক মতাদর্শে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নজরুলের লেখা 'কুহেলিকা' উপন্যাসের 'প্রমত্ত' চরিত্রে নিবারণচন্দ্রের ছায়া পড়েছে।

ঐ উপন্যাসে 'জাহাঙ্গীর' চরিত্রটি যেন নজরুলের আত্মপ্রতিকৃতি। তবে ১৯২৭ সালে নজরুল যখন বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে সক্রিয় তখন এই উপন্যাসটি লেখায় 'সন্ত্রাসবাদী' আন্দোলন সম্পর্কে 'জাহাঙ্গীর'কে অনেকটা নির্মোহ লেগেছে। তবে কৈশোরের সেদিন ঔপনিবেশিক শাসন মুক্তির গুরুত্ব নজরুল প্রথম বুঝেছিলেন নিবারণচন্দ্র ঘটকের কাছ থেকেই।

১৯১৭ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার আগে পড়াশুনা ছেড়ে নজরুল নাম লেখান "বেঙ্গল রেজিমেন্ট"-এ । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্য ব্রিটিশ সরকার এই রেজিমেন্ট গঠন করেছিল। কিন্তু রেজিমেন্টে যাঁরা নাম লেখান তাঁরা ব্রিটিশ রাজের স্বার্থরক্ষা করার ভাবনা নিয়ে নাম লেখান নি। তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন দেশমুক্তির বৃহত্তর ভাবনা থেকে। তা সে ভাবনার মধ্যে যে সীমাবদ্ধতাই থাকুক না কেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হলেও, তা উপনিবেশগুলির জনগণকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে টেনে এনেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উপনিবেশগুলির যুদ্ধ ছিল না। কিন্তু তা উপনিবেশগুলিতে জনগণকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সচেতনতা দিতে সাহায্য করেছিল। সর্বোপরি ছিল ১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লব রাশিয়ায়। দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন উপনিবেশগুলির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তথা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ইতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করেছিল। নজরুলের ক্ষেত্রেও দেখছি করাচিতে থাকাকালীনই নজরুল আইরিশ বিদ্রোহ ও রুশ দেশের মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। করাচিতে রুশ বিপ্লবের খবরে সেনাব্যারাকে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন নজরুল। করাচি থেকে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় পাঠানো 'ব্যথার দান' গল্পে রুশ বিপ্লবের প্রতি নজরুলের সহানুভূতির প্রভাব পড়েছে। এ নিয়ে

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মিটে যাবার পর ১৯২০ সালের মার্চে নজরুল ফিরে এলেন কলকাতায়। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রাজনীতি করবেন কিনা? নজরুল জবাব দিয়েছিলেন, রাজনীতি না করলে যুদ্ধে গিয়েছিলেন কেন?

কলকাতায় আসার পর নজরুলের জীবনের দিকচিহ্ন হয়েছিল মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে একত্রে সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশ করা। ১৯২০-র ১২ই জুলাই প্রকাশিত 'নবযুগ'-এর মালিক ছিলেন ফজলুল হক। 'নবযুগ' ছিল খিলাফৎ আন্দোলনের ধারণায় প্রভাবিত সংবাদপত্র। খিলাফৎ আন্দোলনের একটা ধর্মীয় দিক থাকা সত্ত্বেও সেই সময় মুসলিম জনতার একটা বড় অংশকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী চেতনায় উন্নীত করতে খিলাফৎ আন্দোলনের ভূমিকা অস্বীকার করা যায়না । কিন্তু 'নবযুগ' পত্রিকা শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের প্রতিও সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছিল তার স্বল্পস্থায়ী জীবনে। মনে রাখতে হবে মুজফ্‌ফর আহমদ তখনও কমিউনিস্ট হননি। কিন্তু বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা থেকে তিনি সরে এসেছেন এই সিদ্ধান্ত নিয়ে যে সাহিত্য নয় রাজনীতিই হবে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন।

১৯২০ সালে এদেশে অল্ ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল। ঐ বছরই ১৭ই অক্টোবর তাসখন্দে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সহায়তায় গঠন করেছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। মানবেন্দ্রনাথ রায় তখন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের মাটিতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে যায় নি। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখছেন ১৯২১ সালের নভেম্বর নাগাদ প্রথম তিনি ও নজরুল ঠিক করেন কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করবেন। ডিসেম্বর মাসেই কলকাতায় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দূত নলিনী গুপ্তের সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও নজরুল একত্রে দেখা করেন। কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সম্পর্কে তাঁরা নলিনী গুপ্তের কাছে অনেক কিছু জানার প্রত্যাশা করেছিলেন। নলিনী গুপ্ত তাঁদের বিশেষ আলোকিত করতে না পারলেও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের যোগাযোগ নলিনী গুপ্ত করিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯২২ সালের গোড়া থেকেই রায় ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের চিঠি মারফত যোগাযোগ শুরু হয়।

কিন্তু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক জীবন ও কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ার কাজে ব্রতী হলেও, নজরুল ইসলাম প্রত্যক্ষত সে পথে যান নি। বাংলায় তখন চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দলের প্রবল প্রভাব। পূর্বতন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের একটা অংশও চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে যুক্ত হয়েছেন। নজরুলের রাজনৈতিক চেতনার মূল ঝোঁক ছিল সেদিকেই। যা প্রতিফলিত সবচেয়ে ভালোভাবে 'ধূমকেতু' পত্রিকায়।

'ধূমকেতু' আত্মপ্রকাশ করে ১৯২২-এর ১১ই আগস্ট। 'ধূমকেতু' সম্ভবত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র যা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানিয়েছিল। মনে রাখতে হবে জাতীয় কংগ্রেস বা স্বরাজ্য দল কেউই তখনও সে দাবি জানায় নি।

মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন 'ধূমকেতু'র মূল আবেদন ছিল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রতি। মুজফ্ফর আহ্মদের ভাষায়—"১৯২১-২৪ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আবার যে মাথা তুলল তাতে নজরুলের অবদান ছিল, একথা বললে বোধহয় অন্যায় হবে না।"

যদিও সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের খাতায় ধূমকেতুকে চিহ্নিত করা হয়েছিল নিশ্চিতভাবেই কমিউনিস্ট প্রকাশনা হিসাবে। নিঃসন্দেহে এই মূল্যায়ন সঠিক ছিল না। তবে 'ধূমকেতু'র পাতায় মার্ক্সবাদ বা সমাজতন্ত্রের কথাও লেখা হতো। শ্রমিক, কৃষক সহ নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতি সহানুভূতিও ছিল স্পষ্ট। আসলে নজরুল তাঁর যাবতীয় আবেগ নিয়েও জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পেটি বুর্জোয়া স্তর থেকে বার হতে পারছিলেন না। 'ধূমকেতু'তেই 'আনন্দময়ীর আগমনে' শীর্ষক পদ্যের জন্য ১৯২২-এর ২৩শে নভেম্বর নজরুল গ্রেপ্তার হন। রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর কারাবাস হয়। জেল থেকে তিনি ছাড়া পান ১৯২৩-এর ডিসেম্বরে। ইতিমধ্যে ১৯২৩-এর মে মাসে মুজফ্ফর আহ্মদ, এস. এ. ডাঙ্গে, শওকৎ ওসমানি প্রমুখকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেপ্তার করে।

এই মামলায় কারাবাসের পর মুজফ্ফর আহ্মদ কলকাতায় ফেরেন ১৯২৯-এর ২রা জানুয়ারী। তার আগে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে (১৯২৫) কানপুরে দেশের মাটিতে প্রথম কমিউনিস্ট সম্মেলনে যোগ দিয়ে আসেন মুজফ্ফর আহ্মদ।

অন্যদিকে জেল থেকে ছাড়া পাবার পর নজরুল যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন স্বরাজ্য দলে। কিন্তু ১৯২৫-এর ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর স্বরাজ্য দলের মধ্যে বামপন্থী অংশের সঙ্গে অন্যান্যদের মতপার্থক্য তীব্রতর হয়। এই পর্বেই নজরুল প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগঠকের ভূমিকায় নেমে পড়েন, মূলত কৃষক সংগঠন গঠনের সূত্রে। এর মধ্যে ১৯২৫-এর নভেম্বরে হেমন্তকুমার সরকার, নরেনচন্দ্র সেনগুপ্ত, কুতবুদ্দিন আহ্মদ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ সংগঠিত করেন নতুন একটি রাজনৈতিক দল—'ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দল'। এই দলের ইশ্তেহারটি প্রকাশিত হয়েছিল নজরুল ইসলামের নামেই, যে ইশ্তেহারে দলের উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়েছিল—"নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা সূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য।" এই কর্মসূচীতেই আবার বলা হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দকে সাক্ষী মেনে যে "শ্রেণীগত স্বার্থত্যাগী ভদ্র যুবক, শ্রমিক কৃষকের সংযোগ না হইলে ভারতের মুক্তি আসিবে না।" সর্বোপবি এই দল ছিল স্বরাজ্য দলের মতোই জাতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত।

এই দলেরই মুখপত্র হিসাবে ১৯২৫-এর ১৬ই ডিসেম্বর আত্মপ্রকাশ করে

সাপ্তাহিক 'লাঙল'। 'লাঙল'-এর প্রচ্ছদেই নজরুলের নাম উল্লেখ থাকতো 'প্রধান পরিচালক' হিসাবে। 'লাঙল'-এর প্রথম সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'সাম্যবাদী'।

কিন্তু এই সব সংগঠিত হবার কয়েকদিনের মধ্যেই ১৯২৬-এর ৩রা জানুয়ারী হুগলী থেকে সপরিবারে নজরুল চলে যান কৃষ্ণনগরে। কিন্তু দলের কাজে নজরুলের সক্রিয়তা ছিল যথেষ্টই।

শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলে কর্মসূচীগত বিরাট পরিবর্তন এনে দেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। কানপুর থেকে কলকাতায় ফিরে তিনি এসে উঠেছিলেন শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দল তথা 'লাঙল'-এর দপ্তর ৩৭ নম্বর হ্যারিসন রোডে। এখানে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'লাঙল' পরিচালনার দায়িত্বভার কার্যত মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের হাতেই চলে যায়। দলের কর্মসূচীকে আরো র‍্যাডিকাল করার উদ্যোগও তিনি নেন। এরই পরিণতিতে ১৯২৬-এর ৬-৭ই ফেব্রুয়ারী সম্মেলন থেকে শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দল পরিণত হয় বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে। সম্মেলন হয়েছিল কৃষ্ণনগরে। নজরুল নতুন দলের কর্মসমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাছাড়া সম্মেলনের অন্যতম প্রধান সংগঠকও ছিলেন তিনি।

উল্লেখ্য, সে সময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কমিউনিস্টরা এ ধরনের শ্রমিক ও কৃষক দল গড়ে তুলছিল। এগুলির কোনটাই কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। কিন্তু কমিউনিস্টরাই ছিলেন মূল সংগঠক। মূলত বিপ্লবী গণতান্ত্রিক কর্মসূচীর ভিত্তিতেই দলগুলি গড়ে তোলা হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ১৯২৮-এর ২১-২৩শে ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় সারা ভারত কৃষক ও শ্রমিক দলের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন। এতেও নজরুল অংশ নিয়েছিলেন।

বস্তুত, মাঝে মধ্যে অনুপস্থিত থাকলেও ১৯২৫-এর নভেম্বর থেকে ১৯২৯ সালের গোড়া পর্যন্ত নজরুল ছিলেন সক্রিয় রাজনৈতিক সংগঠক। ১৯২৯-এর ২০শে মার্চ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সহ অনেকে গ্রেপ্তার হয়ে গেলে কৃষক ও শ্রমিক দলের কাজকর্ম কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। নজরুলও সরে যান ক্রমশ সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে। যোগ দেন বেতার, সিনেমা ও গ্রামোফোন কোম্পানির কাজে। ১৯২৬, ১৯২৭ এবং ১৯২৮-এর কিছুটা সময়ই নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে কার্যকরী সময়, তাৎপর্যপূর্ণ সময়। এর মধ্যে যদিও ১৯২৯ সালে আচমকা তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে স্বরাজ্যদলের প্রার্থী হয়েছিলেন। তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। এই ভাবে প্রার্থী হওয়া মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ যে পছন্দ করেছিলেন তা নয়। 'স্মৃতিকথা'য় এর উল্লেখ আছে। তবে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সূত্রেই নজরুল শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সবচেয়ে নিবিড়ভাবে তাদের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। বিশেষত মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে একত্রে কাজ করার সূত্রে সাম্যবাদী আন্দোলন ও কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তিনি আকৃষ্ট হন। লাঙল ও

গণবাণীর পাতায় আমরা যেমন নজরুলের সাম্যবাদী, শ্রমিকের গান, কৃষকের গান, জেলেদের গান কিংবা 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত'-এর মতো লেখা দেখি, তেমনই দেখি সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী কিছু অসাধারণ প্রবন্ধ। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদের মতাদর্শগত অস্বচ্ছতা সম্পর্কেও নজরুলের স্বচ্ছ ধারণা লক্ষ করা যায়। ১৯২৬ সালে স্বরাজ্য দলপন্থী 'আত্মশক্তি' কাগজের সম্পাদককে গণবাণী ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের পক্ষ নিয়ে নজরুলের লেখা চিঠিটি পড়লে তা বোঝা যায়।

নজরুল কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করেছিলেন, একথা বলা যায়না। কিন্তু মার্ক্‌সবাদ বা সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে যেটুকু ধারণা তাঁর হয়েছিল তার একটা প্রভাব নিশ্চিতভাবে শুধু পড়েছিল নয়, স্থায়ীভাবে পড়েছিল।

নজরুলের জীবনে একসঙ্গে অনেকগুলি ঘটনাও নির্ধারক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেমন, প্রবল দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণেই বিশের দশকে, ১৯২৬-২৮ এই গুরুত্বপূর্ণ সময়, তাঁকে সপরিবারে কাটাতে হয়েছিল কৃষ্ণনগরে। কলকাতায় থাকতে না পারায় রাজনৈতিক সক্রিয়তা যতটা রাখা তাঁর সামর্থ্য ছিল তা হয়নি। ১৯৩০ সালে পুত্রের অকাল মৃত্যু নজরুলকে ব্যক্তিগতভাবে বিধ্বস্ত করেছিল। গ্রামোফোন কোম্পানি, সিনেমা, বেতার, থিয়েটারে কাজ নিয়ে আর্থিক অস্বচ্ছলতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করলেও এতে তাঁর ক্ষতিই বেশি হয়েছিল। চাহিদার যোগান তাঁর সৃজনপ্রতিভাকে একমুখী করেছিল এবং বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়েছিল। সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে যে স্বচ্ছ ধারণা ও কৌতূহলকে জাগ্রত করে রাখে, তার অনুপস্থিতি নজরুল প্রতিভাকে ব্যাহত করেছে সক্রিয় জীবনের শেষ বারো তেরো বছর।

নজরুলের রাজনৈতিক জীবনে নির্ধারক হয়ে দাঁড়িয়েছিল মীরাট ধরপাকড়। ১৯২৯-এর মার্চে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সহ অন্যান্যরা গ্রেপ্তার হবার পর বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কমিউনিস্ট পার্টি সাংগঠনিকভাবে তখন ছন্নছাড়া অবস্থায়। আবদুল হালিমের অসামান্য প্রচেষ্টায় ১৯৩৪-৩৫ সাল নাগাদ বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাঠামো ক্ষুদ্র আকারে আবার মাথা চাড়া দেয়। কিন্তু ১৯৩৪ সালেই সি পি আই-কে ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করে। আন্ডার গ্রাউন্ড অর্গানাইজেশন হিসাবেই পার্টিকে কাজ করতে হতো। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ জেল থেকে ছাড়া পাবার পর কলকাতায় ফিরে আসেন ১৯৩৬-এর জুন মাসে।

এই দীর্ঘ ছ-সাত বছরের বিচ্ছেদ নজরুলকে অনেকটা দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। আমার মনে হয় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ যদি গ্রেপ্তার না হতেন, যদি রাজনৈতিক পরিস্থিতি তেমন না হতো তাহলে নজরুলকে হয়তো অন্যভাবে পাওয়া যেত। কিন্তু ইতিহাস তো এভাবে সরলরৈখিক পথে চলে না।

রাজনৈতিক চেতনা এমনই যে তা ব্যাঙ্কের লকারে রেখে দেওয়া যায় না। সক্রিয় না থাকলে তাতেও জং ধরে। ১৯৩৬ সাল থেকে প্রগতি লেখক সংঘ থেকে কৃষকসভা

গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যখন প্রবল সাংগঠনিক তৎপরতা চলছে, যাতে এমন কি বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়রা পর্যন্ত যোগ দিচ্ছেন, তখনও নজরুল তার বাইরে। যদিও সে সবে তাঁরই নেতৃত্বে থাকার কথা। এই পর্বে শুধু ব্যতিক্রমী ঘটনা একটি। গোর্কির মৃত্যু উপলক্ষে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের সাংগঠনিক কমিটি ১৯৩৬-এর ১৮ই জুন অ্যালবার্ট হলে শোকসভার আয়োজন করেছিল। যেখানে নজরুল যোগ দিয়েছিলেন। তবে আবদুল হালিম যেমন লিখেছেন, ১৯৩২ সালে কলকাতায় মীরাট মামলায় অভিযুক্তদের জন্য অর্থ তুলতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নজরুল অংশ নিয়েছিলেন।

আবার এটাও দেখা যায় যে ১৯৩৭ সালের এপ্রিলে ফজলুল হকের সমর্থনে জনসভায় নজরুল বক্তৃতা দিচ্ছেন। ১৯৪১ সালে মুসলিম লীগের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর হক সাহেব দৈনিক 'নবযুগ' নতুন করে বার করলে নজরুল প্রধান সম্পাদক হয়েছিলেন। সেখানেও স্বল্প সময়ের মধ্যেই এক সচেতন নজরুলকে আমরা পাই।

মনে রাখতে হবে হাজারো চাপ, প্রতিকূলতা, কিছু কিছু বিভ্রান্তি সত্ত্বেও নজরুল কখনও মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন জানাননি। দুটি বিষয়ে তাঁর মত ছিল পরিষ্কার, ব্রিটিশ শাসন মুক্তির প্রশ্নে দ্বিধাহীনতা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। তৎকালীন পরিস্থিতি মাথায় রাখলে স্বীকার করতে হবে যে, এ ক্ষেত্রে গভীর রাজনৈতিক বোধ ছাড়া এ প্রশ্নে দৃঢ় থাকা সহজ ছিল না। শ্রমজীবী মানুষ, নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ব ছিল অপরিসীম। কিন্তু সব মিলিয়ে তা প্রত্যাশিত পরিণতির দিকে যায় নি। বিশের দশকের নজরুলকে আমরা তিরিশের দশকে পাইনি। আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল সুকান্তের জন্য।

দুর্ভাগ্যের বিষয় নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়লেন এমন একটা সময়ে যখন বাংলা তথা ভারতের রাজনীতি আবার একটা গুরুত্বপূর্ণ বাঁক নিচ্ছে। ১৯৪২-এর জুলাই মাসে সি পি আই-এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যায়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনও তখন বৃহত্তর জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এমন একটা সময়ই নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

ব্যক্তি বলুন, সমষ্টি বলুন, জীবনের গতিপথ সব সময় প্রত্যাশিত পথে এগোয় না। নানা আঁক বাঁক, ঝড়ঝাপটা অনেককিছুই অপ্রত্যাশিতভাবে ওলট পালট করে দিতে পারে। নজরুলের কাছ থেকে আরও অনেক আমরা পেতে পারতাম। অনেক বেশি। কিন্তু যা পেয়েছি—তাও কি কম। তাঁর জীবন ও সৃষ্টি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কম ঐশ্বর্য রেখে যায়নি। তার পূর্ণ মূল্যায়ন সঠিক মূল্যায়ন, এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ আমরা কতটা করতে পেরেছি সেই সমীক্ষার দায় কিন্তু আমরা এড়াতে পারি না।

বিদ্রোহী কবির বিপ্লবী রাজনৈতিক চিন্তা

তরুণ কুমার দাস

প্রাক কথন

পরাধীন ভারতের নিপীড়িত জনগণের ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার অগ্নিময় বাণীরূপ যাঁর লেখনীতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ধারণা হল তিনি ছিলেন একজন আবেগমুখর, সদাচঞ্চল, কল্পনাবিলাসী রোমান্টিক ভাবুক। এ হেন একজন কবির সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তা অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা হয়তো অনেকের কাছেই বেমানান মনে হবে, কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ও প্রমাণিত সত্য এই যে, বিদ্রোহী নামাঙ্কিত এই বিপ্লবী কবির কাব্য ও কথা সাহিত্যে সমকালীন ভারতীয় আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি শুধু উল্লিখিতই নয়, প্রজ্ঞাদীপ্ত ভঙ্গিতে বিশ্লেষিত-ব্যাখ্যাতও হয়েছে, তথাপি কবি কোথাও তাঁর সাহিত্যের প্রসাদগুণ এবং কাব্যের সুষমাকে রাজনীতির যূপকাষ্ঠে বলি দেন নি, বরং সমকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা ছিল তাঁর অনায়াসলব্ধ।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংগ্রামময় ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের গতিময়তা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত বিপ্লবী নজরুলকে বাদ দিয়ে অনুধাবন করা যাবে না। সেই সঙ্গে এদেশের প্রাধান্যকারী জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আপসমুখী সংস্কারকামী চরিত্রকে বুঝতে হলেও নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তার বিশ্লেষণ অপরিহার্য। সর্বোপরি বহু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে সু-উচ্চ সংস্কৃতির রূপটি প্রস্ফুটিত হয়েছিল, যার যুক্তিসঙ্গত পরিণতিতে এদেশে সর্বহারা রাজনৈতিক আন্দোলনের ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারতো, তা কেন পারল না—তাও নজরুলকে বাদ দিয়ে বোঝা যাবে না। আর এই সব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ততম উপস্থাপনার স্বার্থেই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা।

নজরুল চেতনার যুগপরিপ্রেক্ষিত

অমর সাহিত্য সৃষ্টি বা অলীক কল্পনা বিপ্লবী নজরুলের কখনও ছিল না। বিশেষ যুগের যুগ যন্ত্রণাকে বাণীরূপ দিতে চেয়েছেন তিনি। তাই সগর্বে ঘোষণা করতে কুণ্ঠিত হন নি যে, "পরোয়া করিনা বাঁচি কি না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে।" সমাজ-বিচ্ছিন্ন স্বপ্ন-কল্পনায় মগ্ন, দায়দায়িত্ব জ্ঞানহীন তথাকথিত সুখী কবিকুলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "অমর কাব্য তোমরা লিখিয়ো বন্ধু যাহারা আছ সুখে"। তাই নজরুলের বিপ্লবী চিন্তার স্বরূপ ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে তাঁর দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতটি সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করতে হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনে যে এক অসামান্য প্রাণ-সমৃদ্ধ ভাব-বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল যার মূল জীবনাদর্শ ছিল মানবতাবাদ—তাই সমাজ বিজ্ঞানীর চোখে ভারতীয় নবজাগরণ। যদিও এই নবজাগরণের রূপ, প্রকৃতি, ব্যাপ্তি ও গভীরতা নিয়ে পণ্ডিতরা সকলে একমত নন, তথাপি নানাবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এটি যে এদেশের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ও বিকাশের পটভূমিতে গড়ে ওঠা এক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন তা অনস্বীকার্য। রাজা রামমোহন রায়কে দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীকালে এই আন্দোলন সুস্পষ্ট দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। ধর্মসংস্কার রামমোহনের কর্মকাণ্ডের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হলেও তাঁর বহুব্যাপ্ত কর্মধারাকে ধর্মাশ্রয়ী কর্মযজ্ঞ বলা যায় না। পরবর্তীকালে রামমোহনের ভক্তিধারাকেই প্রধানরূপে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর অনুগামী দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্ররা। এই পথেই বঙ্কিম-বিবেকানন্দ পেরিয়ে এদেশের জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠলো এবং এক জরাগ্রস্ত, আপসমুখী, ধর্মাশ্রয়ী, বিপ্লবভীত চরিত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে।

এরই পাশাপাশি অত্যন্ত ক্ষীণ হলেও রামমোহনের যুক্তিধারাকে অনুসরণ করে অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগরের হাত ধরে আবির্ভূত হয়েছিল এক পার্থিব মানবতাবাদী জীবনাদর্শ, ইওরোপীয় নবজাগরণের যৌবনদীপ্ত রূপটাই ছিল এই দ্বিতীয় ধারার অনুপ্রেরণা। এঁরা সামন্ততন্ত্র ও ধর্মের সঙ্গে আপস না করে ঘটাতে চেয়েছিলেন মানবতাবাদের বিকাশ। সংস্কৃতির জগতে নজরুল আর শরৎচন্দ্রের মধ্যে দিয়ে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদেশের জাতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে দিয়ে এই ধারার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল।

প্রথমোক্ত ধারাটির প্রাধান্যই এদেশে সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল। সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসকামী এই ধারাটির লক্ষ ছিল ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে এদেশে মানবতাবাদের বিকাশ ঘটানো—যার সার্থক ব্যক্তিকরণ দেখি গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়।

নজরুলের যুগ এদেশের নবজাগরণের পূর্ণ পরিণতির যুগ। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলন তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে। এদেশে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, জড়তা, স্থবিরতা তখন ধীরে ধীরে অপসৃত হচ্ছে, স্বদেশী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে জাতীয় সংগ্রামের আহ্বান বাণী সবেমাত্র মানুষের ঘুম ভাঙাতে শুরু করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণে বিপর্যস্ত ভারতীয় অর্থনীতি। দেশের মানুষের দারিদ্র্য, হতাশা নির্বীর্যতা জাতির জীবনকে করে রেখেছে পঙ্গু। এমন একটা আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নজরুল-চিন্তার আবির্ভাব। সীমাহীন দারিদ্র্য আর লাঞ্ছনা দিয়ে শুরু এই মানুষটির জীবন। তাই সমাজের অভাব-অনটন, শোষণ-যন্ত্রণা এবং তারই মধ্যে মানুষের বিশেষত শোষিত মানুষের বীরত্ব, মনুষ্যত্ব আর জীবনসংগ্রাম উদ্বুদ্ধ করেছিল এই বিপ্লবীকে।

তাই এই বিপ্লবী যা কিছু জীর্ণ, পুরাতন, অন্যায়-অবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। যা কিছু অসত্য, মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রতিবন্ধক—তার বিরুদ্ধেই নতুনকে প্রতিষ্ঠা করতে, সত্যকে খুঁজে পেতে কবির বিদ্রোহ। সেদিনের পরাধীন সামন্ততান্ত্রিক সমাজে একদিকে ধর্ম, সমাজপতি অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ—এ দুয়ের নিষ্পেষণে উৎপীড়িত মানুষকে পথ প্রদর্শনই ছিল নজরুলের প্রতিজ্ঞা। তাঁর কাব্যে-সঙ্গীতে লেখনীতে—সর্বত্রই এই প্রতিজ্ঞার বাণীরূপ প্রতিফলিত। তাই এ হেন কবি কখনোই শুধুমাত্র বিদ্রোহী নন, একজন সু-পরিণত বিপ্লবীও। কবির নিজের কথাতেই বলি "আমি বিদ্রোহ করেছি -বিদ্রোহের গান গেয়েছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে—যা মিথ্যা, কলুষিত, পুরাতন-পচা সেই মিথ্যা সনাতনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নতুন করে গড়তে চাই বলেই তো ভাঙি—শুধু ভাঙার জন্যেই ভাঙার গান আমার নয়।" (অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে লেখা পত্র)

বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী নজরুল

পরাধীনতার গ্লানি নজরুলের মধ্যে যে অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেছিল, তা তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন লাঞ্ছিত ভারতবাসীর মধ্যে তাঁর অগ্নিক্ষরা লেখনীর মাধ্যমে। জীবনের সব অধিকার হারিয়ে জীবনধারণ করার চেয়ে জীবন দিয়ে জীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর লেখা ভারতবাসীকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। পরাধীন দেশের মানুষের কাছে স্বাধীনতার চেয়ে বড় কিছু থাকতে পারে না। এই চেতনাই নজরুল ভারতবাসীর মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন। জীবন যেখানে অবরুদ্ধ, অসম্মানিত, অস্তিত্ব যেখানে অপরের করুণা ও দয়ার উপর নির্ভরশীল, সেখানে স্বাধীনতা ও জীবনের সত্যিকারের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছাড়া প্রকৃত মানুষের কি অন্য কিছু চাওয়া-পাওয়ার থাকতে পারে? এই সব প্রশ্নের উত্তরে নজরুলের প্রাণবন্ত ঘোষণা "বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি। এরই অভিযানে সেনাদলে তূর্যবাদকের একজন আমি। আমি জানি এই পদযাত্রার বাঁকে বাঁকে কুটিল ফণা ভুজঙ্গ, প্রখর দর্শন শার্দূল, পশুরাজের ভ্রূকুটি এবং নখরদংশনের ক্ষত আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ, ওই আমার গতি।" (গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ)

স্বভাবতই স্বাধীনতা লাভের মসৃণ আপসের পথ ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন নজরুল। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর যখন সমগ্র দেশে এক নীরব হতাশার স্রোত বয়ে চলেছে তখন এই সংস্কারবাদী আপসকামী বিরুদ্ধবাদীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে-কষাঘাতে জর্জরিত করে বিপ্লবী নজরুল এই আপসকামীদের কাপুরুষতাকে উন্মোচিত করেছেন—

"বুকের ভিতর ছ-পাই, ন-পাই, মুখে বলিস স্বরাজ চাই।
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই।

'ভারত হবে ভারতবাসীর'—এ কথাটাও বলতে ভয়,
সেই বুড়োদের বলিস নেতা—তাদের কথায় চলতে হয়!
বলরে তোরা বল নবীন—চাইনে এসব জ্ঞান প্রবীণ।
স্ব-স্বরূপে দেশকে ক্লীব করছে এরা দিনকে দিন,
চায়না এরা হই স্বাধীন।"

আপসকামীদের শ্রেণীচরিত্র নজরুলের অজানা ছিল না। তাই ধূমকেতু সগর্জনে বলেছে "আজ রাজনীতি ক্ষেত্রে কেবল ফাঁকিবাজি। সঞ্চিত ধনের গাদায় বসে অথবা পাবলিক ফান্ডের অপহরণে অথবা প্রজার রক্ত শোষণ করে যে নিশ্চিন্তে আছে, আজ তারই নেতাগিরির দিন।" যে স্বাধীনতা আন্দোলন সেদিন গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল, তাতে যে প্রকৃত গণমুক্তি অর্জিত হবার নয়, বিপুল সংখ্যক দরিদ্র সাধারণ মানুষের জীবনে দুর্দশা মোচন হবার নয়—এ সত্য সেদিন নজরুলের চিন্তায় উদ্ভাসিত হয়েছিল, তাই 'আমার কৈফিয়ৎ'-এ বিদ্রূপভরা লেখনীতে স্পষ্টভাবে বলেছেন—

"আমরা তো জানি স্বরাজ আনিতে
পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস।
কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর
ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস।
এল কোটি টাকা এল না স্বরাজ
টাকা দিতে নারে ভুখারী সমাজ,
মার বুক হতে ছেলে কেড়ে খায়
মোরা বলি বাঘ, খাও হে ঘাস।"

এই বিপ্লবী নজরুল দেশের যুবশক্তির উপর সবচেয়ে ভরসা স্থাপন করেছিলেন। তাই গান্ধীবাদী আপসপন্থার বিরুদ্ধে দৃপ্তকণ্ঠে যুব সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বারবার আবেদন জানিয়ে বলেছেন 'তোমরা তোমাদের অধিকারের দাবি ছেড়ো না। তোমাদেরও হয়ত শিকল পরে জেলে যেতে হবে, গুলি খেয়ে মরতে হবে। তোমারি দেশের লোক তোমার পথ আগলে দাঁড়াবে, সকল রকম কষ্ট দেবে, তবুও তোমাদের পথ ছেড়ো না, এগিয়ে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হয়ো না, আগের দল মরবে বা পথ ছাড়বে, পিছনের দল তাদের শূন্যস্থানে গিয়ে দাঁড়াবে। তোমাদের মৃতদেহের উপর দিয়ে আসবে তোমাদের মুক্তি।"

আপসকামী নেতৃত্বের প্রাধান্যের মধ্যেও স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা অধ্যায়ে দেশের তরুণ ও যুবশক্তি শাসকের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিপ্লবী আন্দোলনে, সশস্ত্র সংগ্রামে। সেদিনের সেইসব বিপ্লবীকে উদ্দেশ্য করে নজরুল লিখলেন—

"ওরা দু' পায়ে দলে গেল মরণ শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে।"

এই ভাবে নজরুলের লেখনীতে সর্বত্র বিপ্লববাদের প্রতি তাঁর প্রাণবন্ত আবেগ আর আনুগত্য প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই বিপ্লবী আন্দোলন সমগ্র দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কিশোর নজরুলের মধ্যে তা অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছিল, যদিও এই পর্বের বিপ্লবী আন্দোলন ব্যক্তি-উদ্যোগে ব্যক্তি-বিপ্লবীর অগাধ দেশপ্রেম আর বীরোচিত আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছিল। গান্ধীজির আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের ব্যাপকতা ও শক্তির সঞ্চার হয়। কিন্তু একই সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সর্বহারা বিপ্লবভীতি এবং সেই কারণে তাদেরই প্রতিনিধি, স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসকামী নেতৃত্বের দুর্বলতা—এই দুই মিলে আন্দোলন যখনই গণ-জাগরণের রূপ নিতে চেয়েছে, যখনই তা জঙ্গী ও দুর্বার হয়ে উঠেছে, নেতৃত্ব সেখানে রাশ টেনে ধরেছে। কিন্তু এরই পাশাপাশি ক্ষীণ হলেও যে বিপ্লবী ধারা পেটি-বুর্জোয়া বিপ্লববাদকে আশ্রয় করে চলেছিল, তাতেও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সোভিয়েত বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় বিপ্লবীরাও তাঁদের আন্দোলনকে গণ-ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সচেষ্ট হন। এই সময়কার এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি যেমন ভগৎ সিং, সূর্য সেন প্রমুখের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছিল, নজরুলের চিন্তায় তাও অভিব্যক্ত হয়েছে। এই পর্বের বিপ্লবীরা শুধু ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্তি চাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন সকল রকম ধনবাদী শোষণ বঞ্চনা অত্যাচার থেকে শ্রমিক চাষী মধ্যবিত্ত জনগণকে মুক্তি দিতে। সামন্ত শোষণে আবদ্ধ জনজীবনের দুর্দশা ও সামন্তপ্রভু-ভূস্বামী-জমিদারদের স্বেচ্ছাচার আর দমন-পীড়নের চিত্র নজরুলের সাহিত্যে নিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। একই সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যেও যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি সেদিন ভারতবর্ষে গড়ে উঠেছিল, চাষী-মজুরের ওপর তার শোষণ জুলুমও নজরুলের নজর এড়ায় নি। তাই তিনি লিখেছেন—

"জনগণে যারা জোঁক সম শোষে তারে মহাজন কয়
সন্তান সম পালে যারা জমি তারা জমিদার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ
মাটির মালিক তাহারাই হন—
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই ততো বলবান
পীড়িত মানব পারে নাক আর স'বে না এ অপমান।"

সাম্যবাদের কাছাকাছি নজরুল

শুধু সাহিত্য সাধনাতেই নয় প্রত্যক্ষভাবেও নজরুল শোষিত মানুষের বিশেষত কৃষক সমাজের শোষণ মুক্তির আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। হেমন্ত সরকারের নেতৃত্বে

বাংলার গ্রামে গ্রামে কৃষক জনগণকে সংগঠিত করার কাজে চারণ কবির দেশে গান গেয়ে অজ্ঞ-অশিক্ষিত কৃষকের বুকে সংগ্রামের আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিলেন নজরুল। চারণ নজরুলের গানে ব্রিটিশের হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পাশাপাশি চাষী, মজুর, মধ্যবিত্তের শোষণ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। রুশ বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় কবির চারণগানে লেগেছিল সাম্যবাদ-সর্বহারা-শ্রেণীচিন্তার ঢেউ। সর্বহারা শ্রেণীর শোষণের রূপটি যে আন্তর্জাতিক তা যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন কবি। শোষিত মানুষের যে কোনো বিশেষ দেশ বা জাত নেই, তা অনুভব করেই কবি বলেছেন—

"একের অসম্মান
নিখিল মানব জাতির লজ্জা
সকলের অপমান।"

মালিকী-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নজরুল তাঁর শ্রেণীগত অবস্থান সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হন নি। রাজ অনুগ্রহ লাভের আশা বা নামী-দামী সাহিত্য পুরস্কারের প্রলোভন সহজেই জয় করতে পেরেছিলেন বিপ্লবী নজরুল। তাই নিজেকে নিরপেক্ষ সর্বমানবের কবি বলে দাবি করেন নি, তিনি বরং তাঁর শ্রেণী অবস্থান উল্লেখ করে স্পষ্টতই ঘোষণা করেছেন—

"প্রার্থনা কর যারা কেড়ে খায়
তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লিখায়
তাদের সর্বনাশ।"

রুশ বিপ্লব যখন রাশিয়ায় নিপীড়িত জনগণকে জারের কবল থেকে মুক্ত করেছে, তখন কবি সৈন্যব্যারাকে। কবি বন্ধু কোয়ার্টার মাস্টার জমাদার শম্ভুচন্দ্র রায় বলেন যে "একদিন ১৯১৭-র শেষের দিকে অন্যান্য দিনের চেয়ে নজরুলের চোখে-মুখে একটা অন্যরকম জ্যোতি খেলে বেড়াচ্ছিল। নজরুল সেদিন যেসব গান গাইলেন এবং প্রবন্ধ পড়লেন, তা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে, রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। সেই অর্থে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম সৈনিক হিসাবে ও কবি সাহিত্যিক হিসাবে নজরুলকে প্রথম সোভিয়েত সুহৃদ বলা যেতে পারে।" (সূত্র ঃ কাজী নজরুল—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়)

সাম্যবাদী আদর্শের নেতৃত্বের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধ। 'বর্তমান বিশ্বসাহিত্য' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি তাই বলেছেন " দূর সিন্ধুতীরে বসে ঋষি কার্ল মার্কস যে মারণ মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, তা এতদিনে তক্ষকের বেশে এসে প্রাসাদে লুক্কায়িত শত্রুকে দংশন করলে! জার গেল, জারের রাজ্য গেল—ধনতান্ত্রিকের প্রাসাদ হাতুড়ি-শাবলের ঘায়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ... কার্ল মার্কসের ইকনমিকসের অঙ্ক এই জাদুকরের হাতে পড়ে আজ বিশ্বের অঙ্কলক্ষ্মী হয়ে উঠেছে। পাথরের স্তূপ সুন্দর

তাজমহলে পরিণত হয়েছে। ভোরের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকের মত এর করুণ মাধুরী বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করে ফেলেছে। রাশিয়া দিয়েছে revolution-এর মর্মান্তিক বেদনার অসহ্য জ্বালা। ... রাশিয়া বলে এ বেদনাকে পুরুষশক্তিতে অতিক্রম করব, ভূজবলে ভাঙব এ দুঃখের অন্ধকার।" কোথাও কোথাও এই শক্তির সাথে একাত্ম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর কবিতায়—

" ... আয়ারল্যান্ড, আরব, মিশর, কোরিয়া, চীন,
নরওয়ে স্পেন, রাশিয়া সবার ধারি গো ঋণ
তাদের রক্তে মোদের লোহুর আভাস পাই
এক বেদনার কমরেড ভাই মোরা সবাই।"

যদিও এই কথার অর্থ এই নয় যে, তিনি সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের ধারাতেই তাঁর কাব্য সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতপক্ষে বুর্জোয়া মানবতাবাদের বিপ্লবাত্মক ধারার পথ বেয়ে চলতে গিয়ে অস্পষ্ট কুয়াশার মত তাঁর জীবন এবং কাব্যসৃষ্টিতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের উত্তাপ লেগেছিল। সর্বহারা বিপ্লবী আন্দোলনের উষ্ণতা অনুভূত হয়েছিল তাঁর ব্যক্তিজীবনেও। যদিও তার সম্ভাব্য অগ্রগতি এবং পূর্ণ অভিব্যক্তি ঘটেনি। এদেশে যাঁরা সাম্যবাদী আন্দোলন প্রথম গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁদের কাছ থেকে কবি মার্কসীয় তত্ত্ব, রাজনৈতিক কলাকৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পারলেও মার্কসীয় তত্ত্বের যা মূল নির্যাস সেই উন্নত রুচি-সংস্কৃতি-নীতি-নৈতিকতা-সৌন্দর্যবোধ, আবেগ-অনুভূতির সন্ধান তিনি পাননি। অর্থাৎ কবির বন্ধু সেকালের কমিউনিস্ট বলে পরিচিত দলটির নেতৃবৃন্দ তাঁকে জীবনের সর্বদিক-পরিব্যাপ্ত করে গড়ে ওঠা সৃজনশীল মার্কসীয় জীবনবোধের সন্ধান দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাই প্রচণ্ড আবেগ, শোষিত মানুষের প্রতি দরদবোধ, বিপ্লবী প্রাণ-প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এই বিপ্লবী কবির বিপ্লব চেতনা যুক্তি সঙ্গত পরিণতি লাভ করতে পারে নি।

জাত-পাত-সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে নজরুল

জাত-পাত-ধর্ম নিয়ে বিভেদের যে প্রাচীর সামন্ততান্ত্রিক সমাজে জনগণের মধ্যে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল—তাকে কবি ভাঙতে চেয়েছেন প্রবল আঘাতে। বিভেদের প্রাচীরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে চেয়েছেন প্রাণের শক্তিতে। জ্ঞানের উপলব্ধিতে তাই বলেছেন—

" জাতের নামে বজ্জাতি সব,
জাত-জালিয়াত খেলছে জুয়া।"

এই একই অনুভূতি অন্যত্র প্রকাশিত ভিন্ন ভাষায়—

"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ অভেদ ধর্ম জাতি।"

বিশেষ করে তৎকালীন সমাজ-পরিবেশে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের সমস্যা ব্রিটিশ শাসকদের হিন্দু-মুসলমানকে 'ভাগ করে শাসন করা'র ভিন্ন নীতির ফলশ্রুতিতে সমাজে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে শাণিত কলম ধরেছিলেন নজরুল—

"মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান" বা
"হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন
কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।"

পংক্তিগুলির মাধ্যমে। কবির এই অনুভূতি শুধুমাত্র তাঁর আবেগমুখর কবিমনের কাব্যিক অভিব্যক্তি নয়—অত্যন্ত সচেতন ভাবেই কবি ঘোষণা করেছেন—"আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের এ সংস্কারে আঘাত হানার জন্যেই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্য অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্যহানি ঘটেছে। তবু আমি জেনেশুনেই তা করেছি।" (অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে লেখা পত্র)

কবি বারবার এই কথাই বলে গিয়েছেন যে, "ধর্ম কি কাচের মত ঠুনকো যে একটুকুতেই ভেঙে যাবে? ... এই সব কারণেই তাই আমি এই রকম আস্তিকদের চেয়ে নাস্তিকদের বেশী ভক্ত, বেশী পক্ষপাতী" (বাঁধনহারা)। তিনি ব্যথা ও ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন "আজ বাঙালী মুসলমানের মধ্যে একজন চিত্রশিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই—ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে?" (তরুণের সাধনা) মুসলমান ধর্মান্ধদের বিরুদ্ধে তিনি বলেছেন, "আমাদের মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের দুয়ারের সামনে এই ছেঁড়া চট যে কবে উঠবে খোদা জানেন। আমাদের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বলা হইতে পারে।" (তরুণের সাধনা) হিন্দু সমাজের কুসংস্কার ও তার ছুঁৎমার্গকে যেমন তীব্র আঘাত করেছেন, তেমনি তিনি এও দেখিয়েছেন—"হিন্দু লেখকগণ তাদের সমাজের গলদ-ত্রুটি-কুসংস্কার নিয়ে কিনা কশাঘাত করেছেন সমাজকে—তা সত্ত্বেও তাঁরা সমাজে শ্রদ্ধা হারান নি। কিন্তু এ হতভাগ্য মুসলমানদের দোষ-ত্রুটির কথা পর্যন্ত বলার উপায় নেই। সংস্কার তো দূরের কথা, তার সংশোধন করতে চাইলেও তার বিকৃত অর্থ করে নিয়ে লেখককে হয়ত ছুরি মেরে বসবে।" (অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে লেখা পত্র) ধর্ম ভিত্তিক চিন্তাভাবনা, অন্ধতা, কুসংস্কার কীভাবে মানুষের মানবিকতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে প্রায় পশু স্তরে মানুষকে নামিয়ে আনে, সে কথা তিনি তাঁর 'মন্দির-মসজিদ' প্রবন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছেন। "হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তিকে তিনি যে কটাক্ষ করেছেন তাও তাঁর দৃঢ় মনোবলকেই প্রতিফলিত করেছে। তিনি এই প্রবন্ধের এক জায়গায় বলেছেন—"উহাদের প্রত্যেকের মুখ শয়তানের চেয়েও বীভৎস, শূকরের চেয়েও কুৎসিত।

হিংসার কদর্যতায় উহাদের গাত্রে অনন্ত নরকের দুর্গন্ধ।"

একবিংশ শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে উপনীত এই দুনিয়া আজ আবার নতুন করে বিভেদের প্রাচীর তুলেছে পুঁজিপতিদের শাসন-শোষণের স্বার্থে। ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের যুগেও মানসিকতার ক্ষেত্রে ধর্মের নামে ভেদাভেদকে যুক্তিসিদ্ধ করার অসাধু প্রয়াস চলছে—তথাকথিত উচ্চ জাত, নীচ জাতের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ও দাপাদাপি চলছে। যুবসমাজ বিভ্রান্ত—এমনকি বিভ্রান্ত হচ্ছেন তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের একটা অংশও।

বিপ্লবী নজরুলের উত্তরাধিকার

আবেগমুখর কবি হয়েও নজরুলের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারায় এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত উপস্থিতি, যে গণমুক্তির স্বপ্ন এদেশের শতশত বিপ্লবীদের মত নজরুলও বুকে বহন করতেন তা আজও অপূরিত। তাই 'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল' আজও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়। তাই নজরুলের বিশ্লেষণী রাজনৈতিক চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা ফুরিয়ে যায় নি। স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরেও ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাত নিয়ে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত আজও অব্যাহত। যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের স্বপ্ন নজরুল দেখেছিলেন তা পূর্ণ না হলে এই সংঘাত শেষ হবে না। যদিও ঐতিহাসিক ভাবেই এ কথা সত্য যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের যুগকে অতিক্রম করে আজ আমরা উপনীত হয়েছি পুঁজিবাদ-বিরোধী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের যুগে। তাই নজরুল-চিন্তার ধারাবাহিকতার পথেই অথচ তার সঙ্গে ঐতিহাসিক ছেদ ঘটিয়েই একালের যুগোপযোগী সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আদর্শগত পরিমণ্ডলটি গড়ে তুলতে হবে। এছাড়াও নজরুলরা এদেশের জাতীয়তাবাদী রাজনীতির যে উন্নত সংস্কৃতিগত আধারটি গড়ে তুলেছিলেন, এ যুগের রাজনীতি তাও হারিয়েছে। তাই এই যুগের উপযুক্ত উন্নত সংস্কৃতি সম্পন্ন, রাজনীতি গড়ে তুলতে হলেও নজরুল-চিন্তা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আয়ত্ত করে, তার ভিতরকার যা কিছু উন্নত রূপ-রস তাকে আত্মস্থ করে তার থেকেও মহোত্তর আদর্শবোধের জন্ম দিতে হবে। এদেশের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বন্ধ্যাত্বের অবসান একমাত্র এই পথেই সম্ভব, আর সেখানেই নজরুল আজও আমাদের পাথেয়। আমরা নজরুলের থেকে উন্নততর সাংস্কৃতিক জীবনাদর্শ সৃষ্টি করতে তো পারিই নি বরং নজরুলকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছি। এই ব্যর্থতার বিরুদ্ধে নিরলস লড়াইটাই নজরুলের শতবর্ষের একমাত্র অঙ্গীকার হয়ে উঠুক।

কাজী নজরুল ইসলামের রাষ্ট্রচিন্তা

জিয়াদ আলী

যাঁরা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির গতানুগতিকতা ভেঙে নতুনতর ছক নির্মাণ করতে পারেন তাঁরা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবয়ব সৃষ্টির অনুভবেও উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে জানেন। পৃথিবীর তাবৎ মহান লেখকদের ক্ষেত্রেই এই গুণাবলি অর্জনের দৃষ্টান্ত দেখা যায়। খ্রীষ্ট-পূর্ব দু-হাজার অব্দে মধ্য-এশিয়া থেকে আসা আর্যরা ভারতবর্ষে যে রাষ্ট্র কাঠামো গঠন করে সেখানে অনার্যদের দস্যু ও দাস হিসাবে পরিগণিত করার তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন মধুসূদন দত্ত। মাদ্রাজে থাকার সময় দ্রাবিড়-রামায়ণ পড়েছিলেন বলেই মধুসূদনের সেই উপলব্ধির গাঢ়তা জন্মায়। আর সেজন্যেই তিনি 'মেঘনাদ বধ' কাব্য সৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রমীলা নামের অনার্য নারীর মহিমা ও মুক্তি চেতনাকে অতখানি গুরুত্ব দিতে পেরেছিলেন। বস্তুত রামায়ণের অনুবাদ পড়া গড়পড়তা বাঙালীর পাঁচশো বছরের লালিত ধারণাকে মধুসূদন ভাঙতে চেয়েছিলেন এ ভাবেই। মধুসূদন শুধু কাব্যের শরীর নির্মাণেই আধুনিকতার প্রথম উন্মেষ নন, কাব্য-ভাবনা ও দর্শনের ক্ষেত্রেও তিনি এভাবে আধুনিক হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন।

শেষ জীবনের লেখায় এ-রকম আধুনিক মধুসূদনও কিছুটা অদৃষ্টবাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীরতর অনুসন্ধিৎসার অভাবেই। সেই ফাঁক পূরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের বয়স যত বেড়েছে ততই তিনি ঔপনিবেশিক অতীন্দ্রিয় চেতনার আবরণ ভেদ করে বস্তুবাদী প্রতিপাদ্যে সুদৃঢ় হয়ে উঠেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতেই রবীন্দ্রনাথের মানসলোক ধীরে ধীরে আন্দোলিত হতে থাকে। উপনিবেশবাদী শাসনের কুশ্রীতা তাঁর চোখে ক্রমশই সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে। প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবন আশ্রিত শান্তি ও সুখী সুখী ভাব ছেড়ে রবীন্দ্রনাথের আধুনিক ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্রোতধারায় অবগাহন ঘটেছিল এ ভাবেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফ্যাসিবাদী ভয়াবহতা ও বিশ্ব-লুণ্ঠনের রাজনীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে ফেটে পড়েন হঠাৎ করে নয়। তাঁর মানসলোক ক্রম-পরিবর্তনের ধারায় অনেক বেশি ধারালো হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার অভিজাততান্ত্রিক দমনক্রিয়া, শাসন-শোষণ এবং তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক স্তরের ফ্যাসিবাদী প্রক্রিয়ার যোগসাজসের ফলে।

'ওরে চারিদিকে মোর এ কি কারাগার ঘোর / ভাঙ ভাঙ ভাঙ কারা আঘাতে আঘাত কর' বলে রবীন্দ্রনাথ যখন জেগে উঠেন ৮ নম্বর সদর স্ট্রীটের বাড়িতে, সেই

অনুভবের কেন্দ্রে রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতার যন্ত্রণা লেগে থাকেই। অচলায়তন, বিসর্জন বা রক্তকরবী সেই যন্ত্রণা ক্ষুব্ধ মনেরই ফসল। রবীন্দ্রনাথ যখন ১৯৩০-এর পর বলেন জমিদারি ব্যবস্থায় আমার ঘেন্না হয়, তখন বোঝা যায় ভারতীয় সমাজ কাঠামোর কোন্ জায়গাটায় রবীন্দ্রনাথ আঘাত করতে চান। তাঁর ছোটগল্পে অছিমদ্দি সেজন্যই অস্ত্র তুলে নেয় শেষ লড়াইয়ের প্রকৃষ্ট পন্থা হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ তখন ঔপনিষদিক আবহমণ্ডল থেকে লক্ষ যোজন দূরে।

এই রবীন্দ্রনাথই ছিলেন নজরুলের কাছে সৃজনশীলতার অন্যতম আদর্শ স্বরূপ। তাঁর. নিজের লেখা 'বিদ্রোহী' কবিতা ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারি সাপ্তাহিক বিজলীতে প্রকাশের পর সমগ্র বঙ্গদেশে আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। নজরুল কিন্তু সে কবিতা তাঁর গুরুদেবকে না শোনানো পর্যন্ত স্বস্তি পাননি। উপাসনা পত্রিকার সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের লেখাতেই এ তথ্য পাওয়া যায়।

বস্তুত নজরুলের এই বিদ্রোহকে যদি একটা বাক্যে সংজ্ঞায়িত করা যায় তাহলে বলতেই হবে ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্তিত্বকে অস্বীকারের অহংকারই এই কবিতার মূল মর্মবস্তু। কবি যখন বলেন 'আমি বিদ্রোহী ভৃগু ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন।' তখন সেই ভগবান শুধু ধর্মাশ্রিত ধারণার অন্ধ আবেগসর্বস্ব একনায়কতন্ত্রী শক্তি নয়। তা রাষ্ট্রীয় ভগবানেরও প্রতীক। সেই রাষ্ট্রীয় ভগবান অভিজাততন্ত্রের প্রতিভূ। উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রেখে যে-মানুষ শ্রমদানের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বিবর্তন ঘটায়, সেই মানুষ শুধু ধর্মীয় ভগবান নয়, রাষ্ট্রীয় ভগবানের দ্বারাও শোষিত হয়, নিষ্পেষিত হয়। এই যোগসাজসের কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'রক্তকরবী'তে। শ্রেণী-নির্ভর সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধেই নজরুলের বিদ্রোহ। শুধু ধর্মীয় ভেদ-প্রবণতা, জাত-পাতের বৈষম্য, অধ্যাত্মবাদী কূপমণ্ডুকতাই নজরুলের মূল লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠেনি। যে-রাষ্ট্র ব্যবস্থা এরকম ক্ষয়িষ্ণু ও অকেজো মূল্যবোধকে জিইয়ে রাখে মহত্ত্ব দান করে, তার মূল বনেদটাকে ভেঙে একটা ভেদহীন, শোষণ হীন ও স্বাধীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন নজরুল। এ রকম স্বপ্ন দেখার ক্ষেত্রে অন্যদের সঙ্গে নজরুলের আবার গুণগত তফাৎও ছিল।

নজরুল যখন বলেন 'যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস, যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ' তখন বোঝা যায় শুধু বিদেশি ব্রিটিশ শাসককে উৎখাত করার অঙ্গীকারেই কবি সমর্পিত নন, শ্রেণীগত শোষণের প্রতিভূ হিসাবে যারা প্রচলিত রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোকে বলবৎ করেছে সেই তাবৎ শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধেই প্রত্যাঘাতের লড়াইয়ে তিনি প্রতিশ্রুত।

বিশের যুগের রাষ্ট্র চেতনার প্রচলিত ধারণার সঙ্গে এখানেই নজরুলের রাষ্ট্রচেতনাকে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে বিশেষিত করা হয়। বিশের যুগের ভারতীয় ভূগোল নানান স্ববিরোধিতার দৌর্বল্যে দীর্ণ হয়ে উঠেছিল। ১৯০৫-এর তুমুল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী

আন্দোলনের পর বাঙালীর ব্রিটিশ ভজনা কতোটা কমেছিল? ১৯০৮-এ ক্ষুদিরামের ফাঁসিতে প্রাণ যাওয়ার পরও বাঙালীর আবেগ কি ব্রিটিশ-বিরোধিতায় উথলে উঠেছিল? ১৯০৮য়েই বোমা বানানোর মামলায় শ্রীঅরবিন্দ ধরা পড়লেন। ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত একমাত্র বাঙলাতেই ৫৫০টা রাজনৈতিক মামলা দায়ের করে ব্রিটিশ প্রশাসন। রজনী পাম দত্ত তাঁর 'ইন্ডিয়া টু-ডে' গ্রন্থে লিখেছেন পুলিশের জুলুম মারাত্মক ভাবে বেড়ে যায়। বিস্তর জনসভা ভণ্ডুল করে দেওয়া হয়। পাঞ্জাবের কৃষক আন্দোলনের ওপর দমনমূলক অনাচার চালানো হয়। তখন জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার অপরাধে স্কুলের বাচ্চাদের পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু এতো সব দমনের মুখেও সরকার যেই না মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের টোপ ফেললো, জাতীয় কংগ্রেসের মডারেট পন্থী নেতারা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করলেন।

অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সঙ্গে ভারতীয়দের মূল দ্বন্দ্বের দিকটা তাঁরা তখন উপলব্ধিই করতে পারেন নি। আর সে দ্বন্দ্ব যে এ্যানটাগনেষ্টিক বা বৈরী মূলক এ-সব কথা তাদের মগজেই ছিল না। তারপর ১৯১১ সালে যেই না বঙ্গ ভঙ্গ প্রস্তাব রদ হয়ে গেল জাতীয়তাবাদী নেতারা ব্রিটিশ রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

বস্তুত ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল, মাত্র কয়েকটা বছরের মধ্যেই, বিশেষ করে ১৯১১ সালের পর তা স্থিমিত হয়ে পড়লো। ব্রিটিশের অধীনে থেকে শাসনতান্ত্রিক কিছু কিছু ক্ষমতা ভোগই ছিল কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন "আমাদের উদ্দেশ্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটানো নয়, ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে আরও ব্যাপক সেই শাসনের বৈশিষ্ট্যকে আরও জনপ্রিয় এবং তার রূপ-কে আরও উন্নত করে সমগ্র জাতির অক্ষয় প্রীতির ওপর প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের লক্ষ্য।"

নজরুলের রাষ্ট্র চেতনা ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্রিটিশ শাসনকে তাঁর ভিত সহ নির্মূল করা এবং তা বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়েই বাস্তবায়িত করা। নজরুল বিশ্বাস করতেন এ কাজ তথাকথিত ভদ্দরলোকদের আপস সুলভ মনোভঙ্গির প্রশ্রয়ে কখনোই সম্ভব নয়। এর জন্য মজুর ও কৃষকের জোটবদ্ধতা অবশ্যম্ভাবী। শোষিত শ্রেণীই পারে একটা শোষণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সমূলে উচ্ছেদ করতে। তিনি ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার কোনো বিধি-বিধানকে স্বীকার করেন নি। তাঁর রাষ্ট্রীয় চেতনা ছিল আপসহীন, বৈরী-ভাবাপন্ন।

১৯২২ সালে প্রকাশিত 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাতে নজরুল লিখেছেন 'বজ্র শিখার মশাল জেলে আসছে ভয়ঙ্কর / ওরে ঐ হাসছে ভয়ঙ্কর।' ওই কবিতাতেই আছে 'জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ লুকানো ঐ বিনাশে।' কিংবা 'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?- -প্রলয়নূতনসৃজনবেদন! / আসছে নবীন-জীবন-হারা অসুন্দরে করতে

ছেদন! ... ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর।'

এ কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ, উপমা, রূপকল্প বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 'ভয়ঙ্কর', 'বিনাশ', 'ধ্বংস', 'প্রলয়', 'ছেদন', ইত্যাদি শব্দগুলো সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের সূচক। নোনা ধরা দেওয়ালে বা ভিতে পালিশ বা চুনকাম করার মতো কোনো তাপ্পি দেওয়ার মনোভঙ্গি এ কবিতায় প্রাধান্য পায়নি। 'জরায়-মরা মুমূর্ষু' বলতে নজরুল সর্বহারা শ্রেণীর কথাই বলতে চেয়েছেন। আর তাদের বেঁচে থাকার জন্য যে পরিপূর্ণ বিনাশের কথা উল্লেখ করেছেন সেই বিধ্বংস ক্রিয়ার মূল লক্ষ্য তাঁর কালের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও আর্থ-সামাজিক অবয়ব।

'প্রলয়োল্লাস' নামের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৩২৯ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায়। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের 'নারায়ণ' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় তা পুনর্মুদ্রিত হয়। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তার 'কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা' গ্রন্থে এই কবিতা লেখার পটভূমিও ব্যাখ্যা করেছেন। নজরুল ১৯১৭ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন যুদ্ধের রণকৌশল শেখার মূলগত তাগিদ থেকেই। পরবর্তী কালে সংঘটিত ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সরকারী সেনারাই বন্দুকের নল উঁচিয়ে ধরে সরকারকে উৎখাতের জন্য। নজরুলের ভাবনা বাস্তবতা বোধ বর্জিত ছিল না। করাচির সেনা নিবাসে থাকার সময় নজরুল রুশ বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার খবর পেয়েছিলেন। রুশদেশে সাম্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার খবর পেয়ে নজরুল তাঁর ঘনিষ্ঠ সৈনিক বন্ধুদের নিয়ে সারা রাত ধরে উৎসব করেছিলেন। নজরুলের বন্ধু ৪৯ নম্বর বেঙ্গলি রেজিমেন্টের জমাদার শম্ভু রায়ের লেখা চিঠিতে এ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। জমাদার রায় এই চিঠিখানা লিখেছিলেন নজরুল জীবনীকার হুগলির প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে সেনাবাহিনী থেকে ফিরে আসার ৩৭ বছর পরে। ১৯৫৭ সালের ৬ই জুন তারিখে লেখা ওই চিঠিতে আছে ঃ

"নজরুল তার বন্ধুদের মধ্যে যাদের বিশ্বাস করত তাদের এক সন্ধ্যায় খাবার নিমন্ত্রণ করে, অবশ্য এই রকম নিমন্ত্রণ প্রায়ই সে তার বন্ধুদের করত। কিন্তু ওই দিন যখন সন্ধ্যার পর তার ঘরে আমি ও নজরুলের অন্যতম বন্ধু অরগ্যান মাস্টার হাবিলদার নিত্যানন্দ দে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম অন্যান্য দিনের চেয়ে নজরুলের চোখে মুখে একটা অন্য রকমের জ্যোতি খেলে বেরোচ্ছিল। উক্ত নিত্যানন্দ দে মহাশয়ের বাড়ী ছিল হুগলী শহরের ঘুটিয়াবাজার নামক পল্লীতে। তিনি অর্গানে একটা মার্চিং গৎ বাজানোর পর নজরুল সেইদিন যে সব গান গাইল ও প্রবন্ধ পড়ল তা থেকেই আমরা জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গান বাজনা প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লালফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে এবং ঠিক নাম মনে নেই সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখায়। ঐ পত্রিকাতে আমরাও বিশদভাবে সংবাদটি দেখে উল্লসিত হয়ে উঠি। সে দিন সারা রাতই প্রায় হৈ হল্লোড়ে আমাদের

কেটে গিয়েছিল।"

স্পষ্টই বোঝা যায় নজরুল ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের খবর রাখতেন করাচির সেনা নিবাসে থাকার সময়। রুশদেশে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে যে শোষণহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রাথমিক সূচনা ঘটেছিল সেই রাষ্ট্র চেতনা নজরুলকে প্রাণিত করে। তা নাহলে ব্রিটিশ সরকারের সেনা নিবাসে নিয়োজিত একজন সৈনিক হয়েও নজরুল এতটা ঝুঁকি নিয়ে গোয়েন্দাদের চোখ এড়িয়ে এ ধরনের দুঃসাহসিকতার সঙ্গে রুশ বিপ্লবের নামে ঘরোয়া উৎসবের আয়োজনে সমস্ত রাত জেগে কাটাতে পারতেন না।

আর জমাদার শম্ভু রায় যে পত্রিকার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর চিঠিতে সেটাও নজরুলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের এক উল্লেখযোগ্য দিক প্রতিভাত করে। সেনা বাহিনীতে যোগ দিয়েও পৃথিবীর কোথায় কোন্ ঘটনা ঘটে যাচ্ছে নজরুল সে সবের খবর রাখতেন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। নিছক রুজি রোজগারের তাগিদে যুদ্ধে নাম লেখানো একজন পেশাদার সৈনিক হলে এমনটা হবার কথা নয়। বস্তুত নজরুল আর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় রানীগঞ্জের আলাদা আলাদা হাইস্কুলে মাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ার সময় যে যুদ্ধে যাবার জন্য নাম লিখিয়েছিলেন তার মধ্যে সশস্ত্র পন্থায় ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান ছিল। সুভাষচন্দ্র বসুও এই ইচ্ছা থেকেই ১৯১৬ সালে যুদ্ধে যাবার জন্য নাম লিখিয়েছিলেন। বস্তুত, তখন তাঁর চোখে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ছিল না বলেই তিনি প্রাথমিক পরীক্ষায় বাতিল হয়ে যান। আর শৈলজানন্দের রায়বাহাদুর খেতাব পাওয়া দাদু কৌশল করে ডাক্তারি পরীক্ষায় নাতিকে অযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করাতে না পারলে শৈলজানন্দও নজরুলের সঙ্গে সৈনিকের জীবনে বৃত হতেন।

কথাটা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো নজরুলের জীবনীকারেরা বেশীরভাগই নজরুলের যুদ্ধে যাওয়ার ঘটনাকে খুবই সরলীকৃত সংজ্ঞায় ফেলে বলতে চেয়েছেন যে, না খেতে পাওয়া, বাউণ্ডুলে নজরুল যুদ্ধে গিয়েছিলেন স্রেফ চাকরির তাগিদে। এ কথাটা বলার মধ্য দিয়ে নজরুলের বৈপ্লবিক আদর্শকেই খাটো করে দেখানোর প্রবণতা কাজ করে। আর এভাবে ইতিহাসকেও বিকৃত করা হয়। কেন না ১৯০৮ সালে নজরুলের বাবা মারা গেলে নজরুলের পারিবারিক দুরবস্থা এমন হয়ে পড়েনি যে, না খেতে পাবার মতো অবস্থা হয়েছিল তাঁর। আর নজরুলের মধ্যে কিশোর কাল থেকেই শিল্পী সুলভ খেয়ালিপনা থাকলেও নজরুল বস্তুত কোনো দিনই 'বোহেমিয়ান' বা বাউণ্ডুলে প্রকৃতির ছিলেন না। ঘরের বাইরে বেরিয়ে বাইরের বিশ্বকে খুঁজে দেখার রোমান্টিক অনুরণন বা এ্যাডভেঞ্চারিজ্‌ম থাকলেই তাকে বাউণ্ডুলেপনা বলা যায় না। লেখক শিল্পীরা ও রকমের গড়পড়তা মাপের ছাপোষা জীব বা দশটা-পাঁচটার বাঁধা গণ্ডীতে বসত করা কেরানি মন। শৃঙ্খলা যখন শৃঙ্খলে পরিণত হয় তখন তাকে ভেঙে নতুন শৃঙ্খলা তৈরীর নাম সৃজনশীলতা। নজরুল সেই মৌলিক ভাবনার সৃজনশীল লেখক। করাচিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে লেখা চিঠিতে নজরুল নিজেই তাঁর

সম্পর্কে প্রচলিত অভিযোগের যথাযোগ্য জবাব দিয়েছেন। সে চিঠি ঢাকা থেকে প্রকাশিত আবদুল ফকির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলীতে সংকলিত হয়েছে।

দূরদর্শিতা সুলভ বৈদগ্ধের অধিকারী ছিলেন বলেই বালক বয়সেই তাঁর মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জেগে উঠেছিল। শিয়ারশোল স্কুলে পড়ার সময় নজরুল এক কাল্পনিক খেলায় মেতে উঠতেন। এক বন্ধুর একখানা পাখি মারা বন্দুক নিয়ে নজরুল একটু নির্জন জায়গায় চলে যেতেন। সেখানে ছোটলাট বড়লাট প্রমুখ ইংরেজ শাসকদের মূর্তি হিসাবে কল্পনায় ধরে নিয়ে গুলি ছুঁড়তেন। তাঁর কল্পনার মূর্তিগুলো যখন বন্দুকের ছররায় ভেঙে পড়ত তখন তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠতেন। সে সময়ের বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' নামের স্মৃতিকথা মূলক গ্রন্থে এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সেই নজরুল করাচির সেনানিবাসে গিয়ে রুশ বিপ্লবের ঘটনায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন বুকের মধ্যে জমা গভীর স্বদেশপ্রেমের তাড়নায়।

সেনানিবাসে থাকার সময়ে নজরুল 'ব্যথার দান' ও 'হেনা' নামে যে দু'খানা গল্প নির্মাণ করেন সেখানেও রুশ বিপ্লবের মাহাত্ম্য নন্দিত হয়েছে। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় 'ব্যথার দান' প্রকাশিত হয়। বোঝাই যায় ১৯১৯ সালে বা তার আগেও এ গল্প লেখার কথা ভেবে থাকতে পারেন নজরুল। এ গল্পের নায়ক সরফুল মুল্ক অনেক ব্যথা বেদনা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত লালফৌজে যোগ দেয়। নায়কের আর এক বন্ধু দারাও তাই করে। দারার মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে "এর চেয়ে ভালো কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না, তাই এ দলে এসেছি।" আর সরফুল মুল্কের উক্তিতে এ দল বলতে তাঁদের কথাই বলা হয়েছে যারা "উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, ...।"

নজরুল তাঁর উনিশ-কুড়ি বছর বয়সের অনুভবে উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রেরণায় স্পন্দিত হয়েছেন। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষায় তিনি যে সশস্ত্র হয়ে উঠতে চাইবেন এটাই তো স্বাভাবিক। সেজন্যই তাঁর লেখায় ও অভিভাষণেও এই জঙ্গী স্ফূর্ততা প্রতীকায়িত হয়েছে নানান রূপে, বিচিত্র বর্ণে। এভাবেই নজরুল হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথের পরেই সবচাইতে আলোড়িত বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর এই জঙ্গম স্ফূর্ততা তাঁর কবিতা ও সঙ্গীতের শরীরেও সৃষ্টি করেছে সমুদ্রের মতো দুর্বার গতিময়তা ও দুরন্তপনা। সুখী সুখী নিরুপদ্রব ভাবনায় লালিত কারুকার্য সর্বস্বতা নয়, বরং সাদা সাপ্টা সরল আবেগ-আশ্রিত তেজগুণে ভরা তাঁর বেশীর ভাগ লেখাই।

ব্যথার দান গল্পের রূপকল্পও গড়ে ওঠে সমাজ বাস্তবতার অভিজ্ঞ আঁচেই। তাঁর ছেলেবেলার চুরুলিয়া থেকে অজয় নদ পেরিয়ে গেলেই ছুঁয়ে ফেলা যেত একদিকে বড়ু চণ্ডীদাসের বিচরণ ক্ষেত্র আর একদিকে সাঁওতাল বিদ্রোহের পটভূমি ছোটনাগপুর অঞ্চল। দুমকা জেলার জনজাতি মানুষেরা শুকনো অজয়ের বুকের ওপর

দিয়ে পায়ে হেঁটেই চুরুলিয়া গ্রামের হাটে চলে আসেন। ১৮৫৫ সাল থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত অজয়ের ওই পারের জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষেরা ব্রিটিশ প্রশাসন আর তাদের দোসর স্থানীয় জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে বার বার রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস তৈরী করেছেন। ১৮৫৫-এর সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই মহান নায়ক সিধু-কানুর বাড়ি ছিল নলার কাছে। চুরুলিয়া গ্রাম থেকে নলার দূরত্ব ছিল মাত্র পনেরো-ষোল মাইল। সাঁওতাল বিদ্রোহের সেই ইতিহাস নিয়ে সন্নিহিত অঞ্চলে লোক-কাহিনী ছড়ায়নি এমনটা তো হতেই পারে না। কবে, সেই ১৭৪২ সালে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর রানে বাংলার সীমানায় এসে বর্ধমান শহরের রানিসায়রের কাছে নবাব আলীবর্দী খানের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং শিবাজীর দেশের মারাঠা লুটপাটকারীরা বাংলায় এসে হানা দিত তাই নিয়েও তো লেখা হয়েছে অনেক ছড়া ও লোক-কথা। 'ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে, বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে' ইত্যাদি ছড়া গান গেয়ে এই সেদিনও বাঙালী মা ঠাকুমারা শিশুদের ঘুম পাড়াতেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় বাংলা ভাষাতেও 'লোকগান' রচিত হয়েছিল। ১৮৫৫ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত যে সব সংগ্রাম-লড়াই ঘটে গেছে জনজাতি গোষ্ঠীর দুঃসাহসিকতায় ভর করে, তা নিয়ে মুখে মুখে ছড়িয়ে যাওয়া এমন লোক-কথা নজরুল তাঁর মা-ঠাকুমার কাছে শোনেননি এমনটা হতেই পারে না। বিশেষ করে চুরুলিয়া অঞ্চলে যখন অনাথ বাউরি সম্প্রদায়ের মুচি, চামার, ভুঁইঞা এবং প্রাক্ দ্রাবিড় বাগদি, সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও, ডোম, কপালি, কৈবর্ত, মাল প্রমুখ গোষ্ঠীর মানুষের স্থায়ী বসত সে আমলেও ছিল। Some History And Ethnical Aspect of the Burdwan District গ্রন্থে W.B. Oldham যে সব তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যায় নজরুলের জন্মের ছ'বছর আগেও, ১৮৯২ সালে বর্ধমান জেলার রাঢ় অঞ্চলে ১,৪৯,৪৬১ জনের মতো শুধু বাউরি এবং ২২,২৫৬ জনের মতো সাঁওতাল জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস ছিল। চুরুলিয়া গ্রামেও এখন যে জনসংখ্যা রয়েছে সেখানে ন'ভাগের একভাগ বাউরি ও সাঁওতাল গোষ্ঠীর মানুষ।

নজরুল শুধু রুশ বিপ্লবের চেতনায়, হঠাৎ করে বিধৌত হননি। ১৭৮৯-এর ফরাসি বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্বের বাণীও তাঁকে মানসিক ভাবে পুষ্ট করেছিল আর তারও আগে তাঁর কৈশোরিক আবেগ নাড়া খেয়েছিল ঘরের কাছের জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষজনের সাঁওতাল বিদ্রোহের মতো দুঃসাহসিক ঘটনার অভিঘাতেও। পাঞ্চেতের অদূরে পুরুলিয়ার পঞ্চকোট পাহাড়ের সাঁওতালদের পশুশিকারের কাল্পনিকতা তাঁর গানে এমনি এমনি আসেনি। 'সারাদিন পিটি কার ছাদ গো' বলে যে নিপীড়িত দিন মজুর জনজাতি গোষ্ঠীর নারীরা সুর তোলে সেই ছাদ পেটাইয়ের গান নজরুল লিখেছেন শুধু সেই সমাজের মানুষের প্রতি করুণা বা দয়া প্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা থেকে নয়, অনাথ মানুষকে এ দেশে যুগ যুগ ধরে অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকারেই পরিণত করা হয়েছে সেই গভীর যন্ত্রণা বোধ থেকে। নজরুল যখন লেখেন 'ধর

হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল' তখন ২০ মাঘ ১৩৩২ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণনগরে লেখা সেই 'শ্রমিকের গান'-এ ভাঙনের ধ্বনি শোনা যায়। সে ভাঙন ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির ধ্বংসকেই সূচিত করে। আর সে ভাঙনের নেতৃত্ব কেন্দ্রিত হয়ে ওঠে মজুর ও কৃষকের যৌথ প্রয়াস হিসাবে। ১৯২৬ সালে নজরুল এ গান লেখার দু' মাস আগে হুগলিতে শেষ পর্যায়ে লেখেন 'কৃষাণের গান'। ১৯২৬ সালেই শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' প্রকাশিত হয় এবং সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত বলেও ঘোষিত হয়। পথের দাবিতে শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্তের বিপ্লববাদকে মহিমান্বিত করতে চেয়েছেন। ভারতী ও তলোয়ারকরের সংলাপেই তা বোঝা যায়। কিন্তু একই কালে নজরুল শ্রমজীবী মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন স্বাধীনতা ও শোষণ মুক্তির লড়াইয়ে। ১৯২৬ সালের মে মাস থেকে নজরুল কৃষ্ণনগরের শ্রমজীবী মানুষের বসতি অঞ্চল চাঁদ সড়কে বাস করতেন। সে সময়ে লেখা তাঁর 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসেও আনসার নামের চরিত্রকে দিয়ে বলানো হয়েছে 'নীড়হারাদের সাথী আমি। ওদের বেদনায় ওদের চোখের জলে পরিপূর্ণ রূপে দেখতে পাই। ...আমার রাজনৈতিক মত বদলে গেছে।'

শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পেও এই বঞ্চিত মানুষের কথা আছে। কিন্তু নজরুল বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন হিসাবে সুচিহ্নিত করতে চেয়েছেন। একই সময়ে লেখা 'কুহেলিকা' উপন্যাসে নজরুলের এই মানসিকতার সুস্পষ্ট রূপ প্রতিফলিত হয়েছে। 'কুহেলিকা' উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র জাহাঙ্গীর ছাত্র জীবনেই তাঁর বিপ্লবী শিক্ষক প্রমত্তের কাছে দেশ স্বাধীন করার দীক্ষা নেয়। সেই প্রমত্ত বলেন ঃ "আমার ভারতবর্ষ—ভারতের এই মূক-দরিদ্র-নিরন্ন-পর-পদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া নয়, হিন্দুস্তান নয়, গাছপালার ভারতবর্ষ নয়,—আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন তীর্থ। কত অশ্রু সাগরে চড়া পড়ে পড়ে উঠ্‌ল আমার এই বেদনার ভারতবর্ষ। ওরে, ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মস্‌জিদের ভারতবর্ষ নয়—এ আমার মানুষের—মহা-মানুষের ভারতবর্ষ।"

কুহেলিকা উপন্যাসে নজরুল এমন বিষয়ও উল্লেখ করতে ভোলেননি যেখানে স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের একটা অংশ মনে করতো "আমরা ডান হাত দিয়ে তাড়াব ফিরিঙ্গী এবং বাম হাত দিয়ে খেদাব নেড়ে।" স্বাধীনতার নামে হিন্দুর ধর্মীয় পুনরুত্থানই তাঁদের মগজ নিয়ন্ত্রণ করতো। তাই "তারা মুসলমানকে ইংরেজের চেয়ে কম শত্রু মনে করে না।"

এভাবেই নজরুল তাঁর কালের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে উপলব্ধি করেছিলেন। এ জন্যেই নজরুল যখন হিন্দু ও মুসলমানের সম্প্রদায়গত সম্প্রীতির কথা বলেন তখন তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের মতো 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' বাণীর মর্মার্থকে প্রাধান্য দিয়েও বোধ হয় আরও অনেক অনেক গভীর উৎসমূলে ঢুকে যেতে চেয়েছিলেন। সেখানে রক্ষণশীল, রাজতন্ত্রী ইসলামকে অস্বীকার করে

নজরুল লোকায়ত ইসলামের সাম্যবাদী চেতনাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বস্তু ইসলামের উত্থান ঘটেছিল ৬২২ সালে মদিনা শহরে যেখানে কৃষিজীবী গরীব মানুষ ও পাহাড়ি উপজাতি অংশের শোষিত মানুষেরাই প্রথম ইসলামের শোষণ বিরোধী ও দাসতন্ত্র বিরোধী স্লোগানে মুগ্ধ হয়েছিল। দাসকে মুক্তি দাও, সামাজিক সম্পদ সমভাবে বন্টন করো, মানুষকে শোষণ করো না ইত্যাদি স্লোগানই ছিল ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক ভিত্তি। এমনকি ইসলামে খলিফা অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান ও ধর্মীয় প্রধান নির্বাচনের প্রক্রিয়া চালু হয়েছিল। উত্তরাধিকার সূত্রে মনোনয়ন প্রথা ইসলামী আইনে ছিল না। বোধ হয় এ সব কারণেই ৬২২ থেকে ৬৩২ সালের মধ্যে মাত্র দশ বছরে বেদুইন আরবদের মতো প্রায় অর্ধ সভ্য ও বিশৃঙ্খল জাতিকে নিয়ে হযরত মহম্মদ একটা পাকা-পোক্ত রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। শুধু অধ্যাত্মবাদী ধর্মীয় আবেগ ও অলৌকিক ঈশ্বর-ভাবনা দিয়ে এ কাজ করা যায় না। নজরুল মধ্যযুগীয় ইসলামের এই ঐতিহাসিক ইতিবাচকতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন আধুনিক কালের রাষ্ট্রীয় চেতনার পটভূমি হিসাবে। ইসলামের আধ্যাত্মিকতা ও রাজতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থাকে তিনি গ্রহণ করেননি। ধর্মতত্ত্ববাদের অন্ধ আবেগে যাঁরা নজরুলকে মুসলমানী জাতীয়তাবাদের কবি হিসাবে প্রচার করে থাকেন তাঁদের ভুলটা সেখানেই।

বস্তুত নজরুল ১৯২১-২২ সালের খিলাফত আন্দোলনের দ্বারা প্রাণিত হয়েছিলেন বলে যারা মনে করেন তারাও নজরুলকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। খিলাফতওয়ালারা চেয়েছিলেন তুরস্কে খিলাফতি রাষ্ট্রব্যবস্থা বজায় থাকুক। তুরস্কের খলিফা দুনিয়ার তাবৎ মুসলমানের নেতা বলে সম্মানিত হোন। নজরুল যদি তা চাইতেন তাহলে তিনি ১৯২১ সালে তুরস্কের কামাল পাশাকে অভিনন্দিত করে কবিতা লেখেন কী করে? কামাল পাশা তুরস্কে খিলাফতি রাষ্ট্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন। সে বিদ্রোহে কামালের পরিপূর্ণ জয়লাভের আগেই নজরুল 'কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই' বলে কবিতা লেখেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় 'কামাল পাশা' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। কামাল জয়লাভ করেন ১৯২২ সালে।

তুরস্কে কামাল আতাতুর্কের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত নতুন বিধিবিধানগুলো কিছুটা ব্যাখ্যা করলেই বোঝা যাবে ইসলামের পীঠস্থান বলে মনে করা হয় যে সৌদি আরবকে, সেই যোদ্ধা রাণাদের শাসন কাঠামোর সঙ্গে কামাল আতাতুর্কের তুরস্কের কোনো মিলই নেই। সশস্ত্র বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তুরস্কের সুলতানকে অপসারণ করে কামাল প্রথমেই যে নীতি ঘোষণা করলেন তাতে তুরস্কে আরবি ভাষায় আজান দেওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। মাদ্রাসা শিক্ষার মতো সেকেলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাতিল করে শিক্ষার প্রবর্তন ঘটানো হয় আরবি লিপির বদলে ল্যাটিন লিপি চালু করা হয়। মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ কোরাণ আরবি লিপিতে লিখিত থাকা সত্ত্বেও সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হলো। মেয়েদের বোরখা বা

অবগুণ্ঠন প্রথাকে এবং পুরুষের ফেজ ব্যবহারও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত হল। তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটনায় পুরুষের স্বেচ্ছাচার উৎখাতের উদ্দেশ্যে আইনের চোখে পুরুষের চাইতে নারীর অধিকারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলো। যেখানে ১০০ জনের মধ্যে ৯৮ জন মানুষই মুসলমান সেই তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক এ ধরনের একটা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পত্তন ঘটালেন। ৬ কোটি ২৮ লক্ষ মানুষের দেশ তুরস্কে পচাত্তর বছর ধরে ধর্মীয় অনুশাসন নিষিদ্ধ রয়েছে। এখনো তুরস্কে সব আইন কতো কঠোরভাবে অনুসৃত হয় ১৯৯৯ সালের জুন মাসের এক ঘটনা উল্লেখ করলেই তা বোঝা যাবে। তুরস্কের কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত সাংসদ মেরভি কাভাকচি সংসদের অধিবেশনে শপথ নিতে হাজির হন মাথায় স্কার্ফ ও গায়ে চাদর দিয়ে। এ-কারণেই তাঁকে শপথ নিতে দেওয়া হয়নি। এমন কী তার সাংসদ-পদ বাতিলের কথাও ওঠে। তুরস্কে কলেজ ছাত্রীদের কেউ কেউ মৌলবাদী প্রবণতায় আচ্ছন্ন হয়ে চাদর জড়িয়ে ক্লাস করতে এলে চতুর্দিকে হৈ হৈ পড়ে যায়। বলা হয় এ-সব ধর্মীয় অনাচার চলবে না।

আমাদের দেশে ঠিক এর উলটো বিধিই প্রশংসা পায়। যার ঘোমটা যত বড় তাকে তত সভ্যতার প্রতীক বলে মনে করা হয় পাকিস্তানী, বাঙলাদেশী ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় ঠাকুরবাড়ির ব্রাহ্ম মহিলারা গঙ্গা স্নান করতে যেতেন পালকি চেপে। পালকির দরজা বন্ধ থাকতো। তবু পালকির সবটাই ঢেকে দেওয়া হতো মশারির মতো আবরণ দিয়ে। সেই পালকি সহ সকলকে চুবিয়ে নেওয়া হতো গঙ্গা জলে। বাঙালী মুসলমান মহিলারা বেশীরভাগই বোরখা পরায় অভ্যস্ত নন ঠিকই, কিন্তু অবাঙালী মুসলমান মহিলারা এখনো কলকাতা, দিল্লী, মুম্বাইয়ের মতো শহরেও বোরখা পরে ঘুরে বেড়ান। আরব দেশের মতো পশ্চিম এশিয়ার গড়পড়তা ৬০ ডিগ্রি উত্তাপে ঝলসে যাওয়ার ভয়ে পুরুষ ও রমণী সকলের শরীর ঢেকে বাইরে বেরোনোর প্রথা চালু হয়েছিল শারীরিক কারণেই। ইসলামের প্রবর্তন হওয়ার আগেই এ প্রথা চালু ছিল। সেই প্রথাই ভারতের মতো নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার দেশে কট্টর ধর্মীয় আচার হয়ে দাঁড়ালো। ব্রিটিশ সরকার না হয় বিদেশী বলেই এ সব নিয়ে কাউকে চটাতে চায়নি। কিন্তু একটা স্বাধীন দেশে রাষ্ট্রীয় আইনের সঙ্গে ধর্মের বিযুক্তি ঘটবে না কেন? কুম্ভমেলায় রাষ্ট্রপতির স্নানের দৃশ্য রাষ্ট্রীয় খরচে সরকারি মাধ্যমে প্রচারিত হবে কেন? ১৯২৪ সালে তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক যা পেরেছিলেন, আর আজও যা তুরস্কের অনেক রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যেও কঠোরভাবে অনুসৃত হচ্ছে, পৃথিবীর অনেক দেশেই রাষ্ট্রীয় আইন ব্যবস্থায় তা গৃহীত হয়নি। এখনো স্রেফ ক্যাথলিক হওয়ার কারণে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার আইন নেই খোদ ইউরোপের দেশে। অথচ এরাই নাকি ভারতবর্ষকে সভ্যতা শিখিয়েছে বলে একদল মানুষ এখনো গাল, গলা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে বেড়ায়। নজরুল ১৯২১ সালে সেই তুরস্কের খিলাফতি শাসন বিরোধী বিদ্রোহকে অভিনন্দিত করেন কোন্ রাষ্ট্রীয় চেতনা থেকে?

ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কিত ভেদ বিভেদ সম্পর্কে ১৯২৬ সালে 'গণবাণী' পত্রিকায় নজরুল মন্দির-মসজিদ, হিন্দু-মুসলমান নামের উল্লেখযোগ্য দুটো প্রবন্ধ লেখেন। মোল্লা-মৌলবীদের ভণ্ডামি নিয়েও নজরুলের একাধিক কবিতা ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। শুধু ধর্মীয় ভেদ-ভাবনা নিরসনের উদ্দেশ্যেই নজরুল এ-সব লেখেননি। যে রাষ্ট্রীয় কাঠামো এই ভেদ প্রবণতাকে জিইয়ে রাখে নজরুল সেই মূল জায়গাটায় আঘাত করতে চেয়েছেন। এ-সব লেখা থেকেও নজরুলের রাষ্ট্রীয় চেতনার স্বরূপ চিহ্নিত হতে পারে। শুধু কামাল পাশা নয়, মিশরের দসনুল পাশাকে নিয়েও নজরুল আন্দোলিত হয়েছিলেন। নজরুলের স্বদেশ চেতনা এভাবেই আন্তর্জাতিক চেতনার অবয়ব পেয়ে গিয়েছিল। যেমনটা ঘটেছিল তাঁর প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও।

রবীন্দ্রনাথ তুরস্ক ভ্রমণের পর তুরস্কের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে খুবই শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। কামাল আতাতুর্ক মারা যান ১৯৩৮ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখে। রবীন্দ্রনাথ ১৮ই নভেম্বর সে খবর শুনে বিশ্বভারতীর সমস্ত বিভাগে ছুটি ঘোষণা করেন এবং শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে এক সভার আয়োজনও করেন। পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের মৃত্যুতেই রবীন্দ্রনাথের আমলে এভাবে বিশ্বভারতীতে ছুটি ঘোষণার রেওয়াজ ছিল না। তিনি সেই সভায় যে ভাষণ দেন তা খুবই তাৎপর্যমণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ

কুসংস্কার অপেক্ষা অনুৎকৃষ্ট ধর্মানুরাগরূপ চোরাবালির উপর দাঁড়াইয়া আমরা জাতীয় বিচ্ছিন্নতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমার হিন্দু স্বদেশবাসীদের নিকট আমার দৃঢ় বিশ্বাসপূর্ণ বক্তব্য এই যে, আমাদের সমাজ অর্থহীন আচার ও অনুষ্ঠানের ভারে কাতর, তোমরা যদি কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া নতুন যুগের আহ্বানে সাড়া না দাও, তাহা হইলে তোমরা ধ্বংস হইবে। আমার মুসলমান স্বদেশবাসী, যাহারা যে কোনও রূপ সমালোচনায় ক্রুদ্ধ হয়—আমি কেবল তুরস্ক ও পারস্যের দৃষ্টান্তের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

১৯৩৮ সালে ঘোষিত রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের সম্মেলনে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপিত হলো স্রেফ ধর্মীয় জিগিরের ভিত্তিতে। আর 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' নামে একটা ভুল ধারণাকে সংক্রামিত করা হলো হিন্দু ও মুসলমান উভয় অংশের মানুষের মধ্যে। শুধু ধর্মীয় পরিচয়ে একটা সম্প্রদায়কে জাতি বলে চিহ্নিত করার মতো মারাত্মক ভ্রান্তি সম্পর্কে সে সময়ের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কী করে উদাসীন থাকলেন তাও ভেবে বিস্মিত হতে হয়। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই সম্মেলনে যে বাণী পাঠান তাতে এশিয়ার নবজাগরণের কথা, বিশেষ করে তুরস্কের কামাল আতাতুর্কের কথাই মূল বিষয় হয়ে ওঠে।

আসলে বিশ শতকের রাষ্ট্রীয় ধ্যান-ধারণায় ধর্মাচ্ছন্নতা বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। আর এর জট ছিল আরও অনেক গভীরে। সামাজিক চেহারা ছেড়ে তা ক্রমশই

রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল সেই ১৭৫৭ সালের পলাশি যুদ্ধের পর থেকেই। বিজেতা ক্লাইভকে বলা হলো ইংরেজ। আর সিরাজকে দেখানো হলো মুসলমান বলে। ক্লাইভকে কিন্তু খ্রীষ্টান বলে চিহ্নিত করা হলো না। অর্থাৎ বিজেতা জাতি বিষয়ক বৈশিষ্ট্যে বৃত হলো। আর বিজিতকে ধর্মীয় পরিচয়ে বিশেষিত করার প্রবণতা তৈরী হলো। ভারতীয় জীবনচেতনার মূল ধারা থেকে তুর্কি, তাতার, পাঠান, মোগলদের বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর এ কলাকৌশলের কারিগর ইংরেজরাই। কিন্তু ভারতীয় চিন্তা-চেতনায় ব্রিটিশের তৈরী এই প্রবণতার সংক্রমণ ঘটে ব্যাপক ভাবেই। ভারতীয় ইতিহাসবিদরাও তুর্কি, তাতার, পাঠান, মোগলদের জাতি বিষয়ক পরিচয়ে সুচিহ্নিত না করে 'মুসলমান' 'মুসলমান' বলে ধর্মীয় পরিচয়টাকেই বড় করে দেখাতে চাইলেন। শুধু তাই নয়, ভারতকে অবাধ বাণিজ্য পুঁজির খোলা বাজার বানিয়ে ইংলন্ডে পুঁজি পাচারকারী ইংরেজ শাসক যে অর্থে বিদেশী, তুর্কি, তাতার, পাঠান, মোগলদের সেভাবেই শুধু নয় আরও একটু বাড়তি কায়দাতেই 'বিদেশী' 'বিদেশী' বলে ভারতীয় ইতিহাসের ধারায় খুবই স্পর্শকাতর মনোভঙ্গি তৈরী করা হলো। বাবর থেকে ঔরঙ্গজেব বা সিরাজ-উদ-দৌলাহ্ থেকে বাহাদুর শাহ্ পর্যন্ত সকলেই যে ভারতীয় জীবনপ্রবাহের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তখন যে আর এদের অন্য কোন মাতৃভূমি ছিল না যেখানে ভারতের মাটি থেকে সংগ্রহ করা একটা পয়সাও এরা পাচার করতে পারেন, এই সহজ সত্যটাকে ভারতীয় ইতিহাসবিদ্‌রাও গুলিয়ে দিলেন। ইংরেজ শাসনকে খ্রীষ্টান যুগ বলা হলো না, কিন্তু প্রাক্ ইংরেজ শাসনকে বলা হলো মুসলিম যুগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এই ধারণা প্রচারিত হলো ইতিহাস রচনার সময়। বঙ্কিম যখন ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের বিরোধিতা করেন সচেতনভাবে, তখন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে তিনি যে প্রগতিশীল ধনতন্ত্রকে সমর্থনের মনোভঙ্গি থেকে তা করেছিলেন এমন কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না আনন্দমঠের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা পড়লে। 'এখন যবন যাউক, ব্রিটিশ থাকুক' বলে বঙ্কিম যে-ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠেন তা সামন্ততন্ত্র বিরোধী মনোভঙ্গির পরিচায়ক নয় মোটেই। সৈয়দ আহ্‌মদ ও আবদুল লতিফদেরও সেই দশাই হয়েছিল।

মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলকের মতো চরমপন্থী নেতাও ১৮৮১-৮৪-এর কালেও বাল্যবিবাহ ও বর্ণ শাসন ব্যবস্থার ঘোরতর সমর্থক ছিলেন। ১৮৮৪ সালের ১৮ই নভেম্বর তারিখের কেশরী পত্রিকায় রানাডে, কুন্তে ও মোদকের প্রগতিমুখী ভাবনার বিরোধিতা করে তিলক প্রবন্ধ লেখেন রক্ষণশীলতার ওকালতি করে। তিলক তখন কেশরী-র সম্পাদক আগরকাকারেরও বিরোধিতা করেন বাল্য বিবাহ আইন ও বর্ণ শাসন ব্যবস্থা নিয়ে। মুম্বাইয়ের ডায়কো প্রকাশনের ছাপা তিলকের বায়োগ্রাফিতে এ তথ্য আছে। তিলক প্লেগ অসুখের টিকা দেওয়ারও বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন শিবাজী হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের বীর যোদ্ধা ছিলেন এবং তাঁকে প্রতীকায়িত করে ভারতে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম চাঙ্গা করে তোলা যাবে। শিবাজীর

সেনাবাহিনীতে যে অনেক পাঠান মুসলমান সৈনিক ছিল আর ঔরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীর মূল ভিত্তি ছিল অজস্র হিন্দু রাজপুত সৈনিক ও সেনাপতি এই সাধারণ বিষয়টাকে তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। মোগল বাদশাহ্‌রা শুধু হিন্দু রাজন্যবর্গের সঙ্গে যুদ্ধ করেননি, তাঁরা যে আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালির মতো, বা শেরশাহের মতো অনেক মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছেন, কিংবা হুমায়ুন যে মুসলমান প্রশাসকের কাছে হেরে গিয়ে রাজপুতদের আশ্রয়ে থেকেই শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন সে-সব রাজকীয় যুদ্ধের মূল বৈশিষ্ট্য তিলকের মতো আধুনিক মানুষও অনুধাবন করেননি। শিবাজীর নাতি শাহুজী একটা সময়ে মোগল রাজার আশ্রয়েই প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তিনি বড় হয়ে রাজকীয় স্বার্থেই মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। শাহুজীর ক্ষেত্রে সেটাই স্বাভাবিক ছিল। রাজতান্ত্রিক শাসনের সেটাই নিয়ম। ঔরঙ্গজেবের ছেলে দ্বিতীয় আকবর যখন নিজের বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের চেষ্টা করেন, তখন শিবাজীর ছেলে শম্ভুজী দ্বিতীয় আকবরকে আশ্রয় দেন। একেই বলে রাজতন্ত্র। রাজায় রাজায় যুদ্ধকে হিন্দু-মুসলমানের যুদ্ধ বলা যায় না। তবু তিলক শিবাজীকে হিন্দুর রক্ষক মনে করে শিবাজী উৎসব ও গণপতি উৎসব চালু করেন 'মহারাষ্ট্রে যথাক্রমে ১৮৯৫ ও ১৮৯৩ সালে। জার্মান অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মুলার বলতেন "Tilak lived more in the past than in the present." এই তিলকই যখন ১৯০৬ সালে কলকাতায় এসেছেন সেই শিবাজি উৎসব পালন উপলক্ষে তখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মডারেট পন্থী নেতাও তাঁকে সম্বর্ধনা দিয়েছেন। স্বভাবতই ব্রিটিশ শাসনের ফলে ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদী প্রবণতা জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন নবাব-বাদশাহদের উচ্ছিষ্ট ভোগী অংশ তাঁরা সিরাজের পরাজয়কে রাজনৈতিক ভাবে গ্রহণ না করে 'মুসলমানের সুদিন গেল' বলে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ভাবখানা এ-রকম যেন মোগল জমানায় বা সিরাজের শাসনে সব মুসলমান সুখেই ছিল। মুসলমানদের মধ্যে মজুর ছিল না! গরীব ছিল না! অত্যাচারিত চাষী ছিল না! বঞ্চিত, নিপীড়িত, না-খেতে পাওয়া' মানুষ ছিল না। এরাই, এই নবাব বাদশাহ্‌দের এক সময়ের তাঁবেদার ও কায়েমি স্বার্থের মুসলমানরাই হিন্দুর ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদী চিন্তার প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানী আবেগ সর্বস্ব রাজনীতির সুতিকাগৃহ নির্মাণ করেন। আর তারই কুফল ভোগ করে সাধারণ সরল মুসলমানরা।

নজরুল কাশ্মীরের শেখ আবদুল্লাহ্‌দের মতো দেওবন্ধ ঘরানার ছাত্র না হলেও আরবি কোরাণ ও পারসি ভাষা পড়ে তো বড় হয়েছিলেন। দশ বছর বয়সে পাড়ার মসজিদে কখনো সখনো আজানও দিয়েছেন আরবি জবানে। তাঁর পূর্বতন অষ্টম পুরুষের আমলে ২ বিঘে কম দুহাজার বিঘে জমির আয়মাদারি ভোগ-বিলাসও ছিল সম্রাট শাহ্‌ আলমের রাজত্বকালে। সেই বংশে জন্মেও নজরুল মোগল-মারাঠার যুদ্ধ বা ক্লাইভ-সিরাজের যুদ্ধকে মুসলমানী আবেগ দিয়ে বিচার করেননি। তাঁর ইতিহাস

চেতনা ছিল অত্যন্ত প্রখর। ১৯২৮ সালে রাজশাহীর এক সভায় গিয়ে সেজন্যেই তিনি সিরাজ-উদ্-দৌল্লাহ্ গ্রন্থের লেখক অক্ষয়কুমার মৈত্রের পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেছিলেন। কারণ অক্ষয়কুমার মৈত্র হলওয়েল সাহেবদের মতো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সিরাজকে ছোট করে দেখানোর জন্য অন্ধকূপ হত্যার গপ্‌পো ফাঁদেননি। বরং তিনি যথার্থ ইতিহাসবোধ থেকেই সেই গ্রন্থ লিখেছিলেন। এর জন্যেই হেমলতা দেবীর লেখা টেক্‌স্‌ট্ বুক কমিটির একটা বই সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কঠোর সমালোচনায় ঠাসা একখানা প্রবন্ধ রচনা করেন ১৩০৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে। ওই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন "সিরাজদৌলার রাজ্য শাসনকালে অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ লেখিকা অসংশয়ে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যদি বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'সিরাজদ্দৌলা' পাঠ করিতেন তবে এ ঘটনাকে ইতিহাসে স্থান দিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হইতেন।"

শুধু তাই নয় 'সিরাজদ্দৌলা' শীর্ষক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন "মোগল-পাঠানের সময় প্রত্যেক সম্রাট স্বতন্ত্র প্রভু রূপে স্বেচ্ছামতে রাজ্য শাসন করিতেন, সুতরাং তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছার আন্দোলনে ভারত ইতিবৃত্ত রসবৈচিত্র্যে তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইংরাজের ভারতবর্ষে ইংলন্ডের রাজতন্ত্রের শাসন। তাহার মধ্যে হৃদয়ের লীলা অত্যন্ত গৌণ ব্যাপার। মানুষ নাই, রাজা নাই, কেবল একটা পলিসি অতি দীর্ঘ পথ দিয়া ডাক বসাইয়া চলিয়াছে। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর তাহার বাহক বদল হয় মাত্র।"

ইতিহাসকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার ও উপলব্ধি করার অসীম ক্ষমতা ছিল রবীন্দ্রনাথের! ১৩১৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে লেখা 'শিবাজী ও গুরু গোবিন্দ সিংহ' নামের নিবন্ধে শিবাজী সম্পর্কে বলেন "শিবাজীর চিত্ত সমস্ত দেশের লোকের সহিত আপনার যোগ স্থাপন করিতে পারে নাই। এই জন্য শিবাজীর অভিপ্রায় যাহাই থাক না কেন, তাঁহার চেষ্টা সমস্ত দেশের চেষ্টা রূপে জাগ্রত হইতে পারে নাই। এই জন্য মারাঠার এই উদ্‌যোগ পরিণামে ভারতের অন্যান্য জাতির পক্ষে বর্গীর উপদ্রব রূপে নিদারুণ হইয়া উঠিয়া ছিল।"

সখারাম গণেশ দেউস্করের চাপাচাপিতে প্রথম বয়সে রবীন্দ্রনাথ ভাবোচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে শিবাজীকে নিয়ে একটা কবিতা লিখলেও পরে নিজের সেই দুর্বলতাকে সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠেছিলেন এবং সেই কবিতা রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর কোনো গ্রন্থে স্থান দেননি। মহারাষ্ট্রে বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গণপতি উৎসব ও ১৮৯৫-তে শিবাজী উৎসব প্রতিপালনের বাড়াবাড়ি দেখে রবীন্দ্রনাথ খুবই উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তাছাড়া বাংলায়ও শিবাজী উৎসব চালু হয়ে যায় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগেই। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দেই শিবাজী উৎসব ও স্বদেশী মেলা উপলক্ষে তিলক ও লাজপৎ রায় কলকাতায় আসেন। তিলকপন্থীদের সঙ্গে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের সংযোগ ঘটে

তখন থেকেই। ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই বাঙলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের বক্তৃতায় শিবাজী ও গুরু গোবিন্দ সিংহের মাহাত্ম্য প্রাধান্য পেতে থাকে। আর একথাও সত্য যে তিলকের প্রচারেই 'ডেকান রায়ট' অর্থাৎ দক্ষিণের ধর্ম দাঙ্গাও শুরু হয়।

এ-সব ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ খুবই বিচলিত বোধ করেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে লেখা 'শিবাজী ও গুরুগোবিন্দ সিংহ' শীর্ষক এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী আবেগের সমালোচনা করেন। ওই প্রবন্ধে তিনি বলেন, "বলের দ্বারা যে লোক এক করে সে অন্যকে দুর্বল করিয়াই এক করে ; শুধু তাই নয় ঐক্যের যে চিরন্তন মূল তত্ত্ব প্রেম তাহাকেই পরাস্ত করিয়া পঙ্গু করিয়া নিজের প্রয়োজন সাধন করে। রণজিৎ সিংহ স্বার্থপুষ্টির জন্যই সমস্ত শিখকে-ছলে-বলে কৌশলে নিবিড় করিয়া বাঁধিয়া ছিলেন।"

ওই প্রবন্ধেই রণজিৎ সিংহ সম্পর্কে তিনি বলেন,"শিখ সম্প্রদায়ের চিত্তে তিনি এমন কোনো মহৎ ভাবের সঞ্চার করেন নাই যাহাতে তাঁহার অবর্তমানেও তাহাদিগকে একত্র ধারণ করিয়া রাখিতে পারে। কেবলমাত্র অপ্রতিহত চাতুরী-প্রভাব এবং স্বার্থ সাধন সম্বন্ধে সতর্ক অধ্যাবসায়ের দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার লোভের সীমা ছিল না এবং তাঁহার ভোগস্পৃহাও অসংযত ছিল।"

রবীন্দ্রনাথের লেখায় আছে "গুরু নানক যে মুক্তির উপলব্ধিকে সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া জানিয়া ছিলেন, গুরু গোবিন্দ তাহার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারেন নাই। শত্রু হস্ত হইতে মুক্তি কামনাকেই তিনি তাঁহার শিষ্যদের মনে একান্তভাবে মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

ইহাতে ক্ষণকালের জন্য ইতিহাসে শিখদের পরাক্রম উজ্জ্বল হইয়াছিল সন্দেহ নাই, ইহাতে তাহাদিগকে রণনৈপুণ্য দান করিয়াছে তাহাও সত্য, কিন্তু বাবা নানক যে পাথেয় দিয়া তাহাদিগকে একটি উদার পথে প্রেরণ করিয়াছিলেন সেই পাথেয় তাহারা এইখানেই খরচ করিয়া ফেলিল এবং তাহাদের যাত্রাও তাহারা এইখানেই অবসান করিয়া দিল।

ইহার পর হইতে কেবল লড়াই এবং রাষ্ট্রবিস্তারের ইতিহাস। এ দিকে মোগল শক্তিও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল এবং শিখদল তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যতই কৃতকার্য হইতে লাগিল ততই আত্মরক্ষার চেষ্টা ঘুচিয়া গিয়া ক্ষমতা বিস্তারের লোলুপতা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।"

রবীন্দ্রনাথের গভীর দৃষ্টিতে গুরুগোবিন্দ সিংহের 'ক্ষমতা বিস্তারের লোলুপতা' এড়িয়ে যায়নি এবং গুরু নানক যে মুক্তির উপলব্ধিকে বড়ো করে দেখেছিলেন তাঁর সেই উদার মানবিক আবেদন কীভাবে ক্ষমতা বিস্তারের লোলুপতায় পর্যবসিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ সে কথা বলতে গিয়ে বস্তুত ধর্মতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক চেহারাটা এখানে ধরিয়ে দিয়েছেন।

আসলে উত্থানের সময়ে এবং প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্বে প্রত্যেক ধর্ম এমনকি

আধুনিক মতবাদেরও অবশ্যই একটা প্রতিবাদী ও প্রগতিশীল ভূমিকা থাকে। সে ভূমিকা বিশেষ সমাজ এবং ভৌগোলিক সীমানার অবক্ষয়ী ও অকেজো মূল্যবোধকে বাতিল করে একটা নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির শ্লোগানে উদ্দীপিত হয়। যেমন হয়েছিল খ্রীষ্ট, ইসলাম এমন কি ভারতীয় ব্রাহ্মবাদের ক্ষেত্রেও। কিন্তু অচিরাৎ রাষ্ট্রীয় অবয়ব আশ্রিত হয়ে বা কোথাও অভিজাততন্ত্রের আশ্রয়ে সেই ভাবাদর্শই প্রতিবাদী চারিত্র্য হারিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবাদর্শে পরিণত হয়। শোষিত পাহাড়ি উপজাতি ও কৃষি মজুরদের আবেগকে আশ্রয় করে দাসত্বের বিরুদ্ধে জেহাদের শ্লোগান নিয়ে যে ইসলাম ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে আরব জাতিকে উদ্বোধিত করে এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ব্যাপক ভাববন্যা সৃষ্টি করে, ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হযরত মহম্মদের মৃত্যুর পর সেই মূল্যবোধ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রে আশ্রিত হয়ে পড়ে সেই শতাব্দীর মধ্যেই। ফলে ইসলামও হয়ে পড়ে রাজতন্ত্রী এবং সেই রাজ্যবিস্তারের মোহে তার প্রাতিষ্ঠানিক রূপও প্রকট হয়ে ওঠে। তখন মুক্তির উপলব্ধি ক্রমশই ক্ষীণ হতে থাকে। ইসলাম তখন তুর্কি বা তাতারীয় নিষ্ঠুরতার পথে পা বাড়ায়।

রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলের অন্তর্দৃষ্টি অতটা গভীর না হলেও রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুল 'ধর্মসমাজের স্বারাজ্য' স্থাপনের প্রতিক্রিয়াকে ধরতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর রাষ্ট্রীয় ভাবনায় রাজতন্ত্রী ইসলামের জায়গা ছিল না। তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠাকে তিনি স্বীকার করেন নি। তুরস্কে খিলাফতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখা দেয় তাই-ই নজরুলের কাব্যে আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে।

ধর্মসমাজের স্বারাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা খোলাখুলি না বললেও গান্ধীজি কিন্তু 'রামরাজ্য' শব্দটা ব্যবহার করতেন স্বাধীন ভারতের চারিত্র্য বিষয়ক প্রতীক হিসাবে। কিন্তু রামচন্দ্রের শাসন কি সুবিচার ও সুশাসনের যথার্থ প্রতীক ছিল? স্ত্রী সীতার প্রতি রামের আচরণের মধ্যে কি সুবিচারের লক্ষণ দেখা যায়? রামচন্দ্র কি নিম্নবর্ণের মানুষকে হত্যা করেন নি? রামচন্দ্রের আমলে কি রাজকীয় শোষণ ছিল না? রামচন্দ্র যদি ইতিহাসের বাস্তব চরিত্র নাও হন তাহলেও বাল্মীকির রামায়ণ বর্ণিত রামচন্দ্রের শাসন কাল সম্পর্কে যে চিত্র পাওয়া যায় তাতেও কি বাল্মীকির তৈরী রামচন্দ্র নামের রাজাকে সুশাসনের প্রতীক বলে গ্রহণ করা যায়? গান্ধীজি কোন্ রাষ্ট্রাদর্শে বিশ্বাস করতেন?

গান্ধীজির রাষ্ট্রীয় ধ্যান ধারণা যাই হোক না কেন তাঁর দেশ স্বাধীন করার তত্ত্বের সঙ্গে নজরুলের ভাবাদর্শের কোনো মিল ছিল না। গান্ধীজি চাইতেন 'অটনমি'। পূর্ণ স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় তা গান্ধীজি পষ্টাপষ্টি বলতে চাননি। 'স্বরাজ' নামের যে কথাটা তিনি ব্যবহার করতেন নজরুল তাকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখেছেন। প্রবন্ধও লিখেছেন গান্ধীজির চরখা দিয়ে যে স্বাধীনতা আসবেনা সে কথাও নজরুল লিখেছেন কবিতায় ও প্রবন্ধে। শরৎচন্দ্র এক সময় হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি

ছিলেন। তিনিও বলতেন 'Swaraj can be helped by soldiers, and not by spiders.'। ১৯২২ সালে উত্তর প্রদেশের চৌরিচৌরার ঘটনা নিয়ে শরৎচন্দ্র বলেন ঃ "গোটা কতক কনস্টেবল infuriated mob-এর হাতে পুড়ে মরেছে তাতে কি হয়েছে? এতেই গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে? এত বড় বিরাট দেশের মুক্তির সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই ত! রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারিদিকে—সেই শোণিত প্রবাহের মধ্যেই ত ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল। এতে ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ এতে ? ... নন্ ভায়ওলেন্স খুব noble idea কিন্তু achievement of freedom is nobler–hundred times nobler." শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন' গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের এই উক্তির উল্লেখ আছে।

গান্ধীজি যেখানে চাইছেন নন্ ভায়োলেন্স, নজরুল লিখছেন 'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন আমি'। গান্ধীজি যখন বলছেন স্বরাজের কথা, নজরুল বলছেন ঃ"সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম ক'রে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ-দেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করছেন তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে বোঁচকা-পুটলি বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।

"পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল-কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।"

"রাজা শাসক হয়ে মোড়লী করে" এ পর্যন্তই যেতে পারেন গান্ধীজি, কিন্তু "দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করছে" এ উপলব্ধি থেকে গান্ধীজি স্বাধীনতার কথা ভাবার মতো লোক ছিলেন না। সেজন্যেই ব্রিটিশের অধীনেই 'স্বায়ত্তশাসনের' অধিকার পেলেই গান্ধীজি 'ইউনিয়ন জ্যাক উড়িয়ে দিতে রাজী" ছিলেন। সেজন্যেই ১৯২২ সালে চৌরিচৌরায় সরকারি কয়েকজন পুলিস হত্যার ঘটনায় গান্ধীজি এতই অনুতপ্ত হয়ে পড়েন যে সে সময়ের অমন দেশজোড়া উত্তাল আন্দোলন গান্ধীজি প্রত্যাহার করে নিলেন এবং প্রকারান্তরে জনতার ক্রোধাগ্নি থেকে ব্রিটিশ সরকারকে রক্ষার কৌশলই গ্রহণ করলেন। গান্ধীজি আফ্রিকার বুয়োর যুদ্ধের সময়ও সরকারি প্রাতিষ্ঠানিকতার সমর্থক ছিলেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সৈন্য সংগ্রহের কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

আর সেই ১৯২২ সালেই নজরুল নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'ধূমকেতুর পথ' নামে ওই দুঃসাহসিক প্রবন্ধ লিখলেন। নজরুল জানতেন

এভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা লিখলে ব্রিটিশ সরকারি আইনে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়ারই কথা। কারণ এক বছর আগে, ১৯২১ সালে কংগ্রেসের আহ্‌মেদাবাদ অধিবেশনে এই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উর্দুভাষায় শুধু মৌখিক ভাবে উত্থাপনের জন্যই মাওলানা হসরত মোহানীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবার যোগাড় হয়েছিল। সেই শাস্তির কথা তখনকার খবরের কাগজে বেরিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু আদালতের জুরিরা বললেন, লিখিত ভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা যখন প্রচার করা হয়নি, তখন অভিযুক্তকে কারাদণ্ড দেওয়া হোক। গান্ধীজি এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রথম মৌখিক ভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করার গৌরব হসরত মোহানীর। তার জন্য ১৯২২ সালের ১১ই জুলাই তারিখের হাইকোর্টের রায়ে তাঁর সাজা হয়। এ কথা জেনেও নজরুল খবরের কাগজে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে সেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানালেন। এ শুধু নজরুলের রাষ্ট্রীয় চেতনার দূরদর্শিতার পরিচয়ই বহন করে না, দুঃসাহসিকতার মাহাত্ম্যও সূচিত করে।

এই প্রবন্ধেই নজরুল শুধু গান্ধীভক্ত ও রবীন্দ্রভক্তদেরই সমালোচনা করেননি, বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের ভক্তদেরও কটাক্ষ করেছেন তাঁদের পলায়নবাদী মনোবৃত্তির জন্য। গান্ধীজি সরকারের হৃদয় পরিবর্তনের তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সরাসরি রাজনীতি করা মানুষ ছিলেন না। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ? তিনি তো অগ্নি-ঋষি বলে অভিহিত হতেন! তিনিও তো কখনো পূর্ণ স্বাধীনতার কথা উচ্চারণ করেন নি। তাঁর লেখায় 'অটনমি' ও সেল্‌ফ গবর্নমেন্ট শব্দ দুটোই প্রাধান্য পেয়েছে। এ শব্দের অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। শুধু তাই নয়, তাঁর জাতীয়তাবাদী ধারণাও ছিল অনেকটাই ধর্ম-সংস্কারাশ্রিত। ১৯০৮ সালে অরবিন্দ ঘোষ লিখেছিলেন ঃ "Nationalism is a religion that has come from God ... If you are going to be a Nationalist, if you are going to assent to this religion of nationalism, you must do it in the religious spirit." । আবার ১৯০৯ সালে তিনি বললেন ঃ "I say no longer that nationalism is a creed, a religion, a faith, I say that it is the Sanathana Dharma which for us is nationalism. This Hindu nation was born with the Sanathana Dharma, with it, moves and with it, it grows." বোঝাই যায় রামমোহন ১৮২০-এর কালে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করতেন আধুনিকতার বিচারে তা খণ্ডিত হলেও শ্রীঅরবিন্দের মতো একদেশদর্শী ছিল না। রামমোহন ইসলামী ধড় আর হিন্দু মুণ্ডু নিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা তৈরী করতে চেয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর পরে জন্মেও রামমোহনের মতো যুক্তিবাদী, আধুনিক ও উদার হয়ে উঠতে পারেননি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদ বলে চালান করে দিতে চেয়েছেন! কে পি করুণাকরণের Continuity and Change in Indian Politics গ্রন্থের ১৯৭২ সালের সংস্করণে ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায় এই মন্তব্যের উল্লেখ আছে।

বিপিনচন্দ্র পালের মতো বিপ্লবীও ১৯১০ সালে বলেন ঃ "Behind the new

nationalism in India stands the old Vedantism of Hindus."

তখনকার 'আল ইসলামের' মতো বাঙলা পত্রিকা এরকম মনোভঙ্গি নিয়ে বিস্তর সমালোচনা করে। এমনকি সুভাষচন্দ্র বসুও শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরির দর্শনকে নিষ্ক্রিয়তার দর্শন বলে মন্তব্য করেন। বস্তুত জেল থেকে বেরিয়ে শ্রীঅরবিন্দ যেভাবে কলকাতা পরিত্যাগ করে তো বটেই, ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীন চন্দননগর ছেড়েও পণ্ডিচেরি চলে গেলেন, তাতে তার সেই রাজনীতি বিবর্জিত জীবন নিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই অনেক প্রশ্ন দেখা দিতেই পারে। শ্রীঅরবিন্দ-ভক্তদের কটাক্ষ করে নজরুল যা লেখেন সেদিক থেকে তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যাবে না।

এক সময়ে সৈয়দ আহ্‌মদের মতো সমাজ সংস্কারক ব্রিটিশ প্রশাসনের ভজনা করতে গিয়ে বলেছিলেন ভারতীয় আইনসভায় সদস্য নির্বাচনের বদলে মনোনয়ন করাই ভালো। তাঁর মতে নির্বাচন হলে সাধারণ মানুষ জিতে গিয়ে আইনসভার সদস্য হয়ে যেতে পারে "যারা উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সঙ্গে এক টেবিলে আহার করার যোগ্য নয়"। সুতরাং আইনসভার অভিজাত ব্যক্তিদের মনোনয়নই তাঁর কাছে সেরা শাসন ব্যবস্থার প্রতীক বলে মনে হয়েছিল। কে এ নিজামীর লেখায় সৈয়দ আহ্‌মদ সম্পর্কে এ তথ্যের উল্লেখ আছে। রামমোহনের মতো মানুষও সংসদীয় কাজকর্মে ধনবান ও অভিজাত শ্রেণীর এবং শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন।

আর ১৮৮৫ সালে যে-কংগ্রেস দল গঠিত হয় তাতে পুঁজির মালিক ও ভূস্বামী গোষ্ঠীরই প্রাধান্য ছিল। সাধারণ মেহনতি মানুষ, বিশেষ করে শ্রমিক ও কৃষকের প্রতিনিধিত্ব ছিল না একেবারেই। রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজাততন্ত্র সুলভ একটা ব্যাপার ভারতীয় রাজনীতিতে বরাবরই প্রাধান্য পেয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কালে সেই অভিজাততন্ত্রের প্রতাপ ছিল খুবই বেশি মাত্রায়। নজরুল রাণীগঞ্জের শিয়ারশোলে মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র জীবনে প্রভাবিত হয়েছিলেন যুগান্তর গোষ্ঠীর বিপ্লবী নিবারণচন্দ্র ঘটকের দ্বারা। গোপনে পিস্তল লুকিয়ে রাখার কারণে নিবারণচন্দ্র ঘটকের ৫ বছর কারাদণ্ড হয়েছিল। সেনানিবাসে থাকার সময়ে রুশ বিপ্লবের প্রভাব নজরুলকে উদ্দীপিত করে। ১৯২০ সালে স্থায়ীভাবে কলকাতায় ফিরে তিনি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও আবদুল হালিমের মতো মানুষের ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। সে সময় তাঁদের সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগও গ্রহণ করেন। ১৯২০ সালে নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকা। তাঁরা সে পত্রিকায় শ্রমিক ও কৃষকের কথা লিখতেন। ১৯২৫ সালে নজরুল 'লাঙল' পত্রিকা বের করেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে জানা যায় নজরুল সে-পত্রিকায় কমিউনিস্ট ইশ্‌তিহার-এর বাঙলা তর্জমা করার পরিকল্পনা পোষণ করতেন। কমিউনিস্ট ইশ্‌তিহারের অনুবাদ করে উঠতে না পারলেও তিনি আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের অনুবাদ করেছিলেন এবং ১৯২৬ সালে তা 'গণবাণী' পত্রিকায়

ছাপা হয়। যে কবি কমিউনিস্ট ইশ্‌তিহার পাঠের আগ্রহে আকুল ছিলেন সেই ১৯২৫-এর কালে, বোঝাই যায় তাঁর রাষ্ট্রীয় চেতনায় সাম্যবাদী ধ্যান-ধারণাই প্রাধান্য পেয়েছিল।

রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত-যুক্তরাষ্ট্রে সর্বহারা শ্রেণীর রাজত্ব তৈরী হয়েছিল ১৯১৭ সালে, সেই রকমের স্বপ্ন-সাধনাই নজরুলের কাম্য ছিল। সুতরাং অভিজাততন্ত্রে শাসিত রাষ্ট্রব্যবস্থার ও সামাজিক বাতাবরণের বিরুদ্ধে গোড়া থেকেই তিনি সচেতন কর্ম প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

১৯২৫ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখে নজরুল ইসলামের উদ্যোগেই হেমন্তকুমার সরকার, শামসুদ্দীন হুসায়ন ও কুতবুদ্দীন আহ্‌মদের চেষ্টায় কলকাতায় 'দি লেবর স্বরাজ পার্টি অব দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামে একটা দল গঠিত হয়। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ১৯২৩ সালের ১৭ জানুয়ারী কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে জেলে থাকার সময়ে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সেই অবস্থায় হিমালয় পর্বতের গায়ে আলমোড়ায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয় ১৯২৫ সালে। লেবর স্বরাজ পার্টি গঠনের সময় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কলকাতায় ছিলেন না। বোঝাই যায় এই দল গঠনের পরিকল্পনা নজরুল নিজের মাথা থেকেই বের করেছিলেন।

সেই দলের ইশ্‌তিহার প্রকাশিত হয় 'লাঙল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়, ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৫ তারিখে, নজরুল ইসলামের দস্তখতেই। নজরুলের রাষ্ট্রচিন্তা অনুধাবনের ক্ষেত্রে ওই ইশ্‌তিহার বর্ণিত কর্মনীতি ও সংকল্প অংশটা খুবই মূল্যবান দলিল হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। সেই দলিলে বলা হয়েছে ঃ

"অতএব ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায় এই ঘোষণা করিতেছেন যে ভারতের জাতীয় দাবী পূরণের এখনও একমাত্র অবশিষ্ট উপায় এই যে, দেশের শতকরা আশিজন যাহারা—সেই শ্রমিক ও কৃষকগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং তাহাদিগকে জন্মগত অধিকার লাভে সাহায্য করা, যাহাতে তারা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে আরও সচেতন হইয়া নিজেদের ক্ষমতায় এবং নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাশালী স্বার্থপর ব্যক্তিগণের হাত হইতে স্বাধীনতা আনিতে পারে।" এই ইশ্‌তিহারে 'নিজেদের ক্ষমতায় এবং নিজেদের স্বার্থে' শব্দগুলোর ব্যবহার থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে নজরুল কাদের শক্তিতে কাদের জন্য স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন।

ওই ইশ্‌তিহারে যে 'কর্ম-সংকল্পের' অবতারণা করা হয় তাতে পয়লা নম্বর ধারায় বলা হয়েছে ঃ "এই দল শ্রমিক ও কৃষকগণের স্বার্থের জন্য যুঝিবেন। (ভদ্র ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে কোনো ব্যক্তি নিজের হাত, পা বা মাথা খাটাইয়া নিজের জীবিকা অর্জন করে, তাহাকে শ্রমিক বলিয়া গণ্য করা হইবে)।"

সরকারের কর্মপদ্ধতি কী রকম হবে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"১ যতদিন না শ্রমিক ও কৃষকগণের অধিকার সমূহ স্বীকার করিয়া শাসন-প্রণালী পরিবর্তন না হয়, ততদিন টাকা মঞ্জুরী বাজেটে না দেওয়া।

২ আমলাতন্ত্র শাসন-প্রণালীর শক্তিও প্রভাব বিস্তার করে এমন সমস্ত প্রস্তাবের বিরোধী হওয়া। ...”

আবার চরম দাবী হিসাবে ওই ইশ্‌তিহারে ঘোষিত হয়েছে ঃ

“১ আধুনিক কলকারখানা, খনি, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, ট্রামওয়ে, স্টিমার প্রভৃতি সাধারণের হিতকারী জিনিস লাভের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া দেশের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত কর্মীগণের তত্ত্বাবধানে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিচালিত হইবে।”

“২ ভূমির চরমস্বত্ব আত্ম-অভাব-পূরণ-সম স্বায়ত্ত-শাসন-বিশিষ্ট পল্লীতন্ত্রের উপর বর্তিবে এই পল্লীতন্ত্র ভদ্র-শূদ্র সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে।”

১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে এসব ভাবনা জন্মেছিল নজরুলের মধ্যে। জাতীয়করণ, পল্লীতন্ত্র যাই করা হোক না কেন “ভদ্র-শূদ্র সকল শ্রেণীর শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে” সেই তন্ত্র-পরিচালনার ক্ষমতা।

আয়ার্ল্যান্ডের কবি শেলী আইরিস জনগণের মুক্তির দাবিসনদ বা স্বাধীনতার ইশ্‌তিহার লিখেছিলেন বলে জানা যায়। বাঙলার কবি নজরুলও সে-রকমই রাজনৈতিক ইশ্‌তিহার লিখেছেন ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে। একজন কবির পক্ষে সমাজবিজ্ঞানের নিরিখে এটা কম গৌরবের কথা নয়। নজরুল নতুন যুগের নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য দল গঠন করেছিলেন। শ্রমিক ও কৃষকদের সংঘবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সেই রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা যে “শ্রমজীবীর হাতে থাকিবে” এটাই ছিল সেই দলের মূল লক্ষ্য।

'শত দলে মিলি শতদল' ও নজরুল প্রসঙ্গ

করুণাসিন্ধু দাস

১. ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ ?

সমাজসম্বন্ধ স্থাপনের সেতু হিসাবে ধর্মের কোন ভূমিকা আজ আর কি মানুষের প্রত্যাশা কিংবা আস্থা জাগায়? যে পরিবেশ, অর্থব্যবস্থা, জীবনযাপন রীতি ধর্মের হাত ধরে ভবিষ্যতের পথ অনুসন্ধান করে, বহুকাল হল সে পর্যায় অতিক্রম করেছি আমরা। ধর্ম নয়, অন্য কোন প্রাগ্রসর জীবনদর্শনই আজকের সভ্যতার 'পথের আলো'। তাই বলে ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস এবং সমাজ-বিকাশে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা অমান্য করা চলে না। পশ্চিম এশিয়ার খণ্ড বিচ্ছিন্ন উপজাতিবহুল পরিস্থিতিতে ইসলামের ঐক্যের বাণী কিংবা চণ্ড প্রভুশক্তির বিপরীতে খ্রীষ্টের করুণা ও প্রেমধর্ম, আচারসর্বস্ব জাঁকজমক, পশুঘাত ও যজ্ঞবিধির বিরুদ্ধে গৌতমবুদ্ধের সদাচার তত্ত্ব ও সব মানুষের অনন্ত সম্ভাবনার কথা ঘোষণা ইত্যাদি, এমনকি মাত্র উনিশ শতাব্দীতে ভারতে ব্রাহ্মধর্মের মননদীপ্তি, কুসংস্কার মুক্তির আহ্বানের গৌরবকে অস্বীকার করবে কে ? দুঃখের কথা, আবির্ভাব মুহূর্তের যে কোন প্রাগ্রসর তত্ত্ব বা প্রতিষ্ঠানকে আপন আপন কাজে লাগাবার তাগিদে স্বার্থান্ধ স্থূল হস্তাবলেপ এমনকি নির্লজ্জ দখলদারির পর্যায়ে পৌঁছাতে পর্যন্ত লজ্জা পায় না। যার অনিবার্য ফল ভাল্‌গারাইজেশন। সমাজবিধির প্রত্যাশিত সেতুও যে এইভাবে মানুষে মানুষে অলক্ষ্য পাঁচিল হয়ে দাঁড়ায়, তা তো আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা। আর, পরধর্মো ভয়াবহঃ ঘোষণা করে হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সদলে নেমে পড়লে তো কথাই নাই। 'ধর্মের বেশে মোহ এসে যারে ধরে / অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে / পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা / দেবতার নামে এযে শয়তান-ভজা।' বড় আক্ষেপে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'মোহমুগ্ধ ধর্মবিভীষিকার চেয়ে ঘোর নাস্তিকতা ঢের ভালো', বড় দুঃখে, বেদনায় নজরুলকেও বলতে হয় 'হায়রে ভজনালয় / তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়।' গত কয়েক শতাব্দীতে বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতির প্রদীপের নীচে অন্ধকারে, কূপমণ্ডূক সংকীর্ণতায় ঘুরপাক খেতে খেতে আত্মহননের নিশির ডাক উত্তরোত্তর প্রকট শুনতে শুনতে মানুষের গৌরবদীপ্ত সভ্যতার কথা কি আমরা ভুলে যাচ্ছি? ঠিক এই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের, নজরুলের চর্চা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে ইতিহাসের সদর্থক শিক্ষায় আলোকিত হওয়া ছাড়া আমাদের মহতী বিনষ্টি অনিবার্য।

এঁরা কেউ নাস্তিক ছিলেন না, ঈশ্বরবিদ্বেষীও নয়। মানুষের হাতে মানুষের অমর্যাদায় ঈশ্বরের কাছে আর্ত ব্যাকুল 'প্রশ্ন' কিংবা 'ফরিয়াদ' তারই সাক্ষ্য দেবে। 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো / তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ

তুমি কি বেসেছ ভালো?' 'সাদা রবে সবাকার টুটি টিপে এ নহে তব বিধান।' সংঘাত নয় সমন্বয়, বিচ্ছেদ নয় সংহতির তত্ত্বই নিপীড়িত মানবমুক্তির পথ, সে কথা তো তাঁরা বলবেনই। বিশেষত একই দেশের জল, হাওয়া, ফুল, ফল, ইতিহাস-ঐতিহ্যের যৌথ উত্তরাধিকার যে কতবড় ঐক্যসূত্র, তা তো বলার অপেক্ষা রাখে না। 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম' কিংবা 'একই আকাশ মায়ের কোলে রবি শশী'র সোদর্যস্নেহের সার্থক উপমায় একথা নজরুল আমাদের বুঝিয়ে দেন মর্মস্পর্শী আবেগে। আমিনা মায়ের কোলের শিশু আর যশোদা-দুলাল এই দৃষ্টিতে একাকার। 'মায়া তরুর বাঁধন টুটে' ফুটন্ত জবাকুসুম যেখানে শ্যামা মাতৃমূর্তির পদানত হয়, কিংবা ঘনশ্যামসন্ধানী কবির প্রশ্নে মৌনমূক নীল যমুনার জল শোকোচ্ছল হয়ে ওঠে, খুশির ঈদের চাঁদ তারই আকাশের উদ্ভাস বৈকি। 'ভিন্ন ঘাট, এক জলাশয়' তত্ত্বের ঐতিহ্য এদেশে প্রাচীন। উপনিষদে-সুফিবাদে মেলবন্ধন ঘটিয়ে দারা শিকোহ্ নাহলে মাজ্‌মা-উল্‌-বাহ্‌রেইন বা দুই সমুদ্রের সঙ্গমে লিখবেন কেন? তাঁর যাবতীয় রচনার উৎস পবিত্র কুর্‌আন, একথা ঘোষণা করেও তিনি তাই বলতে পারেন এক ধর্মশাস্ত্র দিয়ে অন্য ধর্মশাস্ত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটনের যৌক্তিকতার কথা ঃ

'...the utterances of God elucidate and explain one another. It may be that in one place it is found in compendium, while in others, it may be given in detail, and as such, the compendium may be understood by the help of the detailed.'

দারার দৃষ্টিতে উপনিষদ্ 'the first heavenly book and the fountain head of the ocean of monotheism' একে কুব্-আন-সম্মত এমনকি কুর্-আন-এর বিবৃতি গণ্য করতে চান তিনি। '...as Upanishat is a hidden secret ... and the actual verses of the Kurân can be found in it, it is certain that the hidden book (or Kitab-i-maknun) is a reference to this ancient book.' সংকীর্ণ ধর্ম ব্যবসায়ীর কুৎসিত বিভেদপন্থার বিরুদ্ধে এই শাণিত প্রতিবাদের ভাষা রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলের রচনায় শতধারায় উৎসারিত হতে দেখা যায়।

২. 'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ'

বস্তুত মিশ্র সংস্কৃতির দেশ ভারতবর্ষ মানুষের প্রকৃত মর্যাদা ঘোষণায় জাত-পাত-ধর্মের খণ্ডিত অস্তিত্বকে কদাচ উচ্চমূল্য দেয় নি। উপনিষদের জবালানন্দন সত্যকাম তো সত্যনিষ্ঠার জোরেই 'দ্বিজোত্তম' 'সত্যকুলজাত' বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে ভারতবাসী মাত্রই 'ভারতী' নামে পরিচিত। আর্য, দ্রাবিড়, কিরাত, নিষাদ, শক, পুলিন্দ, ওড্র, চীন, দরদ ইত্যাদি নানা ভাষাভাষী নানা আচারবিচারের জনগোষ্ঠীগুলি সেই মনুসংহিতার যুগ থেকে একই সমাজছত্রের তলায় সহাবস্থান করছে। তাদের পারস্পরিক মেলামেশা, লেনদেন জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে যে সামাজিক ঐকতান রচনা করেছে বহু শতাব্দী জুড়ে, পরবর্তী যুগে ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্ম এসে তাতে আরও নতুন মাত্রা

যোগ করেছে এখানে। 'শক হূন দল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন' কথাটা নিতান্ত কবির বাণী নয়, এ ঐতিহাসিক সত্য। 'আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তার বিচিত্র সুর'—এ সত্যদর্শন ভারত ইতিহাসের মহাভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাই সম্ভব। 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধে (১৯০৫) তাঁর স্পষ্ট নির্ণয় 'পৃথিবীতে যে চারি প্রধান ধর্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎ সমাজ আছে—হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান তাহা সকলেই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিয়াছে। বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সম্মেলনের জন্য ভারতবর্ষেই একটা বড়ো রাসায়নিক ঘর খুলিয়াছেন।' আরও বলেছেন তিনি 'কোন সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না ...হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পরস্পর লড়াই করিয়া মরিবে না এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাইবে।' 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৪০৬) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আবার বললেন, 'ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।' এই সম্মেলক সমাজ-সংস্কৃতির পরিবেশ যত মত তত পথের একই অভ্রান্ত লক্ষ্য নির্দেশ করে বলতে শেখায় একো গম্যস্ত্বমসি পয়সাম্ অর্ণব ইব। সব নদীর একই লক্ষ্য সমুদ্র। এই উদার দর্শনই জাতপাত ধর্মনিরপেক্ষভাবে মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় আস্থাশীল হয়ে বলে 'শুনহ মানুষ ভাই / সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। মহাভারতের বাণী 'ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ' উত্তরকালের কবির কণ্ঠে নতুন মাত্রায় বুঝি ফিরে ফিরে আসছে এভাবে। কবি-দার্শনিকেরাই তো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। এবং ক্রান্তদর্শী ভবিষ্যতের দিশারী।

"যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান। ...
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ নিজ প্রাণ, ...
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো আর মন্দির কাবা নাই।"

(সাম্যব্যদী)

বিশ্বতোমুখ প্রবুদ্ধ চেতনায় উত্তীর্ণ কবি নজরুল এমনই সাবলীলভাবে মানুষের মহিমায় শ্রদ্ধাশীল হতে শেখান আমাদের সেই ঐতিহ্যের গৌরবে। অসুন্দরের বিরুদ্ধে ক্রোধ আর সুন্দরের বন্দনায় তন্ময় নিষ্ঠা তাঁর ক্ষেত্রে এই জন্য এত আন্তরিক। বিভিন্ন ধর্মভাবনার সদর্থক তত্ত্বগুলি তাই তাঁর এত আপনার।

'ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ দুঃখ সম ভাগ করে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের।

কারো আঁখি জলে কারো ঝারে কিরে জ্বলিবে দীপ।
দুজনার হবে বুলন্দ্-নসীব, লাখে লাখে হবে বদ-নসীব?

(ঈদ মোবারক)

ইসলামের এই সমদৃষ্টির আহ্বানে আমাদের মনে পড়বে সেই বেদমন্ত্রের কথা, যেখানে সকলের জন্য সমান পানপাত্র, সমান অন্নভাগ, সমান হৃদয়, সমান আকৃতি, সংঘবদ্ধ উচ্চারণ ও যৌথ অভিযাত্রার আকাঙ্ক্ষা প্রকট হয়েছিল (সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্...) এবং আরও স্পষ্টভাষায় উচ্চারিত পুরাণের বচন যাবদ্ ভ্রিয়েত জঠরং তাবদন্নং হি দেহিনাম্। অধিকং যোভিমন্যেত স স্তেনো দণ্ডমর্হতি। জঠরপূর্তির জন্য যেটুকু দরকার, তাতেই মানুষের ন্যায্য অধিকার। তার বেশি হস্তগত করা চুরির সামিল, যা দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

মোটামুটি ৫৪১টি ভক্তিগীতি ও ১৯৪টি ইসলামী গানে অনুপম কাব্যভাষায় প্রাচীন-নবীন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নানা ধর্মমতের বিশ্বজনীন ভাবপরিমণ্ডল বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত করেছেন নজরুল। বিশ্বপ্রকৃতি আর মানুষের সম্বন্ধই তার মূল কথা। সুনীল আকাশে, নীল যমুনার জলে, সূর্য-গ্রহ-চাঁদ-সিতারায় বিশ্বনবী, কৃষ্ণ ঘনশ্যাম, শিব কিংবা মাতৃমূর্তি কল্পনায় তিনি অকুণ্ঠ, ঠিক যেমন যা কিছু সুন্দর দিয়ে প্রেমিকার রূপকল্পনায় তাঁকে বিভোর হতে দেখি। সিন্ধু নদীতে ভেসে আসা 'ইরানী গুলিস্তান' নুরজাহানের স্তবগীতিতে হোক কিংবা মমতাজের প্রেমমূর্তির বন্দনায় হোক, ফেরদৌসীর একমুঠো প্রেম এবং বৃন্দাবনের একমুঠো প্রেম একাকার, ঠিক যেমন ব্রজের রাখাল আর আরবের মেষপালক নবী, কিংবা যশোদাদুলাল আর আমিনা-দুলাল অভিন্ন রূপকল্প হয়ে যায় তাঁর মনোভূমিতে। তিনিই বলতে পারেন—

"তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার। ...
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধগয়া এ, জেরুজালেম এ, মদীনা, কাবা-ভবন,
মসজিদ এই, মন্দির এই, গীর্জা এই হৃদয়—" (সাম্যবাদী)

ঈসা মুসার সত্যদর্শন, কৃষ্ণের গীতা-উপদেশ, বুদ্ধের বোধিলাভ, মোহাম্মদের কোরানের সাম-গান একই বিশ্বজনীন হৃদয় বৃত্তির উৎসার মনে হয় তাঁর। সুতরাং সব সংস্কৃতির সম্পদের উত্তরাধিকারে আমাদের গর্বিত হতে শেখান নজরুল—

'আদম দাউদ ঈসা মুসা ইব্রাহিম মোহাম্মদ
কৃষ্ণ বুদ্ধ নানক কবির-বিশ্বের সম্পদ,
আমাদেরই এঁরা পিতা-পিতামহ, এই আমাদের মাঝে
তাঁদেরই রক্ত কম-বেশী করে প্রতি ধমনীতে রাজে।
আমরা তাঁদেরই সন্তান, জ্ঞাতি—' (সাম্যবাদী)

বস্তুত, 'নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,

সবদেশে সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।'

কেননা 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে, কিছু মহীয়ান্।'

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই উদার মনুষ্যত্বের মহিমা বাস্তব সত্য হয়ে উঠেছে ঘটনা পরিস্থিতির অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়ায়—

"সকল জাতি সকল ধর্ম পেয়েছে এখানে ঠাঁই
এসেছিল যারা শত্রুর রূপে, আজ সে স্বজন তাই।
বিদেশীর বেশে আসিল যাহারা
মার কোলে আজ সন্তান তারা
তাই মার কোল নিয়ে করি কাড়াকাড়ি হিন্দু মুসলমান
জৈন পার্শী বৌদ্ধ শাক্ত খ্রীষ্টান বৈষ্ণব
মার মমতার ভুলিয়া বিরোধ এক হয়ে গেছে সব।
ভুলি বিভিন্ন ভাষা আর বেশ
গাহিছে সকলে আমার স্বদেশ।
শত দলে মিলি শতদল হয়ে করিছে অর্ঘ্যদান।"

ভারতে হিন্দু মুসলমানের 'একই বৃন্তে দুটি কুসুম'-এর মতো অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তায় নিবিড় 'এক সে আকাশ মায়ের কোলে যেন রবি শশী দোলে'। সারা দেশ, সারা জাতি এই ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ না হলে যে মহতী বিনষ্টি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নজরুল বুঝেছিলেন 'ভিন্ন হইয়া থাকি ঠাঁই ঠাঁই তাই মোরা পরাধীন'। ভেদপন্থাকে ধিক্কার দিয়ে তিনি তো বলবেনই ঃ

"দিন কানা সব দেখতে পাস নে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে
কেমন করে পিষছে তোদের পিশাচজাতের জাঁতাকলে।"

সুতরাং অনৈক্য আর বিভেদের বিরুদ্ধে সংঘশক্তির জয়গান করেছেন নজরুল

"সংঘশক্তি আসিলে সর্ব ক্লৈব্য হইবে লীন ...
মোরা সংঘবদ্ধ হই যদি একবার
জাতি ও ধর্ম ভেদ রবে নাকো আর
পাবো সাম্য, শান্তি, অন্ন, বস্ত্র, অস্ত্র, পুনঃ সবাই।"

কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। মানুষকে সত্য ও সুন্দরের অভীপ্সিত চেতনায় সংস্কৃতিমান্ করে তোলার, মানুষে মানুষে প্রীতির সেতুবন্ধন নির্মাণের বাস্তব দায়িত্ব ধর্মতন্ত্র নিতে পারে কই। ভাবুক কবি কল্পনায়, দার্শনিক প্রতীতি যেমনই প্রতিভাত হোক না, ধর্ম, ধর্মতন্ত্র ও শাস্ত্র, আচার-সংস্কারের অর্থহীন অনুবর্তে সায় দিয়ে প্রভুশক্তির হাতিয়ার হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অন্ধ আনুগত্য এবং নিষ্ঠুরভাবে তাদের শোষিত এবং উৎপীড়িত হওয়ার পরিস্থিতিতেও নিরীহ সম্মতি আদায় করতে থাকে। প্রকৃতিকে বুঝবার আদিম উদ্যোগ প্রকরণ থেকে উদ্ভূত হয়ে বহু বহু যুগ আগে ধর্ম তো পরশ্রমজীবী সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর হাতে বশীকরণবিদ্যায় পরিণত। অতএব জাতপাত,

স্ত্রী-পুরুষ, খাটো-বড়োর হাজারো অতল-বিতল-সুতল বানিয়ে নরক গুলজার করে বসে আছে আত্মকলহে বিদীর্ণ, শতধাবিভক্ত সংকীর্ণমনা, বিচ্ছিন্ন, আত্মবিস্মৃত মানুষ আর তাদের মাথায় বসে আশ্চর্য, আপাত নির্বিকার ধর্মশাস্ত্রী-মোল্লা-পুরুত-রাজপুরুষ-নেপোর দল দই খেয়ে যাচ্ছে ধর্মসংস্থাপনের তাগিদে! মনুষ্যত্বচর্চার সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াগুলি সেই কবে থেকেই এসব কূটসংসর্গ ছেড়ে নন্দনশিল্পের নানা সুকুমার আঙ্গিক আশ্রয় করে বিকশিত হয়ে চলেছে। ধর্মস্থানে নয়, ধর্মশাস্ত্রীর শাস্ত্রব্যাখ্যায় নয়, কবি নজরুল সভ্যতার অগ্রগামী ইতিহাসের শিক্ষায় সুসংস্কৃত মানুষের প্রবুদ্ধ হৃদয়বৃত্তির উৎসারিত আবেগের পথে প্রেম ও ধর্মের প্রতীক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্লীন সুষমা-গৌরব অনুভব ও প্রকাশ করেছেন। কূপমণ্ডূক ধর্মীয় গোষ্ঠীভাবনার তুচ্ছ মানযন্ত্রে তাঁর বিশ্বতোভদ্র মানবধর্মসার পরিমাপ হাস্যকর পণ্ডশ্রম ছাড়া কি ?

৩. 'দাও পাজিটার জাত মেরে'

স্ত্রী-পুরুষ, কালো-ধলো, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান সকলের সমানাধিকারের কথা বললে যাদের বাড়তি সুবিধায় টান পড়ার কথা, নজরুলের প্রতি তাদের খড়্গহস্ত না হয়ে জো নাই। ধর্মনীতির স্বার্থপর অপব্যাখ্যানে যার লাভের কড়ি বাড়ার কথা, সে চোরা কেন উদার ধর্মের কাহিনী শুনে লোকসান খাবে? ধর্মীয় মৌলবাদী আর ধর্মব্যবসায়ীদের দল আঁতে ঘা লাগামাত্র লেখা পাঠ ছেড়ে নজরুলের বিরুদ্ধে লম্ফ দিয়ে হা রে রে রে ডাক ছাড়বে, তাতে আশ্চর্য কিছু নাই। মৌলবী-মোল্লারা যদি অভিযোগ তোলে 'দেব দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জাত মেরে', তো উগ্র হিন্দুরা ভাবে, 'ফার্সী শব্দে কবিতা লেখে ও পাত নেড়ে'! এ তো মাত্র অন্ধের অজ্ঞতাপ্রসূত অসম্পূর্ণ হস্তিদর্শন নয়, ক্ষেত্রবিশেষে জ্ঞানপাপীর অসূয়াপ্রসূত মিথ্যা কুৎসাচার! ধর্মের নামে বিভেদ বিচ্ছেদ হানাহানি, জাতের নামে বজ্জাতির পিঠে নির্মম কশাঘাত হানতে নজরুলের হাত কাঁপেনি বলেই এত ক্রোধ তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কেউ দীর্ঘকাল পুষে রেখেছিল! নামাজ পড়ে না বলে যে ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক অন্নভাণ্ডারের দরজায় মোল্লার ধমকের তাড়া খেয়ে ফিরে যায়, চণ্ডাল বদনামে যে মানুষটি বর্ণহিন্দুর ঘৃণা অপমানে জর্জরিত, বারাঙ্গনা অপবাদে যে মা ও তাঁর সন্তান সামাজিক প্রত্যাখ্যানের শিকার, নারী বলে যে স্ত্রীজাতিকে পুরুষের যদৃচ্ছ প্রভুত্ব মেনে আত্মগ্লানিতে নতশির হতে হয়, মাটি কাদা মাখা যে কুলিমজুর চাষী অসম্মানে নীচে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়, নজরুল তাদের চোখের জল মুছে মানুষের মহত্তম মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে চান আর ঘৃণার আগুনে দগ্ধ করেন ধর্মমূঢ়, শুচিবাইগ্রস্ত, সুবিধাভোগী মানুষের হৃদয়হীন শুষ্ক অভিজাতম্মন্যতাকে। বাস্তবকে অস্বীকার করে নভশ্চরণ কাজের কথা নয়। বাস্তবদৃষ্টিতে যিনি বোঝেন 'যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয় / ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়' (সাম্যবাদী), মানুষের হাতে মানুষের দৈহিক-মানসিক পীড়ন তিনি সইবেন কেন?

মানুষের স্বার্থে তাঁকে বলতেই হয়—

"তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবী।
মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবী। ...
ভেঙে ফেল ঐ ভজনালয়ের যত তালা-দেওয়া দ্বার।
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা!
... চালা হাতুড়ি শাবল চালা।
হায়রে ভজনালয়,
তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়।
মানুষেরে ঘৃণা করি,
ও কারা কোরাণ, বেদ, বাইবেল, চুম্বিছে মরি মরি।
ও মুখ হইতে গ্রন্থ-কেতাব নাও জোর ক'রে কেড়ে।
... মূর্খরা সব, শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।"

(সাম্যবাদী)

অতএব শাস্ত্রাচারের পাঁচিল ভেঙে হৃদয় উন্মুক্ত করার মহোত্তম মুক্তির ডাক শুনি তাঁর কথায়—

"আকাশের আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,
মাতামাতি ক'রে ঢুকুক এ বুকে, খুলে দাও যত খিল!
সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে,
মোদের মাথায় চন্দ্র সূর্য তারারা পড়ুক ঝরে"

যেখানে "একজনে দিলে ব্যথা—
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।
একের অসম্মান
নিখিল মানবজাতির লজ্জা-সকলের অপমান।"

(সাম্যবাদী)

অপমানিত বঞ্চিতের সপক্ষে নজরুল সাহিত্য মানবাত্মার বিবেকী প্রতিবাদ, স্বার্থান্ধ ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধিক্কার ও বিনিপাত ঘোষণা। 'মনুষ্যত্ব থাকিলে মানুষ সর্বশক্তিমান' এই গভীর আস্থাই কবিকে অনৈক্য ও ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে মুখর করেছে। যে আসুরী শক্তির কদর্য তাড়নায়,

"ইহারা কলির নব ফেরাউন ভেল্কি খেলায় হাড়ে,
মানুষে ইহারা না মেরে প্রথমে মনুষ্যত্ব মারে।"

(চিরঞ্জীব জগলুল)

কোথাও 'জাতের নামে বজ্জাতি' আর জালিয়াতির জুয়ায় মাতে, কিংবা 'শাস্ত্র ছাঁকিয়া নিজেদের মত সুবিধা বাছাই করে / নারীদের বেলা গুম হয়ে রয় গুমরাহ্ যত চোরে'

('মিসেস এন. রহ্‌মান), আনন্দের সঙ্গে নজরুল দেখেছেন সেসব অপশক্তির বিরুদ্ধে জাগ্রত মানুষের সংগ্রামী মুষ্টিবদ্ধ হাত। বস্তুত,'মানুষ থাকে না খোঁয়াড়ে বন্ধ, থাকে বটে গরু ভেড়া।' (মিসেস এন. রহমান)। জাতপাতের পাঁতিওলাদের কাছে নজরুলের ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসা—

"বলতে পারিস বিশ্বপিতা ভগবানের কোন সে জাত ?
কোন ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁওয়া অশুচি হন জগন্নাথ ?"

এবং মন্তব্য ... "বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশ' খান ! ...
ওরে মূর্খ, ওরে জড়, শাস্ত্র চেয়ে সত্য বড়,
মায়ের ছেলে সবাই সমান, তাঁর কাছে নাই আত্মপর।"

নারী সমাজের অমর্যাদা ঘটাতে পুরুষশাসিত সব সাবেকি সমাজব্যবস্থার অত্যুৎসাহ যে কোন বিবেকবান মানুষের মতো নজরুলকে ক্ষুব্ধ, বিরক্ত করেছিল। 'নরকের দ্বার' তকমা সেঁটে নারীর ওপর যাবতীয় ঘৃণ্য উৎপীড়নে পুরুষ দেবশিশু ধোয়া তুলসীপাতাদের জুড়ি নাই। এ লজ্জা আমরা কোথায় রাখব ?

"আপনা ভুলিয়া বিশ্বপালিকা নিত্যকালের নারী
করিছে পুরুষ জেল-দারোগার কামনার তাঁবেদারি।"

শাস্ত্রের উদার শিক্ষাটুকুও কটুব্যাখ্যানের অন্তরালে চাপা পড়ে গেছে।

"বলে না কোরান, বলে না হাদিস, ইসলামী ইতিহাস
নারী নর-দাসী, বন্দিনী রবে হেরেমেতে বারোমাস!"

ইসলামের দোহাই দিয়ে নারীর ওপর অশিক্ষা-অবরোধের বন্দীদশা আরোপ নজরুলের কথায় 'মুনাফেকদের চুরি / মসজিদে বসে স্বার্থের তরে ইসলামে হানা ছুরি'। 'কোরানের বাণী সমান নর ও নারী'—সর্বধর্মশাস্ত্রের আচার্য-শাস্ত্রীরা যদি সাদা চোখে এতবড় সহজ সত্যটা দেখতে পেতেন! সর্বোত্তম আস্তিকতায় নিষ্ণাত, অসামান্য ভক্তিসঙ্গীতকার মানুষের বিশ্বরূপদ্রষ্টা নজরুলকে কাফের, গাজি, পাত-নেড়ে, সাধারণ মাপের মুসলমান কবি ইত্যাদি চোখা চোখা অভিধায় চিহ্নিত করে গায়ের ঝাল মিটিয়ে আমরা সারস্বত পিতৃঋণ শোধ করার যোগ্য পথ নিয়েছি বটে!

"... গালাগালি আছে, তাই দিয়ে তারা লড়ে
বোঝেনাকো' থুতু উপরে ছুঁড়িলে আপনারি মুখে পড়ে।
... যত গালি ওরা ছুঁড়িয়া মেরেছে গায়ে,
ফুল হয়ে সব ফুটিয়া উঠিয়া ঝরিয়াছে তব পায়ে!"

(মিসেস এন. রহমান)

মনের শিকল ছিঁড়ে হাতের শিকলে পাছে টান পড়ে, কারার লৌহকপাট লোপাট করে রক্তাক্ত শিকল পূজার পাষাণ বেদিতে মুক্ত শাবল-হাতুড়ির ঐতিহাসিক কৃত্য ত্বরান্বিত হয়, পাছে দুঃস্থ মানবাত্মার কানে যায় "শিকল বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল / ... ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝঞ্ঝনা, / এ যে মুক্তি পথের অগ্রদূতের চরণ বন্দনা!"

সেজন্য নজরুলকে আড়াল করা, পারতপক্ষে খণ্ডিত করা কাদের যেন বড্ড প্রয়োজন এখন। ঠিক যেমন গুরুদেবের আলখাল্লায় মুড়ে নভশ্চর রবীন্দ্রমূর্তি হাজির করে তারা মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে চায় কবির আহ্বান—'যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে/ ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে/ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো/ এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।' (ধর্মমোহ)। অশিক্ষায় আকণ্ঠমজ্জিত মানুষের উদ্ধরণের আলো চাই। 'বসিবে কখন জ্ঞানের তখতে বাঙলার মুসলিম!' এ কোনো খণ্ডিত দৃষ্টি নয়, হতভাগ্য পশ্চাৎপদ মানুষের আলোকোজ্জ্বল উদার বিশ্বলোকে মাথা তুলে দাঁড়ানোর স্বপ্নদর্শন! অশিক্ষা-কুসংস্কারের বোঝায়, হতাশা-দারিদ্র্য-বঞ্চনায় ন্যুব্জদেহ যে মানুষ ডুবছে, এক শয়তান ছাড়া কে তার সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে 'হিন্দু না ওরা মুসলিম?'

মুক্তিপথের অগ্রনায়ক কি নজরুলের শিক্ষায় বলবেন না 'ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার'?

৪. 'শুন ধর্মের চাঁই'

কবি হিসাবে নজরুল কার থেকে ছোট কার থেকে বড় সে বিতণ্ডা তুলে আসল কথা চাপা দিলে চলবে না। তবু বলি, নজরুলের কবিকণ্ঠ আর আর সব কবির থেকে স্বতন্ত্র চেনা যায় না কি? মানুষের আনন্দ, বিষাদ, বিস্ময়, ক্ষোভ, লজ্জা, গর্বের কথা বলবার এমন লোকরঞ্জন স্বচ্ছন্দ মুক্ত বাগ্‌-ধারা কি ছেলের হাতের মোয়া? সাংস্কৃতিক সম্পদ প্রাকৃতিক সম্পদের মতোই সমগ্র মানবসমাজের যৌথ উত্তরাধিকার। আমাদের মনের বন্ধ জানালা দরজাগুলো হাট করে খুলে দিয়ে নজরুল আরব দুনিয়ার সভ্যতা সংস্কৃতির গুলিস্তানের সৌরভে ভারতবর্ষীয় নন্দনকাননে নতুন খুশির ঢেউ এনেছেন। তাঁর গানে কবিতায় সুরে কাব্যভাষায় অসংখ্য পুরাণকল্প উপস্থাপনায় এক আশ্চর্য সমন্বয়ী ভাবনার পরিব্যাপ্তি ক্রান্তপ্রাজ্ঞ বিশ্বনাগরিকের বাসভূমি রচনায় ব্যাপৃত। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ইতিহাস, পুরাণ, সাহিত্য এবং ইসলামী ও খ্রীষ্টান ইতিহাস-পুরাণের প্রসঙ্গ, চরিতকথা অর্জিত উপলব্ধি সেখানে একাসনে বিরাজমান। মহাপ্রলয়ের নটরাজ, নীলকণ্ঠ রুদ্রভৈরব, গঙ্গাধর শিব, নীপমালাভূষিত নটবর ব্রজগোপাল, সাগ্নিক জমদগ্নি, দ্বাদশ রবি, বাসুকির ফণা, ছিন্নমস্তা চণ্ডী, স্রষ্টামধুসূদন, বিদ্রোহী ভৃগু, বুদ্ধ, নানক, কবির, হলধর বলরাম, অগস্ত্য, কংস, অনাথপিণ্ডদ, দধীচি, ভীষ্ম, বন্দিনী সীতা, রাবণ, উমা, পার্বতী, পার্থ, পাঞ্চজন্য শঙ্খ, দময়ন্তী, শকুন্তলা, হরিশ্চন্দ্র, কল্কি, জনক, মন্দোদরী, অহল্যা, কর্ণ, রামচন্দ্র, লবকুশ, মা মেরী, আদম, দাউদ, ঈসা, মুসা, ইব্রাহিম, মোহাম্মদ, হারুত, মারুত, ফেরেস্তা, দোজখ, জাহান্নাম, ইস্রাফিল, জিব্রাইল, অর্ফিয়াস, আমিনা, ফতেমা, খালেদা, নূরজাহান, মমতাজমহল, শাতিল আরব, যমুনা, ওমর খৈয়াম, ইত্যাদি নাম ও তার ভাবপরিমণ্ডল এখন একান্ত আপন প্রতীকসিদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য হয়ে ব্যাপক এশিয়াখণ্ডের ভাবলোকে প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের মিশ্র জনসমাজের

নানা সংস্কৃতির সমন্বিত শতদল আর তার খুশবু প্রাণভরে আত্মীকরণ করেছিলেন নজরুল। পশ্চিম এশিয়ার সংস্কৃতি মাধুরী তাঁর হৃদয়পাত্রে উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠেছিল নতুন সৃষ্টিসুখের উল্লাসে। নজরুল সাগরোপম সমন্বয়ী ভারতসংস্কৃতির মহান ভাষ্যকার—তাঁর উদার বিস্তৃত হৃদয়পট যেন মাজ্‌মা-উল্‌-বাহ্‌রেইন অর্থাৎ দুই মহাসমুদ্রের মিলন। আকবর, দারাশিকোহ্‌, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য অভিনব মাত্রায় তাঁর মধ্যে বিকশিত হয়েছে। নিশ্চয় সাম্যবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের আজীবন প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে থাকলে তাঁর সারস্বত সৃষ্টির মধ্যে নতুনতর মাত্রা সংযোজিত হত। তা নিয়ে তর্ক এখন অবান্তর। অসংখ্য ধর্মীয় প্রসঙ্গপাতে, ইঙ্গিতে নজরুল-সাহিত্যের সেকুলার ভাবমূর্তি কতদূর ক্ষুণ্ণ হল সে তর্কও এখন থাক। ধর্মের প্রতীকে ধর্মের কনট্রাডিকসনগুলো তুলে ধরাও কম অগ্রণী পদক্ষেপ নয়। যদিচ নতুনতর বিভ্রান্তির শঙ্কা থেকে সর্বথা মুক্ত থাকাই বাঞ্ছনীয়। গানে, কবিতায়, গল্পে নজরুল মানুষের যে দেবাতিশায়ী উন্নতশিরকে সালাম জানিয়েছেন, তার বন্দনা করেছেন, সেই বিশ্বমানবতা আমাদের ভবিষ্যৎ। নজরুল চর্চা এইভাবে মুক্তিপথের অগ্রদূতের আবাহন হয়ে উঠতে পারে।

তথ্যসূত্র

১। সঞ্চিতা।

২। রবীন্দ্র রচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৩। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা।

৪। Majma-ul-Bahrain, Translated with Introduction by M. Mahfuz ul-Haq, Asiatic Society, Calcutta, Reprint, 1982.

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও নজরুল

রঞ্জনা সরকার

ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম ও সংকল্পের বাণী যিনি নির্ভীক চিত্তে প্রচার করেছিলেন তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। সাহিত্য-কর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস ছিল অনন্য। ধর্মভিত্তিক আপসমুখী রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে তিনি কিভাবে বাস্তব জীবনমুখী রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা আন্দোলন পর্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় সোচ্চারভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তা পর্যালোচনা করতে হলে তাঁর শৈশব, বিদ্যালয় জীবন, সৈন্যবাহিনীতে যোগদান ও তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উল্লেখ প্রয়োজন।

উনিশ শতকের শেষভাগে—১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামের এক দারিদ্র্য লাঞ্ছিত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা কাজী ফকির আহমদ এবং মাতা জাহেদা খাতুন। এই কাজী পরিবারের পূর্বপুরুষেরা বাদশাহী আমলে সম্রাট শাহ্আলমের সময় কাজী বা বিচারকের কাজ করতেন। সেই সময় থেকে নজরুল ইসলামের পূর্বপুরুষেরা কাজী পদবী ব্যবহার শুরু করেন। তবে এদেশে ইংরেজ শাসনের সূচনার সাথে সাথেই কাজীর বিচারের যুগ শেষ হয়ে যায়। তাই কাজী পরিবারের আর্থিক অবস্থারও অবনতি দেখা দেয়। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ চুরুলিয়া গ্রামেরই এক মসজিদে সামান্য পুরোহিতের কাজ করতেন। তাই বাল্যকাল থেকেই দুঃখ দারিদ্র্য তাঁর সঙ্গী। ১৯০৮ সালে (১৩১৪ বঙ্গাব্দ) যখন নজরুলের বয়স মাত্র আট বছর সেই সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ফলে বাল্যকাল থেকেই পিতৃহীন পরিবারের আর্থিক কষ্টের চাপ তাঁর উপরে এসে পড়ে। তবে অভাব জর্জরিত সংসারে নানারূপ বিড়ম্বনার মধ্যে দিয়ে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হলেও লেখাপড়ার দিকে আগ্রহের অভাব ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। পিতা কাজী ফকির আহমেদ ফারসি এবং বাংলা ভালই জানতেন। পিতৃব্য কাজী বজলে করিম ভাষাজ্ঞানী ও কবিত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর কাছেই নজরুল কবিতা রচনার প্রেরণা পান।

পিতৃহীন সংসারের অভাব-অনটনের মোকাবিলা করার জন্য তাঁকে বাল্যকাল থেকেই বিভিন্ন ধরনের কাজ করতে হয়েছে। অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে লেটোর দলে যোগদান ও সেই দলের জন্য গান রচনা করেন। এছাড়াও গ্রামের মসজিদে এমামতির

কাজ অর্থাৎ নামাজে নেতৃত্বদানের কাজ, মাত্র দশবছর বয়সে (১৯১০ সালে) গ্রামের মক্তবে শিক্ষকতার কাজ, রানীগঞ্জের একজন রেলের গার্ডসাহেবের বাড়ীতে বাবুর্চির কাজ, আসানসোলে এক রুটির দোকানে বেতনের বিনিময়ে কাজ—অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এরূপ বিভিন্ন ধরনের কাজ তাঁকে করতে হয়েছে। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁকে হতোদ্যম করতে পারে নি। নজরুল যখন আসানসোলে রুটির দোকানে কাজ করতেন তখন সেখানকার পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফীজুল্লাহ সাহেবের নজরে পড়ে যান। নজরুলের বুদ্ধিমত্তা, পড়াশুনা ও সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ দেখে তিনি নজরুলকে তাঁর বাড়ী ময়মনসিংহে নিয়ে যান এবং দরিরামপুর হাইস্কুলে ভর্তি করেন। কিন্তু সেই স্কুলে কয়েকমাস পড়ার পর জন্মস্থানের আকর্ষণে নজরুল সেখান থেকে ফিরে আসেন। ১৯১১ সালে নজরুল কিছুদিন বর্ধমান জেলার মাথরুণ হাইস্কুলে পড়েন। এই স্কুলের শিক্ষক কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল। এরপর ১৯১৫ সালে তিনি রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ স্কুলে ভর্তি হন। পড়াশুনায় ভাল থাকার জন্য বৃত্তি পান এবং বিনা বেতনে স্কুলে পড়ার ও বোর্ডিং-এ থাকা খাওয়ার সুযোগ পান। এই সময় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, যিনি পরে সাহিত্যিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। এসময় শিয়ারশোল রাজ স্কুলের শিক্ষক নিবারণ ঘটকের প্রভাবও তাঁর উপর বিশেষ ভাবে পড়েছিল। নিবারণ ঘটক ছিলেন বিপ্লবী যুগান্তর দলের সদস্য, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নজরুলকে সজাগ করেছিলেন। এই স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় হঠাৎ ১৯১৭ সালে তিনি ৪৯ নং বেঙ্গলি রেজিমেন্টে যোগ দেন। দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্নই সেদিন নজরুলকে তাড়িত করেছিল সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে। সুতরাং দেখা যায় মেধাবী ছাত্র হলেও তাঁর প্রথাগত শিক্ষার জীবন দীর্ঘ হয়নি। প্রকৃতপক্ষে নজরুলের এই ছাত্রজীবন ও পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও চিন্তাভাবনা সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

আজ থেকে একশ বছর পূর্বে পরাধীনতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষের অগ্নিযুগে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব। সেই সময়কার দেশীয় তথা আন্তর্জাতিক আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী তাঁর চিন্তন ও মননকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ঊনবিংশ শতকের শেষলগ্নে যখন নজরুল ইসলামের জন্ম, তখন ঔপনিবেশিক শক্তি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উভয় ক্ষেত্রের দিকে দিকে তার সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নির্লজ্জ থাবা বসিয়েছে। জাতীয় ক্ষেত্রে তখন এক অস্থির পরিবেশ। ভারতবর্ষে তখন একদিকে ধর্মীয় অনুশাসনে অনুশাসিত সামন্ততন্ত্র এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধিষ্ঠান। এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে পুঁজিবাদ। সমাজে দেখা দেয় নবজাগরণের বিকাশ এবং মানবতাবাদী চিন্তাভাবনার উন্মেষ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় অনুরূপ দৃশ্য। সামন্ততান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য দেশে দেখা দেয়

সর্বাত্মক বিপ্লব। তবে একসময় যে বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজের সামগ্রিক প্রগতির উদ্দেশ্যে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তথা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল তাদের চিন্তাভাবনার ধারা সর্বদা সমভাবে অগ্রসর হয়নি। পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে যে মানবতাবাদ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের কুসংস্কার, অধ্যাত্মবাদী চিন্তাভাবনা এবং ধর্মীয় ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠা করেছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার এবং যুক্তিবিজ্ঞান ও ইতিহাস ভিত্তিক চিন্তাদর্শের, পুঁজিবাদের সংকটের যুগে সেই মানবতাবাদ ক্ষয়িষ্ণু ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যেহেতু শ্রেণীশাসনকে ভিত্তি করে পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছিল, তাই একদিন এই পুঁজিবাদ সমাজবিকাশের ধারাকে অগ্রগতি দান করলেও পরবর্তী পর্যায়ে তাই হয়ে দাঁড়ায় সমাজবিকাশের বাধাস্বরূপ। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দেখা দেয় পার্থিব মানবতাবাদী আপসহীন সংগ্রামের পরিবর্তে অধ্যাত্মবাদ, ধর্মীয়-কুসংস্কার ও মূল্যবাধের সাথে আপস। এই প্রেক্ষাপটে উদ্ভব হয় মার্কসবাদী ও লেনিনবাদী দর্শনের যা পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আহ্বান আলোড়িত করল এদেশের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লড়াকু সৈনিকদের। এই পটভূমিতে নজরুলের আবির্ভাব এবং এই পরিবেশেই ঘটে তাঁর লেখনী শক্তির বিকাশ।

নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় তাঁর অবস্থান উপলব্ধি করতে হলে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের সাথে সাথে আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দিকে ফিরে তাকান দরকার। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে একদিকে দেখা যায় বিশ্বপুঁজিবাদ সংকটাপন্ন এবং অন্যদিকে মানবতাবাদ জরাগ্রস্ত। সে সময়ে এদেশে নবজাগরণের চিন্তাভাবনার মত রাজনৈতিক সংগ্রামেও দেখা দেয় দুটি ধারা। একদিকে রামমোহনের মানবতাবাদী চিন্তাভাবনা যা এ দেশে নবজাগরণের সূচনা করেছিল তা ছিল মূলত ধর্মভিত্তিক, আবার অন্যদিকে ধর্ম ও অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর যে মানবতাবাদের সূচনা করেন তা ছিল ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত আপসহীন যৌবনোদ্দীপ্ত পার্থিব মানবতাবাদ। রাজনৈতিক সংগ্রামেও একটি ধারা ছিল ধর্মীয় অধ্যাত্মবাদ, সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসকামী, সংস্কারপন্থী ; মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল এর দ্বারা প্রভাবিত এবং অন্যটি মানবতাবাদী সংগ্রামী মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত, আপসহীন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানবতাবাদী আপসহীন বিপ্লবাত্মক সুর যাদের মধ্যে দিয়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল তাঁরা হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং, বিনয়-বাদল-দীনেশ এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন ঘটেছে শরৎচন্দ্র ও নজরুলে। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে আপসহীন সংগ্রামী মানবতাবাদী চিন্তাধারার শেষ প্রতিনিধি হিসাবে কাজী নজরুলকেই

চিহ্নিত করা যায়।

পুরাতনকে ভেঙে ফেলে নতুন সৃষ্টির কাজে নজরুলের প্রয়াস ছিল অক্লান্ত। পরাধীনতার অভিশাপ কাটিয়ে দেশের মানুষ যাতে নতুন স্বাধীন জীবনে প্রবেশ করতে পারে, সেজন্য বারে বারেই তাঁর লেখনী হয়ে উঠেছে চঞ্চল। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের জীবনে স্বাধীনতা যে মহামূল্যবান সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু ব্রিটিশ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে এমন এক শ্রেণীর দেশীয় নাগরিক ছিলেন যাদের মধ্যে ছিল ইংরেজের গোলামী ও তোষণ করার মানসিকতা। এই দাসত্ব নজরুল অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং যার বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক ভাষায় তিনি লেখেন—"দাসত্ব গোলামী ছাড়িয়া দিলে খাইব কি করিয়া—কি নীচ প্রশ্ন? যেন আমাদের শুধু কুকুর বেড়ালের মতো উদর পূর্তির জন্যই জন্ম। অনেকে আবার বলেন যে, অন্যে কে কি করিতেছে আগে দেখাও, তাহার পর বলিও। এসব ফাঁকিবাজীর প্রশ্ন দেশমাতা সকলকে আহ্বান করিয়াছেন। যার বিবেক আছে, কর্তব্যজ্ঞান আছে, মনুষ্যত্ব আছে সে বুক বাড়াইয়া যাইবে।"

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নজরুল ছিলেন আপসহীন, যা তাঁর লেখায় প্রকাশ পায়—"বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরই অভিযানে সেনাদলের তূর্যবাদকের একজন আমি। আমি জানি এই পদযাত্রার পাকে পাকে বাঁকে বাঁকে কুটিল ফণা ভুজঙ্গে, প্রখর দর্শন শার্দুল। পশুরাজের ভ্রূকুটি এবং নখর দংশন-এর ক্ষত আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবুও ওই আমার পথ। ওই আমার গতি।"

স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশবাসীকে উজ্জীবিত করতে এবং দেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ, কাব্যগ্রন্থ এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে সোচ্চার হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশবাসীকে উজ্জীবিত করতে তাঁর লেখনী যতটা সরব ও সফল, তাঁর পূর্বে ব্রিটিশ শোষণ সম্পর্কে দেশবাসীকে সজাগ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশবাসীকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। সাহিত্য ক্ষেত্রে নজরুলের আবির্ভাবের পূর্বে যদিও সিপাহী বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহের মত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল তথাপি সাহিত্য ক্ষেত্রে এ ধরনের ধারা বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। ১৯১৪ সালে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ভারতের জনগণ সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসক ইংরেজদেরই সমর্থন করেছিল, তাদের আশা ছিল ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে যুদ্ধশেষে তারা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে ভারতে সৈনিক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং বাঙালী যুবকদের আকৃষ্ট করার জন্য গঠিত হয় ৪৯ নং বেঙ্গল রেজিমেন্ট বা বাঙালী পল্টন। অন্যান্য অনেক বাঙালী যুবকের ন্যায় নজরুল সেদিন বিদ্যালয় পাঠের অবসান ঘটিয়ে বাঙালী পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন এবং ১৯১৭ সালে সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর কথা থেকে জানা যায় স্বাধীনতা

সংগ্রামে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যেই তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। নজরুলের সতীর্থ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকেও একথা জানা যায়। "অস্ত্রশস্ত্র চালনা না শিখলে ইংরেজকে তাড়ানো যাবে না। অতএব ইংরেজের সৈন্যদলে ঢুকে সবকিছু উত্তমরূপে শিখে, দেশের তরুণদের শিখিয়ে ইংরেজদের ঘা দিতে হবে।"

সেনানিবাসে থাকাকালীন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সাথে নজরুলের পরিচয় ঘটে, যা তাঁর চিন্তাভাবনাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। সেই সময় সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় বিপ্লব ও লালফৌজের বীরত্বপূর্ণ অভিযান তাঁকে যেমন প্রভাবিত করেছিল, তেমনি নভেম্বর বিপ্লবের উদ্দেশ্য, বিপ্লবোত্তর কৃষি ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ঘোষণাপত্রের কথাও তিনি সেই সময় জানতে পারেন। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ, বিপ্লবের তাৎপর্য এবং কমিউনিজম্ বিষয়েও তাঁর জ্ঞান লাভ ঘটে। ১৯১৭ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা ও লালফৌজের জয় তাঁকে আলোড়িত করেছিল। সৈন্যদলে যোগদান ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী তাঁকে সশস্ত্র আন্দোলনে আগ্রহী করে তুলেছিল। তবে ছোটবেলা থেকেই অস্ত্রের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। তিনি ব্রিটিশ শাসকদের নিশানা হিসাবে স্থির করে লক্ষ্যভেদে সচেষ্ট হতেন এবং সেই ছিল তার আনন্দ, এছাড়াও প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের 'কাজী নজরুল' বইটি থেকে জানা যায় যে তিনি সম্ভবত আরেকজনের কাছ থেকেও অস্ত্রের প্রতি আগ্রহের প্রেরণা পেয়েছিলেন—তাঁর নাম বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী। তবে রাষ্ট্রীয় ধ্যানধারণায় নজরুলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে কামাল পাশার নেতৃত্ব। কামাল পাশা শুধুমাত্র সামন্ততান্ত্রিক খলিফা ও তুরস্কের সুলতানকেই উচ্ছেদ করেন নি, তিনি তুরস্কের সমাজজীবন থেকে উচ্ছেদ করেছিলেন মৌলবাদী গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতাকে। এই বিষয়টি নজরুলকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল। কামাল পাশার নেতৃত্ব ও আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হন। 'কামাল পাশা' কবিতাটির মধ্যে দিয়ে তাঁর এই চিন্তাভাবনা প্রকাশিত হয়। এই কবিতার বিভিন্ন ছত্রে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্রতি তাঁর আপসহীন মনোভাবের কথাও ধরা পড়ে—

"পরের মুলুক লুট করে খায় ডাকাত তারা ডাকাত
তাই তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত"

(কামাল পাশা ঃ অগ্নিবীণা)

যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভের প্রত্যাশায় ভারতবাসী প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিল যুদ্ধশেষের অনতিবিলম্বেই তারা আশাহত হয় কারণ বাস্তবে ব্রিটিশ সরকার প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে দেওয়া তার কোন প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করেন নি। এর পরিবর্তে তারা ভারতবাসীকে উপহার দেন কুখ্যাত রাওলাট আইন (১৯১৯)—যার মাধ্যমে তারা দেশব্যাপী ত্রাসের শাসন শুরু করেন। এসব কিছুর প্রভাবই নজরুলের তরুণ মনের উপর পড়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নজরুল ১৯১৭ সালে

থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত করাচির সেনানিবাসে ছিলেন এবং ১৯১৭ সালে তিনি যখন সৈন্যদলে যোগ দেন সেই সময়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপটি ছিল ভিন্ন। সেই সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের মঞ্চে গান্ধীজি বা কমিউনিস্ট নেতাদের আবির্ভাব ঘটে নি। বরং সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবীরা বাংলা তথা ভারতের কোন কোন অংশে তাদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ড শুরু করেছেন। যুদ্ধের সুযোগে দেশে স্বাধীনতা আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এই সময় গড়ে উঠেছিল 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স কমিটি' যার নেতৃত্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কাবুলে গড়ে উঠেছিল 'প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়া'। এছাড়াও নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রমুখ বাংলার বিপ্লবীদের কার্যকলাপ, বুড়িবালামের তীরের যুদ্ধ প্রভৃতি নজরুলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সেনাব্যারাকে থাকাকালীন রুশবিপ্লবের ঘটনাও তাঁকে আলোড়িত করেছিল। ১৯১৯ সালে ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড এবং প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগের মত দেশপ্রেমের ঘটনা। এসব কিছুই কাজী নজরুলের তরুণ মনকে করে তোলে বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী। সেনা নিবাসে থাকার সময় তিনি লেখেন 'হেনা' এবং 'ব্যথার দান' নামে দুটি গল্প। এই গল্পদুটি যথাক্রমে ১৯১৯ সালের নভেম্বর এবং ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'তে প্রকাশিত হয়। বাহ্যিক আঙ্গিকের দিক থেকে এ দুটিকে প্রেমের গল্প মনে হলেও এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে দেশপ্রেম এবং আন্তর্জাতিকতাবাদ। 'হেনা' গল্পটিতে হেনার যে দেশপ্রেম তা লেখক গল্পটির অন্যতম চরিত্র সোহ্‌রাব-এর মুখ দিয়ে বসিয়েছেন—'আমি বললুম—"হেনা, আমীরের হয়ে যুদ্ধে যাচ্ছি। আর আসব না। বাঁচলেও আসব না।"

সে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে—"সোহ্‌রাব প্রিয়তম! তাই যাও। আজ যে আমার বলবার সময় হয়েছে। তোমায় কত ভালবাসি। আজ আর আমার অন্তরের সত্যিকে মিথ্যা দিয়ে ঢেকে 'আশেক'কে কষ্ট দেব না।"...

আমি বুঝলুম সে বীরাঙ্গনা আফগানের মেয়ে। যদিও আফগান হলেও আমি শুধু পরদেশীর জীবনযাপন করেই বেড়িয়েছি, তবু এখন নিজের দেশের পায়ে আমার জীবনটা উৎসর্গ করি, এই সে চাচ্ছিল।'[১] আবার অপর গল্প 'ব্যথার দান'-এ লেখক 'সয়ফল মুলুকে'র মুখ দিয়ে যে কথা বলিয়েছেন তার মধ্যে দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রকাশ ঘটেছে—"যা ভাবলুম, তা আর হল কই। ঘুরতে ঘুরতে শেষে এই মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিলুম। এ পরদেশীকে তাদের দলে আসতে দেখে এই সৈন্যদল খুব উৎফুল্ল হয়েছে। এরা মনে করছে এদের মহান নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে অন্তরে শক্তি সঞ্চয় করছে। আমায় আদর করে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে যে, কত মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আমিও সেই মহান ব্যক্তিসঙ্ঘের একজন। আমার কালো বুকে অনেকটা তৃপ্তির আলোক

পেলুম।"[২] আবার 'ব্যথার দান' গল্পের অপর চরিত্র দারার মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন—"এর চেয়ে ভালো কাজ আর দুনিয়ায় খুঁজে পেলুম না, তাই এ দলে এসেছি।"[৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মুজফ্ফর আহ্মদ তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলামঃ স্মৃতিকথা' পুস্তকে লিখেছেন, "ব্যথার দানে দু'টি চরিত্র দারা ও সয়ফল মুল্‌ক বেলুচিস্তান হতে আফগানিস্তানের সহজ ইলাকা পার হয়ে তুর্কিস্তান কিংবা ককেসাসে গিয়ে লালফৌজে যোগ দিয়েছিল এবং বিপ্লব-বিরোধীদের বিরুদ্ধে লড়েছিল।"[৪] এক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কারণ প্রকৃত গল্পে দেখা যায় সয়ফল মুল্‌ক এবং দারা উভয়েই মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন তারা যোগ দিয়েছিল লালফৌজে। এই বিভ্রান্তি কাটানোর জন্য মুজফ্ফর আহ্মদের বক্তব্যটি এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—"সয়ফল মুল্‌ক ও দারা দু'জনেই যোগ দিল লালফৌজে। অথচ ব্যথার দান পুস্তকে আছে যে তারা মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিয়েছিল। এখানে আমার কিছু বলার আছে। নজরুল ইসলাম যখন ব্যথার দান গল্পটি আমাদের নিকট পাঠিয়েছিল তখন তাতে এই দু'জনের লালফৌজে যোগ দেওয়ার কথাই অর্থাৎ আমি ওপরে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি ঠিক সেই রকমই ছিল। আমিই তা থেকে লালফৌজ কেটে দিয়ে তার জায়গায় মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল বসিয়ে দিয়েছিলাম। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ ভারতে 'লালফৌজ' কথা উচ্চারণ করাও দোষের ছিল। সেই লালফৌজে ব্রিটিশ ভারতের লোকেরা যে যোগ দেবে তা যদি গল্পেও হয়, তা পুলিশের পক্ষে হজম করা মোটেই সহজ হতো না। রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের পরে ভূতপূর্ব জার সাম্রাজ্যের ভিতরকার বিপ্লব বিরোধী সৈন্যদল গঠন করে লড়াই শুরু করে। এই লড়াইয়ের পক্ষে অর্থ ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করতে থাকে জগতের ছোটবড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি। এই শক্তিগুলির লোকবলও এই বিপ্লব বিরোধী যুদ্ধে শামিল হয়েছিল। সকল দিক হতে বিপ্লবী রাশিয়া অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

বিপ্লবকে বাঁচাবার জন্য রুশ দেশের ভিতরে মজুর শ্রেণীর পার্টি ওসোভিয়েত রাষ্ট্রের নেতৃত্বে জনগণ যে সৈন্যদল গঠন করেছিল, তার নাম দেওয়া হল লালফৌজ। কিন্তু অক্টোবর বিপ্লব যেমন একা রুশ দেশের মজুর-কৃষকের বিপ্লব ছিল না, সমস্ত দুনিয়ার মজুর-কৃষকেরা সে বিপ্লবকে আপন মনে করে নিয়েছিল, সেই রকম বিপ্লব-বিরোধী গৃহযুদ্ধেও লালফৌজ একা ছিল না। লালফৌজকে এই গৃহযুদ্ধে সাহায্য করতে এসেছিল সমস্ত জগতের মেহনতী মানুষেরা ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীরা। আমাদের ভারতবর্ষও পেছিয়ে ছিল না। এই সময়ে আমাদের দেশে ভারতের ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট লালের আতঙ্কে শঙ্কিত হয়ে চারদিক হতে আটঘাট এমনভাবে বেঁধে ফেলেছিল যেন অক্টোবর বিপ্লবের কোন হাওয়াই এদেশে প্রবেশ করতে না পারে। ঠিক এমন সময়ে একজন ভারতীয় সৈনিকের লেখা গল্পের নায়কেরা যদি লালফৌজে যোগ দেয় তাহলে

তার সৈনিক শৃঙ্খলার দিক হতেও খুব ভালো হতো না। তাই আমি নজরুলকে জিজ্ঞাসা না করেও তার লালফৌজ কথা কেটে দিয়েছিলাম। তার জায়গায় মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল এই ভেবে লিখে দিয়েছিলাম যে যাঁর যা খুশী তা তিনি বুঝে নিবেন।"[৫]

১৯২০ সালের মার্চ মাসে উনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেন্ট ভেঙে যায়। এরপর কাজী নজরুল করাচি থেকে কলকাতায় চলে আসেন। সেই সময় সারা দেশে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রবল জোয়ার বইছে। ১৯১৯ সালের কুখ্যাত রাওলাট আইন দেশের জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয়। এই আইনে "The committee recommended special legislation which sought to curtail the liberty of the people in a drastic manner."[৬] গান্ধীজি রাওলাট আইনকে অভিহিত করেন "A law designed to rob the people of all real freedom."[৭] এর প্রতিবাদে সারা দেশে দেখা দেয় বিক্ষোভ আন্দোলন, মিছিল, সভা, হরতাল। এর পরিণতিতে ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ভারতবাসীকে অধিকমাত্রায় বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এই সময় শুরু হয় খিলাফৎ আন্দোলন (১৯১৯) ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০)। এইরূপ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী আন্দোলনমুখর পরিস্থিতিতে করাচির সৈন্যনিবাস থেকে কাজী নজরুলের কলকাতায় আগমন। এরূপ পরিস্থিতি একজন সৈনিককে, বিশেষত যিনি দেশপ্রেমের আহ্বানে রাজনীতিতে যোগ দেবার উদ্দেশ্যেই ফৌজে গিয়েছিলেন, তাকে প্রভাবিত করবে তা অস্বাভাবিক নয়। তাই সেই সময় যারাই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে নজরুল তাদেরই সমর্থন করেন। সেই সময় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রমিকদের মধ্যেও তা অভূতপূর্ব জাগরণের সৃষ্টি করে। ইংরেজদের সাথে কোনরূপ সহযোগিতা নয়—ব্রিটিশদের অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, ইংরেজদের কলে উৎপাদিত কাপড় বর্জনের নীতি গৃহীত হয়। খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের মিলিত প্রভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা তীব্র রূপ নেয়। বিশেষত খিলাফতের দুই প্রধান নেতা মওলানা শওকৎ আলী ও মহম্মদ আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে কংগ্রেসের মেলবন্ধনের কারণে ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির এক বাতাবরণের সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষাপটেই গড়ে ওঠে 'নবযুগ' পত্রিকা (১৯২০), যার লেখনীর প্রধান ধারক ছিলেন কাজী নজরুল। নবযুগের বিভিন্ন সম্পাদকীয় পরে 'যুগবাণী' (১৯২২) গ্রন্থে সংকলিত হয়। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের অত্যাচার, অনাচার ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসী যখন প্রতিবাদমুখর তখন নজরুল তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণে ইংরেজদের অত্যাচারের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। 'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' প্রবন্ধে তিনি লেখেন—"আমাদের হিন্দুস্তান যেমন কীর্তির শ্মশান, বীরত্বের গোরস্থান, তেমনি আবার তাহার বুক অত্যাচারী আততায়ীর আঘাতে ছিন্নভিন্ন। সেইসব আঘাতের কীর্তিস্তম্ভ বুকে ধরিয়া স্তম্ভিতা এই ভারতবর্ষ দুনিয়ার মুক্ত বুকে দাঁড়াইয়া আজ শুধু বুক চাপড়াইতেছে। অত্যাচারীরা যুগে যুগে যতকিছু

কীর্তি রাখিয়া গিয়াছে, এইখানে তাহাদের সবকিছুরই স্মৃতিস্তম্ভ তো আমাদের চোখে শূলের মতো বাজিতেছে। কিন্তু এই সে দিন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল, যেখানে আমাদের ভাইরা নিজের বুকের রক্ত দিয়া আমাদিগকে এমন উদ্বুদ্ধ করিয়া গেল, সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের নিহত সব হতভাগ্যেরই স্মৃতিস্তম্ভ বেদনা-শেলের মতো আমাদের সামনে জাগিয়া থাক—ইহা খুব ভাল কথা, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহাদেরই দুশমন ডায়ারকে বাদ দিলে চলিবে না। ইহার যে স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা হইবে তাহার চূড়া হইবে এত উচ্চ যে ভারতের যে কোন প্রান্তর হইতে তাহা যেন স্পষ্ট মূর্ত হইয়া চোখের সামনে জাগিয়া ওঠে। এ ডায়ারকে ভুলিব না, আমাদের মুমূর্ষু জাতিকে চিরসজাগ রাখিতে যুগে যুগে এমনই জল্লাদ-কসাই-এর আবির্ভাব মস্ত বড় মঙ্গলের কথা। ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ যেন আমাদিগকে ডায়ারের স্মৃতি ভুলিতে না দেয়। ইহার জন্য আমাদেরই সর্বাগ্রে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। নতুবা আমরা অকৃতজ্ঞতার বদনামের ভাগী হইব। এই যে আজ আমাদের নতুন করিয়া জাগরণ, এই যে আঘাত দিয়া সুপ্ত চেতনা, আত্মসম্মানকে জাগাইয়া তোলা, ইহার মূল কে ?—ডায়ার।" (ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ ঃ যুগবাণী)

'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে'—প্রবন্ধে নজরুল ইসলাম মুহাজিরদের প্রতি তাঁর সমবেদনা ও ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন—"আমরা ইহারই মধ্যে ভুলিয়া যাই নাই হতভাগ্য হাবিবুল্লার হত্যা বীভৎসতা। আজও মনে পড়ে সেইদিন, যেদিন খবর আসিয়াছিল যে, সামরিক পুলিসের সঙ্গে একদল মুহাজিরিন গোলমাল করায় কাঁচাগাঢ়ী নামক স্থানে মুহাজিরিনদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। একদল ভারতীয় সৈন্য তিন তিনবার গুলিবর্ষণ করে, তাহাতে মাত্র একজন নিহত ও একজন আহত হয়। কোন মূর্খ বিশ্বাস করিবে একথা ?

আমরা বলি, একটি আঘাতের বদলেই তিন-তিনবার গুলিবর্ষণ করা, এ কোন সভ্যদেশের রীতি ? তোমাদের ত সিপাহী সৈন্যের অভাব নেই—বিশেষ করিয়া সেই সীমান্ত দেশে। চল্লিশটি নিরস্ত্র লোককে, তাহারা যদি সত্যই অন্যায় করিয়া থাকে, সহজেই ত গিরেফ্‌তার করিয়া লইতে পারিতে। তাহা না করিয়া তোমরা চালাইয়াছিলে গুলি! আর কাহাদের উপর? যাহারা স্বদেশের স্বজনের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য তোমাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চলিয়াছিল।

কিন্তু আর আমরা দাঁড়াইয়া মার খাইব না, আঘাত খাইয়া খাইয়া, অপমানে বেদনায় আমাদের রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিয়াছে। কেন, তোমাদের আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, আর আমাদের নাই? তোমাদের একজনকে মারিলে আমাদের একহাজার লোককে খুন কর, আর আমাদের হাজার লোককে পাঁঠাকাটা করিয়া কাটিলেও তোমাদের কিছু বলিতে পাইব না? মনুষ্যত্বের, বিবেকের, আত্মসম্মানের, স্বাধীনতার উপর এত জুলুম কেহ কখনও সহ্য করিতে পারে কি ?"

(মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে? যুগবাণী)

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রথমাবস্থায় নজরুলকেও প্রভাবিত করে। কোন মত বা পথের দিকে দৃষ্টিপাত না করে তিনি গান্ধীবাদকে সমর্থন জানান।

"এ কোন পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মার আঙিনায়
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।
অধীনদেশের বাঁধান-বেদন
কে এলোরে করতে ছেদন?
শিকল দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি শঙ্খ কে বাজায়।"

(বিষের বাঁশী)

অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত এই গান নজরুল বিভিন্ন মিছিল ও মিটিং-এ গেয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের পথে স্বরাজ আনার পদ্ধতিকেও তিনি স্বাগত জানান। তাঁর বিখ্যাত 'চরকার গান' শীর্ষক কবিতায় তিনি লেখেন—

"ঘোর—
ঘোর রে ঘোর রে আমার সাধের চরকা ঘোর
ঐ স্বরাজ রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর।
তোর ঘোরার শব্দে ভাই
সদাই শুনতে যেন পাই
ঐ খুলল স্বরাজ সিংহদুয়ার আর বিলম্ব নাই।"

(চরকার গান ঃ বিষের বাঁশী)

নজরুলের এই সাহিত্য রচনা, যার মধ্যে দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা প্রকাশিত হয়েছিল, তার কাল সম্পর্কে অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেন, "নজরুলের কাব্যসাধনার আরম্ভ বিকাশ ও পরিণতি এমন একটা সময়ে যখন বাংলার রাজনৈতিক জীবন ছিল অস্বাভাবিক মাত্রায় চঞ্চল, রূপান্তরের ঘূর্ণাবর্তে-বিক্ষুব্ধ। দুই বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ের কালপ্রবাহে যাঁরা অবগাহন করেছেন তাঁরাই জানেন সেই কালের অভিব্যক্ত স্বরূপটি কি এবং তার চঞ্চলতার বেগ কতটা তীব্র। নজরুল সেই চঞ্চলতার সঙ্গে আত্মিক সংযোগ স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন যাঁদের চোখে স্বপ্ন ছিল, যে স্বপ্ন তাঁদের ক্লালো বর্তমানকে নীল ভবিষ্যতে নিয়ে যেত। তাঁরা ছিলেন দুঃসাহসে দুর্বার, ত্যাগে মৃত্যুঞ্জয়ী, সম্মুখে তাঁদের একটি মাত্রই আদর্শ-ভারতবর্ষকে শৃঙ্খলমুক্ত করা।"[৮] আবার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে নজরুলের অংশগ্রহণ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে নজরুল কাব্য একাত্ম হয়ে গেল। সকলেই জানেন, অস্ত্রবলে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার খণ্ড খণ্ড প্রচেষ্টা চলছিল সেই কালে, দেশে অরাজকতা সৃষ্টির প্রথা কিছুটা তাতে ছিল। দেশবাসীর চোখে এই প্রচেষ্টাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সান্ত্রাসবাদীদের দুঃসাহসই ভাষার আশ্রয়ে নজরুলের মধ্যে কাব্যরূপ লাভ করল।"[৯]

'চরকার গান'-এর মাধ্যমে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের স্তুতি গাইলেও

নজরুলের এ মোহ্ কাটতে বেশী দিন সময় লাগে নি। "তাই নজরুল প্রথমে অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সমর্থক হলেও পরে যখন এই আন্দোলনের ব্যর্থতা বুঝতে পারলেন, তখন সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষ অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে অবলম্বন করে অহিংসানীতির বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেও কুণ্ঠিত হলেন না।"[১০] প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে বুর্জোয়া আপসকামী ধারার প্রতিনিধিরা ভেবেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসকদের সাথে আলাপ আলোচনা করে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে পূর্ণ স্বাধীনতা না হোক অন্তত ডোমিনিয়ান স্টেটাস বা স্বরাজ আদায় করতে পারবেন। তাই অহিংস নীতির ভিত্তিতে স্বরাজ আন্দোলন গড়ে ওঠে। কিন্তু নজরুলেরও ঘোর কাটতে বেশী সময় লাগে নি। তিনি গান্ধীজির এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। কারণ তিনি মনে করতেন স্বাধীনতা কারো দয়ার বা দানের সামগ্রী নয়, এটি মানুষের মানবিক সত্তার অর্জিত অধিকার। তাই স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে দেশবাসীকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, বিদেশী শাসকদের কাছ থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হবে। ধূমকেতুতে তিনি লিখলেন—"সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুঁটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধি-টুকুকে দূর করতে হবে। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাকে বিদ্রোহ্ করতে হবে, সকল কিছু নিয়মকানুন, বাঁধন শৃঙ্খল, মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে।"

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এবং আপসকামী নীতির মধ্যে যে একটা সুবিধাবাদ ও স্ববিরোধিতার স্থান ছিল তা নজরুলের দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের এই পথকে ভীরুতা, কাপুরুষতা আখ্যা দিয়ে তিনি লেখেন—

"বুকের ভিতর ছ'পাই, ন'পাই, মুখে বলিস স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই।
ভারত হবে ভারতবাসীর—এই কথাটাও বলতে ভয়!
সেই বুড়োদের বলিস নেতা—তাদের কথায় চলতে হয়।
বলরে তোরা বল নবীন, চাইনে এসব জ্ঞান প্রবীণ।"

(বিদ্রোহীর বাণী ঃ বিষের বাঁশী)

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা আনা যে সম্ভব নয়, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। আপসের রাজনীতিতে যে ফাঁকি ছিল তা নজরুল উপলব্ধি

করেছিলেন। তিনি লেখেন—

"সূতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুনি।
জাগোরে জোয়ান! বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি।"

(সব্যসাচী ঃ ফণিমনসা)

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত ব্রিটিশ বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন অচিরেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। নজরুল বুঝতে পারেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনের একমাত্র পথ সশস্ত্র সংগ্রাম। তিনি জোরালোভাবে বিপ্লববাদের পক্ষে লেখনী ধারণ করেন। কংগ্রেসের চরমপন্থী ও নরমপন্থী মতভেদের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে পড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে দেখা দেয় অনিশ্চয়তার ঘনঘটা। নজরুল এই অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠে একটি নির্দিষ্ট কার্যকরী পথে স্বাধীনতা আন্দোলনকে পরিচালনা করার জন্য দৃপ্ত ভাবে ঘোষণা করেন—"কোথায় ভীমের জন্মদাতা পবন? ফুঁ দাও, ফুঁ দাও এ নিবন্ত অগ্নিসিন্ধুতে, আবার এক তরঙ্গে তরঙ্গে নিযুত নাগ-নাগিনীর নাগহিন্দোলা উলসিয়া উঠুক, আঘাত হানো, হিংসা আনো, যুদ্ধ আনো, এদের জাগাও, কান্নাকাতর আত্মাকে আর কাঁদিয়ো না। আমরা যে আশা করে আছি কখন সে মহাসেনাপতি আসবে যাঁর ইঙ্গিতে আমাদের মত শত শত কোটি সৈনিক বহ্নিমুখ পতঙ্গের মত তাঁর ছত্রতলে হাজির হাজির বলে হাজির হবে।"

(আমি সৈনিক / সম্পাদকীয় / ধূমকেতু)

বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে ধূমকেতুতে তিনি লিখলেন—"যে নরমুণ্ড-মালিনী চণ্ডী নিদ্রিত শিবের তাণ্ডব নৃত্য করে প্রলয় করতালি বাজিয়ে জাগিয়ে তোলে, সেই অশিব নাশিনীর উদ্দেশ্যে আমার কোটি কোটি নমস্কার। শিবকে জাগাও, কল্যাণকে জাগাও। আপনাকে চেনো। বিদ্রোহের মত বিদ্রোহ যদি করতে পারো, প্রলয় যদি আনতে পারো, তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই, কল্যাণ আসবেই। ছুটাও অশ্ব, চালাও রথ, হানো অগ্নিবাণ, বাজাও দুন্দুভি। বল, যে যায়, যাক সে, আমি আছি। বল, আমিই নতুন করে জগৎ সৃষ্টি করব। স্রষ্টার আসন থর থর করে কেঁপে উঠুক। বল, কারুর অধীনতা মানি না, স্বদেশীরও না, বিদেশীরও না।"

(মোরা সবাই স্বাধীন /সম্পাদকীয় /ধূমকেতু)

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের অন্যতম প্রতিনিধি নজরুল। আপসমুখী সংগ্রামের আড়ালে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার যে হীন প্রচেষ্টা তাকে বিদ্রূপ করে নজরুল লেখেন—"কানপুরে বড়দিনের ছুটিতে All India Political Tubri Compctition হয়ে গেল, জাতির সমস্যা সমাধানের জন্য ৩০টি conference বসেছিল। নিখিল ভারত প্রেততত্ত্বসভা থেকে আরম্ভ করে সোভিয়েত রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। সাম্যবাদী দলের conference-এর সভাপতি ঠিকই বলেছেন যে, শ্রমিক ও কৃষকের সাহায্য ব্যতীত যে Congress বলহীন, সে Congress-এর দ্বারা স্বরাজ আসতে পারে না, তা গত পাঁচ বছরের আন্দোলনের

ইতিহাসে প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।"

রাজনীতির ক্ষেত্রে ফাঁকিবাজি নজরুলকে ব্যথিত করত। তিনি দেশবন্ধুর মতো, দেশপ্রেমিককে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন রাজনৈতিক স্বাধীনতাই একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেই ভারতবাসীর প্রকৃত স্বাধীনতা আসতে পারে না। ভারতবর্ষের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মানুষের দুর্দশা মোচনের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সাথে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করাও অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই সেদিনকার স্বরাজ আন্দোলনের প্রতি বিদ্রূপের ভঙ্গীতে তিনি লেখেন—

"আমরা তো জানি, স্বরাজ আনিতে
পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস!
কত শত কোটী ক্ষুধিত শিশুর
ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস!
এল কোটী টাকা এল না স্বরাজ!
টাকা দিতে নারে ভুখারী সমাজ!
মা'র বুক হ'তে ছেলে কেড়ে খায়!
মোরা বলি, বাঘ খাও হে ঘাস।"

(আমার কৈফিয়ৎ)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য তিনি সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের সপক্ষে লেখনী ধারণ করেন। এই কারণে ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে নজরুলের প্রবন্ধের বই 'যুগবাণী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু তা নজরুলকে দমিয়ে রাখতে পারে নি। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতার মাধ্যমে তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ফুটিয়ে তোলেন এবং বিপ্লবীদের সক্রিয় করার জন্য সচেষ্ট হন।

"আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলা মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।
দেবশিশুদের মারছে চাবুক বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসী,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,—আসবি কখন সর্বনাশী?
দেব-সেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দ্বীপান্তরে,
রণাঙ্গনে নামবে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধরে?

(আনন্দময়ীর আগমনে ঃ অগ্নিবীণা)

ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে এই ধরনের বিপ্লবধর্মী কবিতা সেইসময়ে আনন্দবাজার পত্রিকা ছাপাতে সাহস পায় নি। পরে 'ধূমকেতু' পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। এই কবিতা ব্রিটিশ শাসকদের এতটাই বিচলিত করেছিল যে এটি ছাপার সঙ্গে সঙ্গেই সরকার তা বাজেয়াপ্ত করে। এর জন্য নজরুলের কারাদণ্ড হয়। কবিতার জন্য

কারাদণ্ড ব্রিটিশ শাসনে সেই প্রথম। ১৯২২ সালের ২২শে নভেম্বর কুমিল্লায় নজরুলকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯২৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪-ক ধারায় তাঁর একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জাতির জীবনে জাগরণ সৃষ্টির এই প্রয়াস রবীন্দ্রনাথকেও চমকিত করে। তিনি ১৯২৩ সালের ২২শে জানুয়ারী তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্যটি নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করেন। রাজ কারাগারের বন্দিদশা নজরুলের সাহসিকতায় বিন্দুমাত্র ভাটার সৃষ্টি করতে পারে নি। 'রাজবন্দির-জবানবন্দী' নামক প্রবন্ধে তিনি লেখেন—''আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী। তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দি হইয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

একধারে রাজার মুকুট ; আর এক ধারে ধূমকেতুর শিখা। একজন রাজা, হাতে রাজদণ্ড, আর জন সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড। রাজার পক্ষে নিযুক্ত রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অনন্তকাল ধরে সত্য জাগ্রত ভগবান।''[১১] রাজবন্দির জবানবন্দী প্রবন্ধেরই একটি বিবৃতি সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অত্যন্ত মূল্যবান—''আজ ভারত পরাধীন, তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ তো ন্যায়ের শাসন হতে পারে না, এই যে জোর করে সত্যকে মিথ্যা, অন্যায়কে ন্যায়, দিনকে রাত বানানো এ কি সত্য সহ্য করতে পারে? এ শাসন কি চিরস্থায়ী হতে পারে? এতদিন হয়েছিল, হয়ত সত্য উদাসীন ছিল বলে। কিন্তু আজ সত্য জেগেছে, তা চক্ষুষ্মান জাগ্রত আত্মামাত্রই বিশেষ রূপে জানতে পেরেছে। এই অন্যায় শাসন ক্লিষ্ট বন্দি সত্যের পীড়িত ক্রন্দন আমার কণ্ঠে ফুটে উঠেছিল বলেই কি আমি রাজদ্রোহী? এ ত্রন্দন কি একা আমার? না—এ আমার কণ্ঠে ঐ উৎপীড়িত নিখিল নীরব ক্রন্দসীর সম্মিলিত সরব প্রকাশ? আমি জানি, আমার কণ্ঠের ঐ প্রলয় হুঙ্কার একা আমার নয়, সে যে নিখিল আর্ত পীড়িত আত্মার যন্ত্রণা চিৎকার। আমায় ভয় দেখিয়ে মেরে এ ক্রন্দন থামানো যাবে না। হঠাৎ কখন আমার কণ্ঠের এই হারাবাণীই তাদের-আর একজনের কণ্ঠে গর্জন করে উঠবে।''[১২]

ভারতবাসীর উপর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য দেশের তরুণদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। তাঁর বিশ্বাস ছিল অত্যাচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারে যৌবনই। জাতির মুক্তির সংগ্রামের আপসহীন ধারার প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ঘোষণা করেন—

''আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ
এই দুলালুম বিজয় নিশান, মরতে আছি মরব শেষ।''

(বিদ্রোহীর বাণী ঃ বিষের বাঁশী)

'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে নজরুল যেমন পরাধীন ভারতবাসীকে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন, তেমনি ব্রিটিশ শাসকদের

সামনে পরিষ্কার ভাষায় ভারতের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করতে দ্বিধা করেন নি। এই কাব্যগ্রন্থটি দেশব্যাপী যেমন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, ব্রিটিশ শাসকদেরও সেইরূপ করেছিল ভীত ও আতঙ্কিত। কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশের (১৯২৪ সাল) সঙ্গে সঙ্গেই তা বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। ১৯২৪ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় সরকার বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ১৯৪৫ সালে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা সম্ভব হয়। সেই সময়ে বেঙ্গল লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত 'বিষের বাঁশী' সম্পর্কে বাংলা সরকারের পাবলিক ইন্সট্রাকশনের কাছে নিম্নের পত্র লিখেছিলেন ঃ

"Sir,

I have the honour to enclose herewith a copy of a book entitled the'Visher Vanshi' (the Flute of Venom) by one Kazi Nazrul Islam which was received in Bengal Library on the 21st August, 1924. The extracts translated (which are also enclosed herewith) will show that the publication is of a most objectionable nature, the writer revelling in revolutionary sentiments and inciting young men to rebellion and to law breaking. The ideas, though often extremely vague, have clearly a dangerous intent, as the profusion of such words as blood tyranny, death, fire, hell, demon and thunder will show. I may add that the writer was once convicted of seditions, and is since being lionised by a section of people. I recommend that the attention of the special branch of Criminal Investigation Department may be drawn to this publications the copy submitted herewith may kindly be returned to the office when done with."[১৩]

অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের এই সুপারিশ সহ পুলিশ 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থটি হস্তগত করে। এছাড়াও 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কলকাতার তৎকালীন পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট ১৯২৪ সালের ১৮ই অক্টোবর চিফ সেক্রেটারীকে একটি পত্র লেখেন ঃ

"Sir,

I have the honour to forward herewith a copy of a letter No. 559/17/24 dated the 24th September, 1924 from the Bengal librarian to the Director of Public Instructor, Bengal together with a copy of the enclosure on the subject of a book entitled 'Bisher Vanshi' by Kazi Nazrul Islam.

The writer was convicted last year under section 124A and 153A I.P.C. and sentenced to one year's R.I. in the Dhumketu sedition case. The content of the book, as would appear from the extracts of translations are dangerously objectionable and recommend the immediate proscription of the same.

The Bengal librarian's copy of the book in original is also sent herewith for reference and may be returned to him when done with."[১৪]

কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের উপরোক্ত সুপারিশের উপর ভিত্তি করে চিফ সেক্রেটারি এ. এন. মাবারলি বিষের বাঁশী কাব্যগ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ জারি করেন ঃ

"In exercise of the power conferred by section 99A of the code of criminal procedure, 1898 as amended by the third schedule of the Press Law Repealed and Amended Act 1922 (Act XIV of 1922), the Governor of council hereby declares to be forfeited to his Majesty all copies, where ever found of a book in Bengali entitled 'Visher Vanshi' printed at the Bani Press, 33A Madan Mitra Lane, Calcutta and published by the author Kazi Nazrul Islam, Hooghly and all other documents containing the matter of the said book contains words which bring an attempt to bring hatred or contempt and excite or attempt to excite disaffection towards the Government established by law in British India, the publication of which is punishable under section 124 A Indian Penal Code."[১৫]

তৎকালীন সরকার 'বিষের বাঁশী' বাজেয়াপ্ত করার বিজ্ঞপ্তি যেমন প্রচার করেছিলেন, তেমনি গ্রন্থটির কপি সংগ্রহের জন্য কবির বাড়ি ও বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট চিফ সেক্রেটারিকে এক পত্রে জানান ঃ

"Sir.

With reference to your endorsement No. 10724-27p. dated the 22nd instant, I have the honour to report for the information of Government that by virtue of search warrants issued by the Chief Presidency Magistrate, Calcutta the marginally noted places were searched by the Calcutta police on the 23rd instant resulting in the seizure of 44 copies in all of the proscribed book entitled 'Bisher Banshi'

2.The house of author at Hooghly was also searched but no copy of the book was found."[১৬]

নিয়মতান্ত্রিক পথে দেশকে স্বাধীন করার ভ্রম ত্যাগ করে তিনি পূর্ণ বিদ্রোহী মন্ত্রে সকলকে জাগিয়ে তোলার জন্য লেখেন—

"আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়মকানুন শৃঙ্খল!
আমি মানিনাকো কোন আইন
আমি ভরাতরী করি ভরাডুবি
আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন!"

(বিদ্রোহী)

নজরুল স্বাধীনতা লাভের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেকারণে তিনি মনে করতেন ব্রিটিশ শাসকদের কবল থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য আপসহীন সংগ্রামই সত্যকার সংগ্রামের পথ। তিনি মনে করতেন যে প্রত্যেককে তাদের নিজেদের অধিকারের দাবি বজায় রাখতে হবে এবং তা আদায়ের জন্য প্রয়োজনে মৃত্যুবরণ করতে হলেও পিছপা হলে চলবে না। তিনি জানতেন বিদেশী শোষকদের ন্যায় স্বদেশী শোষকরাও মানুষের শত্রু। এই শোষণ থেকে মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি। স্বাধীনতা আন্দোলন যখন তীব্র আকার ধারণ করেছে তখন ব্রিটিশ সরকারও থেমে থাকে নি। প্রতিবাদী বিপ্লবীদের কারাগারে নিক্ষেপ এবং তাদের বন্দী করে রাখা, ফাঁসিদান—এই ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশল। একে বিদ্রূপ করে নজরুল লিখলেন—

"এই শিকল পরা ছল, মোদের এ শিকল পরা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।।
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়।
এই বাঁধন পরেই বাঁধন-ভয়কে করব মোরা জয়
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল ভাঙা কল।।
....
তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে করব তারে লয়,
মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি পরে আন্‌ব হাসি মৃত্যু জয়ের ফল।।"

(শিকল পরার গান ঃ বিষের বাঁশী)

স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত থাকার অপরাধে যে সব বিপ্লবী বন্দী হয়েছিলেন, সেই সব বন্দী সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণা দিয়ে তিনি লিখেছেন—

"কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট
রক্তজমাট শিকল পূজার পাষাণবেদী।"

(ভাঙার গান ঃ ভাঙার গান)

তাঁর মতে পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে বিদ্যমান সকল নিয়মকানুন ও বাধা-নিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। এরজন্য প্রয়োজন লক্ষ লক্ষ তরুণ প্রাণের, যারা হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করে ব্রিটিশের তরবারি রাঙিয়ে দিতে পারবে। "ক্ষুদিরাম গেছে, কিন্তু সে ঘরে ঘরে জন্ম নিয়ে এসেছে কোটি কোটি ক্ষুদিরাম হয়ে। তোমরা চিনতে পারছ না। তোমরা মায়ায় আবদ্ধ। ছেড়ে দাও আমাদের ক্ষুদিরামকে—তোমাদের ছেলেদের ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ওরা আমাদের—আমাদের লক্ষ্মীছাড়ার দলের, ওরা ঘরের নয় ওরা বনের। ওরা হাসির নয় ফাঁসির। ঐ যে কণ্ঠে হাত দিয়ে জড়িয়ে

বুকে চেপে ধরছ, ঐ কণ্ঠে ফাঁসির নীল দাগ লুকান আছে। ওরা তোমার নয়, আমার নয়—ওরা দেশের, ওরা বলিদানের, ওরা পূজার।"

(ক্ষুদিরামের মা ঃ রুদ্রমঙ্গল)

দেশ থেকে অত্যাচারী ইংরেজদের উৎখাত করার জন্য তিনি দেশবাসীকে শির তুলে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন। মহাপুরুষ নয়, দেশকে স্বাধীন করার জন্য তিনি চেয়েছিলেন সেইরূপ পুরুষকে যে হবে দেশপ্রেমিক, বিদ্রোহ করার মত মানসিক শক্তি যার আছে। "কিন্তু দেশ এখন চায়, মহাপুরুষ নয়। দেশ চায়, সেই পুরুষ যার ভালোবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে। যে দেশকে ভালোবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না, সে দরকার হলে আঘাতও করবে, প্রতিঘাতও বুক পেতে নেবে, বিদ্রোহ করবে। ..."

(আমি সৈনিক ঃ দুর্দিনের যাত্রী)

স্বাধীনতা আন্দোলনকে সার্থক করে তোলার জন্য নজরুল যুব সমাজকে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ ভুলে মানবতার আদর্শকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলার জন্য আহ্বান জানান। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকেরা বুঝতে পেরেছিলেন হিন্দু-মুসলমানের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারলে ভারতবর্ষে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে পড়বে। হিন্দু-মুসলমান বিভাজনের উদ্দেশ্যে তাই তাঁরা চালু করেন 'Divide and Rule Policy'। এর বিষময় প্রভাব পড়ে জাতির জীবনে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদী রূপ পরিগ্রহ করে। শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। একে মদত দিতে থাকে সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়, যা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র বাংলাদেশে। এই দাঙ্গা নজরুলকে গভীরভাবে মর্মাহত করে। ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলনে জাতিকে উদ্দেশ্য করে তিনি 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' নামক গানটি রচনা করেন।

"দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ
কাণ্ডারী, আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ
'হিন্দু না ওরা মুসলিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।"

হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ দেখে ব্যথিত নজরুল 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধে লিখেছেন—"দেখিলাম, আল্লার মসজিদ আল্লা আসিয়া রক্ষা করিলেন না, মা কালীর মন্দির মা কালী আসিয়া আগলাইলেন না। মন্দিরের চূড়া ভাঙিল, মসজিদের গম্বুজ টুটিল? ... মানুষের পশু-প্রবৃত্তির সুবিধা লইয়া ধর্মান্ধদের নাচাইয়া কত কাপুরুষই না

আজ মহাপুরুষ হইয়া গেল।"

(মন্দির ও মসজিদ ঃ রুদ্রমঙ্গল)

আবার এই প্রবন্ধেরই শেষ অংশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টিকারী স্বার্থান্বেষী মানুষের বিরুদ্ধে দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন ঃ "সকল কালে সকল দেশে লাভ লোভকে জয় করিয়াছে তরুণ। ওগো বাংলার তরুণের দল ওগো আমার আগুন খেলার নির্ভীক ভাইরা, ঐ দশলক্ষ অকালমৃতের লাশ তোমাদের দুয়ারে দাঁড়াইয়া। তারা প্রতিকার চায়।

তোমরা ঐ শকুনির দলের নও, তোমরা আগুনের শিখা, তোমাদের জাতি নাই। তোমরা আলোর, তোমরা পানের, তোমরা কল্যাণের । তোমরা বাহিরে এস, এই দুর্দিনে তাড়াও ঐ গো-ভাগাড়ে পড়া শকুনির দলকে ।"

(মন্দির ও মসজিদ ঃ রুদ্রমঙ্গল)

সুতরাং একদিকে যখন ভারতবাসী পরাধীনতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত এবং অপরদিকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দীর্ণ সেই সময় জাতিকে সজাগ ও সচেতন করার জন্য নজরুলের এই প্রয়াস ছিল অনন্য। মুজফ্ফর আহ্মদ তার 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা' গ্রন্থে লিখেছেন "হিন্দু সংগঠন ও মুসলীম তন্‌জীমের (তন্‌জীম মানেও সংগঠন) কাজ-কর্মের ভিতর দিয়েও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছিল। তন্‌জীমের নেতারা কিন্তু দাবী করতেন যে তাঁদের সংগঠন হিন্দু বিদ্বেষী নয়। 'কংগ্রেস কর্মী সঙ্ঘ' হতেও সাম্প্রদায়িকতার কম ইন্ধন জোগানো হচ্ছিল না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা এই সঙ্ঘ গড়েছিলেন। এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গী হতে তাঁরা সি. আর. দাশের হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টকে বাতিল করার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছিলেন যা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারেরই সহায়ক হয়েছিল। এই জঘন্য আবহাওয়াকে ও সত্যকার দাঙ্গাকে সামনে রেখেই নজরুল ইসলাম তাঁর 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' রচনা করেছিল।"[১৭]

সমসাময়িক রাজনীতির সুবিধাবাদী চেহারা, স্বদেশী শাসকদের ভণ্ডামী দেখে যেমন নজরুল ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তেমনি অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং পরবর্তী পর্যায়ে ভারত ছাড় আন্দোলনের জাগরণে তাঁর জ্বালাময়ী বাণী প্রচার করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতবর্ষের বৃহত্তর জনগণকে সামিল করতে এবং আন্দোলনকে আরো বিপ্লবাত্মক করে তুলতে। এক্ষেত্রেই স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসকামী নেতৃত্বের তথা জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে তাঁর মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যখনই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপক ও বিপ্লবাত্মক রূপ নিতে শুরু করেছে, যখনই তা হয়ে উঠেছে জঙ্গী ও দুর্বার, তখনই নিয়মতান্ত্রিক নেতৃত্ব তাকে থামিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু নজরুল শুধু বিপ্লববাদকেই স্বাগত জানান নি, তিনি চেয়েছিলেন মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা, গণমুক্তি । বিভিন্ন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও গানের মাধ্যমে তিনি শুধু রাষ্ট্রনৈতিক শৃঙ্খল ভাঙার বিদ্রোহ বাণীই প্রচার করেন

নি, ভীরু জাতিকে আত্মবলে বলীয়ান হবার এবং সকল প্রকার শোষণ ও অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস, মনোবল ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। নজরুল মনে করতেন বিপ্লবের উন্মত্ততা, প্রতিবাদের স্পৃহাকে অস্ত্রবলে শান্ত করা যায়, কিন্তু আত্মশক্তিতে শক্তিমান জাতিকে চিরকাল অধীন করে রাখা বা তাকে জয় করা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং কেবলমাত্র দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের বিতাড়নই নয়, আত্মশক্তি অর্জনই হল প্রকৃত স্বাধীনতা।

কাজী নজরুল ইসলামের লেখনী পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দিয়েছিল এক নতুন মাত্রা। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য তিনি আত্মত্যাগ করার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে স্বরাজ আসলেই স্বাধীনতা আসে না। স্বদেশের স্বাধীনতাই একমাত্র স্বাধীনতা নয়, মানুষের সার্বিক মুক্তিই মানুষের স্বাধীনতা। অর্থাৎ তাঁর মতে, রাজনৈতিক স্বাধীনতাই শেষ কথা নয়, চাই অর্থনৈতিকস্বাধীনতাও। সেই স্বাধীনতা শুধু বিদেশী ইংরেজ হরণ করে নি, হরণ করেছে দেশী বিদেশী বেনিয়া, জমিদার, মোল্লা, পুরোহিত। তাঁর মতে, প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চাই আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি অর্জন। মানুষের অধিকারের প্রতি মর্যাদাবোধ। আজ নজরুল জন্মশতবর্ষে দাঁড়িয়ে যখন দেখা যায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকলেও পুঁজিবাদী শোষণের বেড়াজাল থেকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সম্পূর্ণ মুক্তি ঘটে নি, যখন দেশের বিভিন্ন বুর্জোয়া ও পাতিবুর্জোয়া দল সমূহের অবস্থানের দরুন অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের শক্তি দুর্বল, যখন ব্যক্তিস্বার্থ সাধনে মনুষ্যত্বহীন নীতির প্রাবল্য, ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা দেশের বিভিন্ন স্থানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে যখন সুবিধাবাদী রাজনীতি দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে করে তুলেছে অস্থির, যখন সংকীর্ণ ধর্মীয় অনাচার অবিচার দেশের মানুষকে করে তুলেছে বিপন্ন, তখন নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা—সাম্প্রদায়িকতাহীন মানবিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার মুক্ত-চিন্তাধারা, অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন সংগ্রামী মনোভাব, তাঁর পার্থিব মানবতাবাদী আপসহীন চিন্তাধারা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর অসাম্যহীন, বঞ্চনাহীন, শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার যে স্বপ্ন, যা এখনও রয়ে গেছে কল্পনার স্তরে, অনার্জিত, আমাদের সেই স্বপ্নের দিকেই তাকাতে হবে। তাই তাঁকে অনুসরণ করেই বলা যায়—

> "গাহি সাম্যের গান—
> যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
> যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।।"

তথ্যসূত্র

১। কাজী কল্যাণী ও ইসলাম রফিকুল (সম্পাদিত) নজরুল শ্রেষ্ঠ সংকলন, সাহিত্যম, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ২১২।
২। তদেব, পৃঃ ২০০।
৩। তদেব, পৃঃ ২০০।
৪। আহ্‌মদ মুজফ্‌ফর, কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ১০১।
৫। তদেব, পৃঃ ১০৪-১০৫।
৬। Majumdar R.C, History of the Freedom Movement in India, Vol 3, Calcutta, 1963, p 2.
৭। Tendulkar D. G, Mahatma,Vol II, 1951, p.131.
৮। পোদ্দার অরবিন্দ, 'কবি নজরুল' (হায়াৎ মামুদ ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত সম্পাদিত তোমার সাম্রাজ্য যুবরাজ), পৃঃ ২৩৩-৩৪।
৯। তদেব, পৃঃ ২৩৪।
১০। গুপ্ত সুশীলকুমার, নজরুল চরিতমানস, দ্বিতীয় দেজ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃঃ ১৬৩।
১১। কাজী কল্যাণী ও ইসলাম রফিকুল (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৭।
১২। তদেব, পৃঃ ২৯৮-৯৯।
১৩। কর শিশির, নিষিদ্ধ নজরুল (প্রথম সংস্করণ) , কলকাতা ১৯৮৩, পৃঃ ১৪।
১৪। তদেব, পৃঃ ১৫।
১৫। তদেব, পৃঃ ১৬।
১৬। তদেব, পৃঃ ১৭।
১৭। আহ্‌মদ মুজফ্‌ফর, কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১১৯।

কাজী নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ঃ রাজনৈতিক সম্পর্কের উৎস সন্ধান

সুস্নাত দাশ

মুখবন্ধ

কাজী নজরুল ইসলামের জীবনের প্রথম পর্যায়ে বিদ্রোহী কবি যখন সক্রিয় ভাবে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত (১৯১৯-১৯২৯) সেসময় নানা ক্ষেত্রে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন এবং কমবেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে নজরুল ইসলামের প্রথম সাক্ষাৎ হয় কলকাতায় ১৯২০ সালের জানুয়ারী মাসে। ইতোপূর্বে করাচি সেনা শিবির থেকে প্রেরিত নজরুলের কবিতা বা গল্প মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের উদ্যোগেই কলকাতার সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হাবিলদার নজরুল ইসলাম সেই বার তাঁর রেজিমেন্ট থেকে সাতদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। এরই মধ্যে একদিন তাঁকে পথ চিনিয়ে ৩২, কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির নতুন অফিসে নিয়ে এসেছিলেন নজরুলের অভিন্নহৃদয় বন্ধু মুজফ্‌ফর আহমদ। 'কাকাবাবু' নামেই যিনি বাঙলার কমিউনিস্ট মহলে সুপরিচিত। এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ তাঁর স্মৃতিকথায় দিয়েছেন এইভাবে ঃ

"হ্যাঁ কাজী নজরুল ইসলামকে সেদিন আমি প্রথম দেখলাম। সে তখন একুশ বছরের যৌবনদীপ্ত যুবক। সুগঠিত তার দেহ আর অপরিমেয় তার স্বাস্থ্য। কথায় কথায় তার প্রাণ খোলা হাসি। যে সব কথা আগে চিঠিপত্রের মারফৎ হয়েছে সে সব কথা আবারও হল। তাকে আমি কলকাতায় এসে থাকতে বললাম। সাহিত্য সমিতির ঘরগুলি তাকে দেখিয়ে দিলাম। বললাম, এখানেই তার থাকার জায়গা হবে।" (কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ পৃঃ ৪০-৪১)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ১৯১৯ সালে তখন ৪৯ নং বাঙালী রেজিমেন্ট ভেঙে যাবার মুখে। অতএব নজরুলের আসা একরকম নিশ্চিতই ছিল। কাকাবাবুও এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। এটাই অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় যে মানুষকে চেনা ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কিন্তু নজরুলকে বুকে টেনে নিতে মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করেন নি। এমনকি তাঁর সঙ্গে 'তুমি' সম্বোধনের বিরল-প্রায় সম্পর্কও (এটা অনেকেরই জানা যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ দু' একটি ক্ষেত্র ছাড়া ছোট বড় সকলকেই আপনি সম্বোধন করতেন) স্থাপন করেছিলেন। মুজফ্‌ফর সাহেবের দূরদৃষ্টি এখানেই যে তিনি বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ধূমকেতু বিদ্রোহী কবিকে সঠিকভাবেই

চিনতে পেরেছিলেন।

১৯২০ সালের মার্চ মাসে ৮৯ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেন্ট পুরোপুরি ভেঙে গেল। নজরুলও কলকাতায় চলে এলেন ওই মার্চ মাসেই তিন-চারদিন শৈলজানন্দর বোর্ডিং হাউসে থাকার পর নজরুল কাকাবাবুর পূর্বকথা মতো এসে উঠলেন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে। অফিস লাগোয়া একটি ঘরে থাকতেন কাকাবাবু। তার ঘরেই নজরুলের জন্য আরো একখানা তখৎপোশ পড়ল। এই ভাবেই শুরু হল একত্রিশ বছরের মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে একুশ বছরের নবীন যুবক নজরুল ইসলামের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। অবশ্যই এই সম্পর্কের প্রাথমিক ভিত্তি ছিল সাহিত্য-প্রেম। কিন্তু পরবর্তীকালে কাকাবাবু সাহিত্যের মায়াবী অঙ্গন ছেড়ে চলে গেলেন সংগঠিত শ্রমজীবী রাজনীতির কংক্রীট সড়কে, কাজী নজরুল ইসলাম কিন্তু রয়ে গেলেন তাঁর কাব্য-সাহিত্য ও সঙ্গীতের একান্ত জগতেই, যদিও দেশপ্রেমের প্রচণ্ড আবেগ তাঁকে নানা সময় রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মাঝে টেনে এনেছিল। প্রধানত এই কারণেই ১৯২৩ সালের পর থেকেই মুজফ্‌ফর সাহেবের সঙ্গে নজরুলের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ শিথিল হয়ে আসে। কিন্তু একই সঙ্গে দৃঢ় হতে থাকে উভয়ের মধ্যকার আত্মিক সম্পর্ক। কাকাবাবু যেমন নজরুলকে নিকটাত্মীয় অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করতেন তেমনি নজরুলও যতদূরে, যেভাবেই থাকুন মনে মনে জানতেন যে এই বাঙলা দেশে তার চিরস্থায়ী নিশ্চিন্ত আশ্রয় একটিই আছে তা হল কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।

৩২, কলেজ স্ট্রীট ঠিকানাতে থাকার সময়েই নজরুল ইসলামের নামে বর্ধমান সাব রেজিস্ট্রারের চাকরির একটি ইন্টারভিউ এসেছিল। নজরুল চাকরিটা নিতে ইচ্ছুকও ছিলেন, কিন্তু আফজালুল হক সাহেব সহ কাকাবাবুরা অনেকেই নজরুলকে ওই ইন্টারভিউ দিতে দেন নি—তাঁর সাহিত্য প্রতিভার হানি হবে বলে। নজরুলের জীবনে এই ঘটনা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

যা হোক 'মোসলেম ভারত' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক আফজালুল হক্ সাহেবের সঙ্গে কাকাবাবুই নজরুলকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং এই পত্রিকাতেই নজরুলের একুশ বছর বয়সের তাজা রচনাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাঁর খ্যাতি ক্রমশই ছড়িয়ে পড়ছিল। মোহিতলাল মজুমদার এই সময়েই নজরুলকে অভিনন্দিত করে তাঁর বিখ্যাত পত্রটি লেখেন। অবশ্য একই সঙ্গে নজরুলের কবিতা প্রকাশ হতে থাকে উপাসনা, সওগাত, প্রবাসী প্রভৃতি পত্র পত্রিকায়। নজরুলের সৃষ্টিশীলতার প্রথম পর্বে তাঁর সর্বসময়ের সঙ্গী ও প্রেরণার অন্যতম উৎস ছিলেন কাকাবাবু। বুঝতে অসুবিধা হয় না, নজরুল জীবনের এই পর্যায়ে মুজফ্‌ফর আহমদের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য যদিও কাকাবাবু কখনোই তাঁর কোন স্মৃতিকথাতেও তা সাড়ম্বরে ঘোষণা করেননি।

১৯২০ সালেই কাকাবাবু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে একটা কিছুর মধ্যে নিজের জীবনকে তিনি বিলিয়ে দেবেন—হয় সাহিত্য নয় রাজনীতি। কাকাবাবু

রাজনীতিকেই বেছে নিয়েছিলেন (সমকালের কথা—মুজফফর আহ্‌মদ, পৃঃ ২৭) কাকাবাবু নজরুলের কাছে জানতে চাইলেন যে সে রাজনীতিতে যোগ দেবে কিনা। জবাবে নজরুল বললেন, 'তাই যদি না দেব তবে ফৌজে গিয়েছিলাম কিসের জন্যে? ... প্রসঙ্গে কাকাবাবু লিখেছেন—

"নজরুল যে নিছক কবি নয়, সে যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন সৈনিকও, এই কথাটা নজরুলের নূতন পাওয়া সাহিত্যিক বন্ধুদের অনেকেই বুঝতে চাইতেন না, আর এই বোঝার জন্য অনেক অসুবিধারও সম্মুখীন হতে হয়েছে।" (কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, পৃঃ ৬৫)

নজরুল জীবনের ট্রাজেডী আলোচনা করলে আজ বোঝা যায় যে কাকাবাবু একটু কম করেই বলেছেন। নজরুলের স্বভাবগত উদ্দামতা, প্রাণোচ্ছলতা ও বাঁধনহারা জীবনযাত্রাকে উস্কে দিয়ে কয়েকজন উঠতি সাহিত্যিক বন্ধু হয়তো কবির ক্ষতিই করেছিল।

যা হোক রাজনৈতিক সংগ্রামে যুক্ত থাকার আকাঙ্ক্ষাতেই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় ও ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হল সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' (মে, ১৯২০) যদিও কাগজে সম্পাদকদ্বয়ের নাম ছাপা হত না। এই সময়েই (১৯২০ সালে) নজরুল দৈনিক 'নবযুগের' সম্পাদকীয় স্তম্ভে অনেক জ্বালাময়ী ও আবেগপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন যা পরবর্তীকালে 'যুগবাণী' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। নবযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে একমাত্র এই দৈনিকেই শ্রমিক কৃষকের কথা সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরা হতো। ব্রিটিশ বিরোধী রচনার জন্য নবযুগকে কয়েক মাস পরেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই সময়ে কাকাবাবু ও নজরুল কলকাতায় লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে 'নবযুগের' প্রতিনিধি রূপে যোগদান করেন (৪-৯ সেপ্টেম্বর ১৯২০)।

নবযুগ সাময়িক বন্ধ হবার পর (জানুয়ারী, ১৯২১) নানা স্থানে অস্থায়ী ভাবে বসবাস করে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও নজরুল ইসলাম পাকাপাকি ভাবে বাস করতে এলেন 'নবযুগ' অফিসের পাশেই ৮/এ টার্নার স্ট্রীট-এর পাকা একতলা বাড়িতে। বাড়িটির চারিপার্শ্বে ছিল দরিদ্র মুসলিম বস্তি। মানুষের জীবন সংগ্রাম, দারিদ্র্য, রুটি-রুজির লড়াই এই সময় থেকেই নজরুলের কাব্য সাহিত্যে ফুটে উঠতে থাকে। আর তৎকালে রচিত নজরুলের শ্রেষ্ঠতম কবিতাগুলির অনেকটিরই প্রথম পাঠক ছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। এই বস্তি বাড়িতে থাকাকালীনই নজরুলের সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটে কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের। ক্রমে তা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় যা অবশ্য স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। যা হোক ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে 'নবযুগ' প্রকাশ পুনরায় বন্ধ হয়ে গেলে সাময়িকভাবে কাকাবাবু ও নজরুল-জীবনে বিচ্ছেদ আসে। 'নবযুগ' বন্ধ হবার মাসখানেক পূর্বেই (ডিসেম্বর ১৯২০) নজরুল কাগজ ছেড়ে চলে যান দেওঘরে। কারণ নজরুলের উঠতি সাহিত্যিক বন্ধুরা তাঁকে বোঝায় যে দৈনিক

কাগজের কাজ সাহিত্যচর্চার অনুকূল নয়, তাঁকে নির্জনে সাহিত্যচর্চা করতে হবে। বিশেষ করে 'মোসলেম ভারত' সম্পাদক আফজালুল হক সাহেবই নজরুলের দেওঘরে যাত্রার প্রধান প্ররোচক ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন নজরুল দেওঘরে বসে শুধু মাত্র তাঁর কাগজের জন্যই প্রচুর পরিমাণে লিখে যাবেন। বিনিময়ে নজরুলের দেওঘরে বাসের সমস্ত খরচা বহন করবেন (মাসিক একশত টাকা) আফজালুল সাহেব। কিন্তু নজরুলের দেওঘর-বাস বিশেষ ফলদায়ক কিছু হয়নি। ওখানে অবস্থানকালে খুব বেশি লেখাও যেমন তিনি লিখতে পারেন নি। তেমনি আফজালুল হক সাহেব প্রতিশ্রুতিমতো তাঁকে টাকাও পাঠাতে পারেন নি। ফলে নজরুলকে প্রচণ্ড আর্থিক দুরবস্থায় পড়তে হয়। এই অবস্থায় পুনরায় ত্রাণকর্তার ভূমিকায় এসে দাঁড়ান মুজফ্ফর আহ্মদ।

১৯২১ সালে নজরুলকে কাকাবাবু কলকাতায় ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু কবি তখনও আফজালুল হকের হাত থেকে মুক্তি পান নি। নজরুল তার সঙ্গেই আরো কিছুদিন থাকেন এবং হাতবদল হওয়া প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের 'নবযুগ' পত্রিকায় পুনরায় লিখতে শুরু করেন। এই ঘটনায় কাকাবাবু যে নজরুলের উপর ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন সে কথা তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন। তবে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ যদি সময়ে তাঁর অনুজপ্রতিম কবিবন্ধুকে নিজের কাছে রাখতে পারতেন, তবে হয়তো নজরুলের ভবিষ্যৎ জীবন এতটা বিশৃঙ্খল ও ভবঘুরে হতো না। অবশ্য তিনি সে চেষ্টা করতে ব্যর্থ হন। যা হোক ওরকম প্রতিক্রিয়াশীল মালিকানাধীন কাগজের সঙ্গে নজরুলের বিপ্লবী মানসিকতার যে মিল হবে না তা সহজেই অনুমেয়। কবি পুনরায় কাগজ ছেড়ে দিয়ে আবার পথভোলা পথিকের জীবনই বেছে নিলেন।

দুই

এবার ঠিকানা উত্তরপূর্ব ভারত—কুমিল্লা। সঙ্গী আলি আকবর খান নামক এক বন্ধু। কার্যত অবশ্য তিনি বন্ধুর আচরণ তো করেনই নি, উপরন্তু তিনি নজরুলকে নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যে বন্ধু অগ্রজের কথা অগ্রাহ্য করে নজরুল চলে গিয়েছিলেন, সেই মুজফ্ফর সাহেবই মাত্র ত্রিশটা টাকা সম্বল করে অশেষ ঝুঁকি মাথায় নিয়ে, বহু কষ্ট সহ্য করে কুমিল্লার দৌলতপুর থেকে প্রায় কোনক্রমে নজরুলকে উদ্ধার করে এনেছিলেন (৮ই জুলাই, ১৯২১)। কুমিল্লায় থাকাকালীনই নজরুলের সঙ্গে অবশ্য পরিচয় ঘটে তাঁর ভাবী বধূ প্রমীলার। কাকাবাবুও সেই ত্রয়োদশী বালিকাকে প্রথম দেখেন এবং প্রথম দর্শনে তাকে স্নেহাশীর্বাদ দেন। একটা কথা অবশ্য সত্য যে নজরুলের কুমিল্লা ভ্রমণ যত বিরক্তিকর বা মর্ম বিদারকই হোক না কেন, এই সময়ে কতকগুলি অসামান্য রচনাও সৃষ্টি করেছিলেন।

১৯২১ সালের জুলাই মাসে কলকাতায় ফিরে এসে পুনরায় নজরুল কাকাবাবুর

সঙ্গে ৩/৪ সি তালতলা লেন বাড়িতে থাকতে শুরু করেন। মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে নজরুল ইসলামের একত্রে এই শেষ বসবাস। এখানে থাকাকালীন নজরুল তার বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' রচনা করেন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের এক শেষ রাত্রে। ভোরবেলা উঠে প্রথম সে কবিতা পাঠ করে শোনান তাঁর অগ্রজপ্রতিম বন্ধু মুজফ্ফর আহ্মদকে। জানা যায় যে কবিতাটি ছাপা হবার পর রবীন্দ্রনাথকে পড়ে শোনানোর পর আবেগাপ্লুত হয়ে বিশ্বকবি নজরুলকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নজরুল ৩/৪ সি তালতলা লেনের বাড়ি ও কাকাবাবু দীর্ঘদিনের সঙ্গ ছেড়ে আবার চলে যান কুমিল্লা। এই দুই মহান ব্যক্তিত্ব তারপর থেকে আর কখনোই একত্রে বসবাস করেন নি। ১৯২১ সালে দুজনে মিলে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু অর্থাভাবে তা সম্ভব হচ্ছিল না। তখন কুতবুদ্দিন আহ্মদ নামে একজন ব্যক্তি তাদের কাছে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কাকাবাবু এই প্রস্তাবে অসম্মত হন। পরবর্তীকালে অবশ্য কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ 'কাজী নজরুল ইসলাম' স্মৃতিকথায় স্বীকার করেছিলেন যে এটি ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ভুল সিদ্ধান্ত। বস্তুত কাগজ প্রকাশ করা সম্ভবপর হলে হয়ত নজরুলকে তিনি আরও কিছুদিন ধরে রাখতে পারতেন। হয়ত নজরুলের বাউণ্ডুলে এলোমেলো জীবনধারা সুশৃঙ্খল হত; হয়ত নজরুলের শেষ জীবনের বিষাদ ট্রাজেডী বাঙালী জাতিকে দেখতে হত না। যৌবনের উদ্দামতা কেটে গেলে হয়ত বা কাকাবাবু নজরুলকে অগ্রজের মতনই সঠিক পথের ও সঠিক নিশানার সন্ধান দিতে পারতেন।

নজরুলের হঠাৎ কুমিল্লা চলে যাওয়ার ফলে নজরুলকে নিয়ে কাকাবাবুর পরিকল্পনায় বাধা সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে নজরুলের সঙ্গে পত্র মারফৎ তাঁর কিছু মনান্তর ঘটে। আসলে কাকাবাবু নজরুলকে প্রচণ্ড স্নেহ করলেও তাঁর এই হুজুগে জীবনযাত্রা মেনে নিতে পারতেন না। কিন্তু বিদ্রোহী কবিকে রুখবে এমন সাধ্য কার। কুমিল্লায় মাস পাঁচেক ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর বাড়িতে কাটিয়ে নজরুল কলকাতায় ফিরে এলেন মাসিক একশত টাকা বেতনে 'দৈনিক সেবক'-এ যোগ দিতে। এই চাকুরী জীবন নজরুলের পছন্দ ছিল না। সে নিজেই একটি কাগজ প্রকাশ করতে উদগ্রীব ছিল। অবশেষে সেই সুযোগ এসে গেল 'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদনার মাধ্যমে। একজন প্রথমে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে মুজফ্ফর সাহেব-এর কাছেই এসেছিলেন 'ধূমকেতু' প্রকাশনার প্রস্তাব নিয়ে। কিন্তু কাকাবাবু তাকে ফিরিয়ে দেওয়ায় তিনি তখন নজরুলকে রাজী করান। সুতরাং 'ধূমকেতু' প্রকাশনা নিয়ে নজরুল ও কাকাবাবুর মধ্যে কোনো পারস্পরিক যোগাযোগই হয়নি। তবে 'ধূমকেতু'তে 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে মুজফ্ফর আহ্মদও দুই একবার লিখেছিলেন। যাইহোক ধূমকেতু পত্রিকা বাংলার জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। ধূমকেতুর মারফৎ নজরুল প্রধানত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত তরুণদের কাছে বিপ্লবের বাণী পৌঁছে দিচ্ছিলেন

এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। কাকাবাবু এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ "১৯২৩-২৪ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আবার যে মাথা তুলল তাতে নজরুলের অবদান ছিল একথা বললে বোধহয় অন্যায় করা হবে না।"

(কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা।। পৃঃ ২৯২)

১৯২১ সালে নভেম্বর মাসে নজরুল এবং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ স্থির করেন যে তাঁরা ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন। ফৌজে থাকতে নজরুল রুশ বিপ্লবের প্রভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু 'ধুমকেতু' পর্যায়ে নজরুল সর্বহারা রাজনীতির সংগঠিত কর্মসূচী পরিত্যাগ করে অনেকটা যেন রোমান্টিক বিপ্লবী জাতীয়তাবাদের আবেগ-সর্বস্ব স্রোতে ভেসে গেলেন। নজরুলের দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা কামনায় ঘাটতি ছিল না ঠিকই কিন্তু এই সময় তার পথ মার্কসবাদী শ্রেণী রাজনীতি ও বাংলাদেশে সেই আদর্শের অন্যতম প্রারম্ভিক প্রবক্তা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের পথ থেকে ভিন্ন হয়ে গেল।

১৯২২ সালের ২৩শে নভেম্বর কাজী নজরুল ইসলামকে পুলিশ কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার করে ধূমকেতুতে 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা লেখার অভিযোগে। নজরুল জেল থেকে ছাড়া পান ১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর । নজরুলের সাজা হওয়ার (১৬ই জানুয়ারী ১৯২৪) কয়েক মাসের মধ্যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদও কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী হয়ে কারান্তরালে চলে যান। দুজনের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে শেষ যোগসূত্রও ছিন্ন হয়ে যায়।

তিন

১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত লেবার স্বরাজ পার্টি' কলকাতায় গঠিত হয়। এই দলের প্রথম ইস্তাহার রচনা করেন নজরুল। দীর্ঘদিন এই ইস্তাহার অপ্রকাশিত ছিল। যেমন এখনও অপ্রকাশিত রয়ে গেছে নজরুলের ফৌজে থাকাকালীন রচিত বেশ কিছু কবিতা, ডায়েরী ও চিঠিপত্রের বাক্সটি কিভাবে কাকাবাবু হারিয়ে ফেলেছিলেন সেই বৃত্তান্ত। মুজফ্‌ফর তাঁর রাজনৈতিক স্মৃতিকথায় পরে তা লিখবেন বলে লিখে উঠতে পারেন নি। জানিনা এ বিষয়ে সমকালীন যুগের কোনো ব্যক্তিত্ব কিছু আলোকপাত করতে পারেন কিনা।

যা হোক, 'লেবার স্বরাজ পার্টির' মুখপত্র রূপে ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকা। নজরুল ছিলেন তার প্রধান পরিচালক। প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় নজরুলের আর একটি কালজয়ী কবিতা 'সাম্যবাদী' যা রুশ সহ পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'কৃষকের গান' এবং তৃতীয় সংখ্যায় 'সব্যসাচী' কবিতা। এই সময় নজরুল বাস করছিলেন হুগলীতে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কলকাতায় অনুপস্থিতি সত্ত্বেও 'শ্রমিক কৃষক' সর্বহারা রাজনীতির প্রতি নজরুলের

আস্থা তখনও সুস্পষ্ট ছিল। কানপুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রয়াস (১৯২৫) নিঃসন্দেহে এসময় নজরুলকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল।

কাকাবাবুর সঙ্গে নজরুলের পুনরায় দেখা হয় পাক্কা তিন বছর পরে কৃষ্ণনগরে ১৯২৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী। নজরুল তখন স্বদেশী নেতা হেমন্তকুমার সরকারের আশ্রয়ে স্ত্রী ও শাশুড়ী সহ কৃষ্ণনগরে বসবাস করছেন।

১৯২৬ সালে নজরুল ছিলেন একজন নিবেদিত প্রাণ রাজনৈতিক কর্মী। কৃষ্ণনগরেই গঠিত হল 'বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দল'। নজরুল সম্মেলনে উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে গেয়েছিলেন স্বরচিত 'শ্রমিকের গান'। তাছাড়া ১৯২৬ সালেই কাকাবাবু যখন জাতীয় কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ লাভ করেন, নজরুল তখনই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন সদস্য। কৃষ্ণনগর ছিল সেইসময়ে (১৯২৬) রাজনীতির প্রাণক্ষেত্র। এবং নজরুল তাতে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯২৬ সালে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের অনুরোধে নজরুল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সংগীতের বাংলা তর্জমা (অন্তর ন্যাশনাল সংগীত) করেন। লেখেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' 'ছাত্রদলের গান', 'চল চল চল'-এর মতো প্রেরণাদায়ক সংগীত। পরবর্তীকালে 'গণবাণী' পত্রিকা ছিল নজরুলের কাব্য প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম।

১৯২৬ সালেই নজরুলের আরও একটি হঠকারী কাজ ছিল, হঠাৎই তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে বসলেন। অথচ তাঁর হাতে এই বাবদ একটি টাকাও ছিল না। কাকাবাবু বারংবার তাঁকে নিষেধ করেছিলেন নজরুলের মানসম্মানের প্রশ্ন তুলে। কিন্তু কবি তাতে কর্ণপাত করেননি। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সম্ভবত কিছু অর্থ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল যৎসামান্য। নির্বাচনে নজরুলের জামানত জব্দ হয়েছিল।

এইভাবে বারংবার দেখা গেছে নজরুল আকস্মিক আবেগাপ্লুত হয়ে নানা বিষয়ে হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে আঘাত পেয়েছেন। কাকাবাবু যতটা পেরেছেন তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন বহুক্ষেত্রেই। নিজের মতামত ও সিদ্ধান্ত অন্যের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার অভ্যাস ও মানসিকতা কাকাবাবুর চরিত্রে ছিল না বলেই নজরুল-জীবনে অনেক অঘটনই ঘটেছিল।

কৃষ্ণনগরে নজরুল ছিলেন ১৯২৮ সালের শেষদিক পর্যন্ত। এরপর কলকাতায় এন্টালী এলাকায় ৮/১ পানবাগান লেনে। কাছেই ছিল ওয়ার্কস এন্ড পেজান্টস পার্টির অফিস (২/১ ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেন)। সুতরাং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে নজরুল পরিবারের যোগাযোগ অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

চার

১৯২৯ সালের প্রথম থেকেই নজরুল জীবনের আর একটি পর্যায়ের সূত্রপাত যার সঙ্গে কাকাবাবুর কোনো সম্পর্কই ছিল না। রাজনীতির জগৎ ছেড়ে নজরুল ইসলাম

পুরোপুরি অনুপ্রবিষ্ট হলেন সঙ্গীতের জগতে। কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদও ১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে পুনরায় চলে গেলেন কারান্তরালে। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে মুজফ্ফর আহ্মদ তখন এক নিবেদিত প্রাণ মার্কসবাদী বিপ্লবী। যাহোক তখন থেকে প্রায় সাতটি বছর অর্থাৎ ১৯৩৬ সালের শেষ পর্যন্ত নজরুল ও কাকাবাবু পুনরায় পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে রইলেন, যদিও কাকাবাবু চিকিৎসার জন্য জামিন পেয়ে খুব স্বল্প সময়ের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। নজরুল এসময়ে মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের সাহায্য করেছিলেন সঙ্গীত পরিবেশন ও নানাভাবে বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দিয়ে। মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে নজরুল শেষবারের মত একত্রে একটি রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন এই মামলায় মুজফ্ফরের গ্রেপ্তারে অব্যবহিত পূর্বে ১৯২৯ সালের মার্চ মাসের প্রথমে কুষ্ঠিয়ায় একটি কৃষক সম্মেলনে।

নিঃসন্দেহে কবিরূপে যেমন, তেমনই সঙ্গীতকার রূপেও নজরুল ছিলেন একজন জনপ্রিয়তম সার্থক স্রষ্টা। কেউ কেউ এমনও মনে করেন, নজরুল চেতনার গভীরতা যথেষ্টভাবে অনুধাবন করা যায় তার কিছু অসামান্য গানে। উনিশশো ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধে অর্থাৎ যে সময়ে কমিউনিস্ট রাজবন্দী মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। সেই সময়ে কাব্য সাহিত্য সংগীতে নজরুল প্রতিভা ছিল মধ্যগগনে। কিন্তু একই সঙ্গে প্রভূত অর্থ সমাগমের কারণে নজরুলের মধ্যে বেহিসাবী বিলাসিতার ঝোঁক দেখা যায়। চারিত্রিক উচ্ছলতা, উদ্দামতা, মজলিশী আড্ডার রাস টানার মতো উপকারী বন্ধুর সত্যিই তখন খুব অভাব ছিল নজরুলের। দু' চারজন ছাড়া সকলেই তাঁর চতুঃপার্শ্বে স্বার্থের প্রয়োজনে ঘোরাফেরা করতেন। একের পর এক তিনি তাঁর গ্রন্থস্বত্বগুলি বিক্রী করে দিচ্ছিলেন ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই। তিরিশের দশকের প্রথমার্ধে নজরুল একহাতে হাজার হাজার টাকা উপার্জন করেছেন, অন্যহাতে সেই অর্থ জলের মত ব্যয় বা অপব্যয় করেছেন। যিনি নজরুলকে এইসময়ে কিছুটা শৃঙ্খলার বাস্তব জগতে ফেরাতে পারতেন, সেই মুজফ্ফর আহ্মদ তখন ছিলেন কারান্তরালে। ফলে ১৯৩৯ সালে যখন নজরুল জায়া প্রমীলাদেবী গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন তাঁর চিকিৎসার খরচ জোটানোর জন্য হাত পাততে হলো সুদখোর মহাজনের কাছে।

এ প্রসঙ্গে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ

"বুলবুলের মৃত্যুর কিছুকাল পরে নজরুল মোটরগাড়ী কিনেছিল তার 'অগ্নিবীণার' স্বত্ব বিক্রয় করে। সে সময়ে মোটর গাড়ীর দাম সস্তা ছিল। পেট্রোলের দামও ছিল সস্তা। ড্রাইভারের মাইনাও ছিল কম। এই সব কিছু বিবেচনা করলেও নজরুলের পক্ষে মোটর গাড়ী কেনা ছিল হঠকারিতা। পরে নজরুল আমার নিকটে এই কথা স্বীকার করেছে।"

(কাজী নজরুল প্রসঙ্গে ।। বিংশ শতাব্দী ।। ১৯৫৯, পৃঃ ১২৪)

যদিও জানা যায় নজরুলের মোটর গাড়ী কেনার বিষয়টি ছিল একান্তভাবেই তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান বুলবুলের অকালমৃত্যু থেকে উদ্ভূত ভাবাবেগপ্রসূত সিদ্ধান্ত (বুলবুল মোটর গাড়ী খুব ভালবাসত), তথাপি নজরুলের এই জাতীয় বিলাসিতা ছিল বাস্তব বিবর্জিত।

নজরুলের শেষজীবনে দুটো পয়সার জন্য গ্রামোফোন কোম্পানীতে দিবারাত্রি পরিশ্রম করে শত শত গান লিখে ও সুর দিয়ে রেকর্ড করতে হয়েছিল। এই সময়ে নজরুল কি গান লেখেন নি। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় বলা যায়, "শোনা যায় নজরুলের গানের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশী। পৃথিবীতেই নাকি কোনো একজন কবি এতো বেশী গান রচনা করেন নি। কথাটা অসম্ভব নয়—শেষের দিকে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানির ফরমাসে যান্ত্রিক নিপুণতায় অজস্র গান উৎপাদন করে যাচ্ছিলেন—প্রেমের গান, কালীর গান, ইসলামী গান, হাসির গান—সবরকম। সে সব গান বোধহয় গ্রন্থাকারে এখনো সংগৃহীত হয়নি, তাই তাদের অস্তিত্বের কথাও আমরা অনেকে জানি না।"

(নজরুল সমীক্ষণ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত । পৃঃ ৮৩ ।। ঢাকা)

এর ফলে নজরুলের স্বাস্থ্য দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করে। এরই মধ্যে তখন তিনি শুরু করেছেন আধ্যাত্মিক তুকতাক যোগ সাধনা, মন্ত্রতন্ত্রের অলৌকিক জগতে বিচরণ। এরপর ১৯৪২ সালে নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়লে অর্থাভাবে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা পর্যন্ত করা সম্ভব হয় নি। হলে নজরুল হয়তো বাকশক্তি রহিত ও স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে পড়তেন না। আসলে ১৯৩৭ সালের পর মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে আত্মগোপন করে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সংগঠিত করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হচ্ছে । তিনি নজরুল সম্পর্কে খুবই কম সংবাদ পেতেন। কিছু খবর কানে আসলেও কাকাবাবুর সেক্ষেত্রে কিছুই প্রায় করার ছিল না। এ প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন ঃ

" ১৯৩৬ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বন্দীদশা হতে মুক্তি পেয়ে এসে আমি মাঝে মাঝে নজরুলদের বাড়ী গিয়েছি। কিন্তু ১৯৩৭ সালে আমি সারাক্ষণ পুলিসের চরদের দ্বারা অনুসৃত হতে থাকি। এই চরদের সঙ্গে নিয়ে কোনও বন্ধুর বাড়ী যাওয়া চলতো না। এই কারণে নজরুলদের বাড়ী যাতায়াত আমি ছেড়ে দিয়েছিলেম। আমার মাঝে মাঝেও যাওয়া চলতো যদি সক্রিয় রাজনীতিতে এখনও নজরুলের যোগ থাকতো। তা ছিল না।"

(কাজী নজরুল প্রসঙ্গ।। পৃঃ ১৬১ ।। বিংশ শতাব্দী ।। ১৯৫৯)

উনিশশো তিরিশ দশকের শেষার্ধে অবশ্য নজরুল আধ্যাত্মিক ভাবে আচ্ছন্ন ও নতুন নতুন ইয়ার দোস্ত, সাহিত্যিক বন্ধু নিয়ে মশগুল হয়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। তাঁর হয়তো মনেই পড়তো না যে একদা ১৯২১ সালে তারা দুই বন্ধু ভারতবর্ষে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ

করেছিলেন।

নজরুল অসুস্থ হবার পরে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে (৯ই জুলাই অল ইন্ডিয়া রেডিও স্টেশনে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন) সর্বপ্রথম কাকাবাবু নজরুলের শাশুড়ী মাতা গিরিবালা দেবীর কাছে শুনলেন হাইকোর্টের সলিসিটর অসীমকৃষ্ণ দত্তের নিকট মাত্র চার হাজার টাকার বিনিময়ে নজরুলের গানের রয়ালটি ও পুস্তকাদি বাঁধা পড়ে আছে।

নজরুলের জীবনের শেষ অধ্যায়ের ট্রাজেডী আজও আমাদের অনুতাপ বাণে দগ্ধ করে। এতবড় একজন কবি প্রতিভা মাত্র ৪৩ বছর বয়সে শেষ হয়ে গেলেন। আরও কত কী নজরুলের দেওয়ার ছিল কে তার হিসাব করবে। আজ পক্ষপাতহীনভাবে বিচার করলে বোঝা যায় এই রকম পরিণতির জন্য নজরুল নিজেও কম দায়ী ছিলেন না। মুজফ্ফর আহ্মদের কথাগুলি অস্বীকার করা যায় না কোনমতেই।

"নজরুলের রোগের প্রথম সূচনা কখন হয়েছিল তা বলা কঠিন। সে নিজে নিশ্চয় তার ভিতরে এই রোগের আবির্ভাবটা অনেক আগে টের পেয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে যদি কোনো বিশিষ্ট চিকিৎসকের কাছে যেত তা হলে আজ আমাদের দেশ তাকে এইভাবে হারাত না। তাহলে আমাদের চোখের সামনে আজ এক জীবন্মৃত নজরুলকে দেখতে হত না। দেশের কত দুর্ভাগ্য যে নজরুলের যখন বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত ছিল, তখন সে আশ্রয় নিয়েছিল আধ্যাত্মিকতার কোটরে। এই আধ্যাত্মিকতা যে কি তা আমি জানিনে, তবে তা রোগের ঔষধ নয়।"

(কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা ঃ পৃঃ ৪৪৭)

নজরুল ইসলামের মত প্রাণবন্ত সাহসী ও বিপ্লবী প্রাণপুরুষ কেন নিজেকে এইভাবে ক্ষয় হতে দিলেন সে প্রশ্ন অনেকেরই। মুজফ্ফর সাহেব এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"নজরুল ইসলাম মার্কসবাদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সমাজের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস মার্কসবাদের এই মোদ্দা কথাটি সে মানত। তার কবিতায় সাম্যবাদের সুর আছে। সাম্যবাদের দর্শনের নাম দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। একইসঙ্গে এই দর্শনে বিশ্বাসী ও অধ্যাত্মবন্দী কেউ হতে পারেন না, অথচ, নজরুল ইসলাম আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। যে ছাত্ররা নজরুল ইসলামের সাহিত্য নিয়ে চর্চা করেছেন তাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে এটা কি করে সম্ভব হল। এর উত্তর আমিও পরে দিয়েছি, অবশ্য তা আমারই উত্তর। অনেকেই অবশ্য আমার সঙ্গে একমত হবেন না জেনেও আমি বলব নজরুল যখন আধ্যাত্মিক সাধনা করতে গিয়েছিল তখন সে পরিপূর্ণরূপে সুস্থ ছিল না। দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কোনো কোনো সূত্র সে মানত ঠিকই কিন্তু এই দর্শনটি সে যে কখনও আয়ত্ত করেনি একথাও ঠিক।"

(কাজী নজরুল প্রসঙ্গে। পৃঃ ১৬০।। বিংশ শতাব্দী ১৯৫৯)

দেশবাসীর দুর্ভাগ্য যে মুজফ্ফর আহ্মদ যদি তার অনুজপ্রতিম প্রিয় বন্ধুর দুর্দিনের

সংবাদ পূর্বেই কোনমতেই পেতেন তবে হয়তো নজরুলের মত অসামান্য প্রতিভাকে সুরক্ষিত করার প্রয়াসী হতে পারতেন, যেমনটি অতীতে অনেকবারই তিনি করেছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ কাকাবাবু পাননি। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন ঃ

"নজরুল ইসলামের আধ্যাত্মিকতার পুরো যুগটাই আমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। বিচ্ছিন্ন না থাকলেও তাকে হয়ত এই পথ হতে ফেরাতে পারতাম না, কিন্তু চেষ্টা তো করতে পারতাম।"

(কাজী নজরুল প্রসঙ্গে ।। পৃঃ ১৬২, বিংশশতাব্দী ।। ১৯৫৯)

এই দুই অসামান্য ব্যক্তিত্বের নিবিড় সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের পরিসমাপ্তি ঘটাবো কাজী নজরুল ইসলামের দৃষ্টিতে মুজফ্‌ফর সাহেবের পরিচয় তুলে ধরে।

১৯২৬ সালে এক ব্যক্তি ছদ্মনামে 'আত্মশক্তি' পত্রিকায় 'গণবাণী' পত্রিকাকে কটাক্ষ করে একটি পত্র লেখেন। নজরুল তৎক্ষণাৎ জবাবে "আত্মশক্তি"তে একটি আবেগ মথিত সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। তার অংশবিশেষ ঃ

'দয়া করে একবার ৩৭ হ্যারিসন রোডের 'গণবাণী' অফিসে পদধূলি দিয়ে যান। ...দেখে চোখে জল আসে, বিশেষ করে যখন দেখি গণবাণীর কর্ণধার হতভাগ্য মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে। অবস্থা ত সব ফকিরের ফোকরা, হাঁড়িতে ভাত নেই সানকিতে ঠোকরা।' আর শরীরের অবস্থাও তেমনি। যেন সমগ্র মানব সমাজের প্রতিবাদ। আমি হলপ করে বলতে পারি মুজফ্‌ফরকে দেখলে লোকের শুষ্ক চক্ষু ফেটেও জল আসবে। এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌনী কর্মী, এমন ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা। সবচেয়ে এমন উদার বিপুল বিরাট মন নিয়ে সে কি করে জন্মাল গোঁড়া মৌলবীর দেশ নোয়াখালিতে। এই মোল্লা মৌলবীর দেশ বাঙলায়, ভেবে পাইনে ও যেন আগুনের শিখা, ওকে মেরে নিবৃত্ত করা যায় না।"

(ডঃ আব্দুল হালিম ; নবজীবনের পথে ; ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১৯৬৬)

কাজী নজরুল ইসলাম ও কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর চলার পথ শেষ পর্যন্ত দু-দিকে বেঁকে গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪২-এর পর নজরুলের কণ্ঠ যখন চিররুদ্ধ হয়ে গেল তারপর বহুদিন পর্যন্ত মুজফ্‌ফর সাহেব তাঁর নীরব হয়ে যাওয়া বন্ধুর পাশে বসতেন। ১১ই জ্যৈষ্ঠ, নজরুলের জন্মদিনে মাথায় বুলাতেন স্নেহময় হাত, দুচোখে ঝরতো জলের ধারা। একটি রাজনৈতিক সম্পর্ক তখন অন্য এক মানবিক রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো।

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কাজী নজরুল ইসলাম

অমিতাভ চন্দ্র

প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেম ও আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার সঙ্গে বঞ্চিত-নিপীড়িত-শোষিত মানুষের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতাই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে আকৃষ্ট করেছিল সাম্যবাদী মতাদর্শের প্রতি, তাঁকে নিয়ে এসেছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনের কাছাকাছি। বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য এবং সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল সাম্যবাদী মতাদর্শে। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের তাত্ত্বিক অনুশীলন নয়, হৃদয়াবেগের প্রাবল্যই তাঁকে প্রণোদিত করেছিল শ্রমিক-কৃষকের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে। সাম্যবাদী মতাদর্শের প্রতি তাঁর আকর্ষণের প্রকাশ যেমন ঘটেছে তাঁর বিভিন্ন কালজয়ী কবিতায়, তাঁর সাহিত্যকর্মে ও সাংবাদিকতায়, তেমনই প্রকাশ ঘটেছে বিশের দশকে তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপেও। বিশের দশকে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের শৈশবে এই আন্দোলনের সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ। সেই দশকে অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের জনক মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের ভূমিকাও অবিস্মরণীয়। বিশের দশকের গোড়ার দিকে অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার যে প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ, আব্দুল হালিম প্রমুখ, সেই প্রয়াসের সঙ্গেই সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন সাম্যবাদী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ নজরুল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৭ সালে ভারতের তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার প্রচণ্ড চাপের ফলে বাঙালীদেরও সৈন্যদলে গ্রহণ করতে সম্মত হয়ে সৈন্যবাহিনীতে একটি বেঙ্গলী ডবল কোম্পানি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। সেই সময়কার দেশনেতারা তখন বাঙালী যুবকদের সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের জন্য আহ্বান জানালেন। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে ব্রিটিশের কাছ থেকে যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষা গ্রহণ করে পরবর্তীকালে সেই শিক্ষাকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারত থেকে বিতাড়ন। অন্যান্য অনেক যুবকের মতই এই আহ্বানে সাড়া দিলেন মেধাবী ছাত্র কাজী নজরুল ইসলাম। তখন তিনি ছিলেন রানীগঞ্জের শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর প্রথম ছাত্র। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা না দিয়ে এবং প্রথাগত লেখাপড়ার পাট সম্পূর্ণ চুকিয়ে দিয়েই ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন নজরুল। দেশপ্রেমের প্রবল প্রেরণাতেই তিনি যোগদান করেছিলেন সৈন্যদলে। স্কুলে পড়াকালীনই পূর্বোক্ত স্কুলের শিক্ষক ও বিপ্লবী যুগান্তর দলের সঙ্গে সংযুক্ত

নিবারণচন্দ্র ঘটকের প্রভাবে নজরুল বৈপ্লবিক মতবাদ ও কাজকর্মের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যদিও আকর্ষণের পরিধি অতিক্রম করে তা সক্রিয় কোনও ভূমিকার স্তরে গিয়ে পৌঁছয় নি। কিন্তু এই প্রভাবের পরিণতিতে স্বদেশপ্রেম ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা নজরুলের মধ্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাই তিনি সৈন্যদলে যোগ দিয়ে যুদ্ধে যাওয়ার বিষয়টিকে দেশপ্রেমের কাজ হিসাবেই গণ্য করেছিলেন। দেশপ্রেমের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ নজরুল মনে করেছিলেন, যুদ্ধে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু বেঁচে থাকলে যুদ্ধবিদ্যা ও নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার আয়ত্ত করেই বাঁচা সম্ভব হবে, আর এ সবের প্রয়োজন দেখা দেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে।[১] জ্বলন্ত দেশপ্রেমই যে তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করতে এবং ফৌজ থেকে তিনি যে ফিরেছিলেন দেশপ্রেমে ভরপুর হয়ে, তার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে সৈন্যবাহিনী থেকে ফেরার পর, অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত যাঁর হাত ধরে, সেই মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনে। স্বয়ং মুজফ্ফর আহ্মদের জবানিতেই বিষয়টি আমাদের আলোচনায় উল্লিখিত হল ঃ

> আমি নজরুল ইসলামের নিকটে জানতে চাইলাম সে রাজনীতিতে যোগ দেবে কিনা। জবাবে নজরুল বললেন, 'তাই যদি না দেব তবে ফৌজে গিয়েছিলাম কিসের জন্যে?'[২]

ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর যে বেঙ্গলী ডবল কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলেন নজরুল, তার আয়তন ক্রমশই বাড়তে বাড়তে তা একটি রেজিমেন্ট্-এ পরিণত হয়েছিল। এর নাম হয়েছিল উনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেন্ট্। এই রেজিমেন্ট্-এর হাবিলদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন নজরুল। ১৯২০ সালের জানুয়ারি মাসের চতুর্থ সপ্তাহে পল্টন থেকে সাত দিনের ছুটি পেয়ে নজরুল কলকাতায় এসেছিলেন বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। এই শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেই নজরুল এসেছিলেন ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে। এখানেই নজরুলের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির তৎকালীন সহকারী সম্পাদক ও সমিতির সর্ব সময়ের কর্মী মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের উভয়কে ভালো লেগেছিল এবং উভয়ের মধ্যে শুরু হয়েছিল অন্তরঙ্গতা।

১৯২০ সালের মার্চ মাসে উনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেন্ট্ সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ায় কাজী নজরুল ইসলাম সৈন্যবাহিনী ত্যাগ করে ফিরে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় ফিরে আসার পর তিনি মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে একত্রে বসবাস শুরু করলেন ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসেই।[৩] এই যোগাযোগ ও একত্রে বসবাসের পরিণতিতে গভীরতর হল এই দুই অবিস্মরণীয়

ব্যক্তিত্বের সখ্য ও অন্তরঙ্গতা। পরবর্তীকালে বাসস্থান বহুবার বদলেছে, একত্রে বসবাসের দিন শেষ হয়ে পৃথক্ হয়ে গেছে উভয়ের বাসস্থান, উভয়ের চলার পথও আর এক থাকে নি, ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে উভয়ের জীবন, কিন্তু অটুট থেকে গেছে মুজফ্ফর আহ্মদ ও কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে সখ্য ও অন্তরঙ্গতা, উভয়ের মধ্যে অচ্ছেদ্য প্রীতির সম্পর্ক। বিশের দশকে নজরুলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশেষভাবেই প্রভাবিত হয়েছিল মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে তাঁর এই পরিচয়, যোগাযোগ ও সম্পর্কের দ্বারা। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র গ্রথিত হয়েছিল মুজফ্ফর আহ্মদের মাধ্যমেই।

প্রবল স্বদেশপ্রেম ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনাকে সম্বল করেই নজরুল যোগ দিয়েছিলেন সেনাবাহিনীতে, গিয়েছিলেন যুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধে যোগদানের ফলে বহির্জগতের সঙ্গে নজরুলের যে যোগাযোগ স্থাপিত হল, তা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও পরিবর্তিত ও প্রসারিত করে তুলেছিল। সমকালীন ঘটনাবলী তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে যোগ করেছিল নতুন মাত্রা, তাঁর চেতনার জগৎকে করে তুলেছিল আরও প্রসারিত। এই সমকালীন ঘটনাবলীর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সফল বলশেভিক বিপ্লব। ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর মহান্ নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (মহান্ অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বা বলশেভিক বিপ্লব হিসাবেও সুপরিচিত) জয়যুক্ত হয়েছিল রাশিয়ায়, জন্মগ্রহণ করেছিল বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র—সোভিয়েত ইউনিয়ন। যুগান্তকারী এই বিপ্লবের প্রভাব এসে পড়েছিল ভারতে। বলশেভিক বিপ্লবের কোনও সঠিক সংবাদ যাতে কোনওভাবে ভারতে প্রবেশ করতে না পারে এবং এই বিপ্লবের কোনও প্রভাব যাতে ভারতে এসে না পড়ে, সেই ব্যাপারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যৎপরোনাস্তি প্রয়াস চালিয়েছিল। এই বিপ্লব সম্পর্কে ভারতীয় জনমানসে যাতে কোনও শ্রদ্ধাবোধ বা মোহের সৃষ্টি না হয়, সেই বিষয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ছিল বিশেষ তৎপর। কমিউনিস্ট মতাদর্শ তথা বলশেভিক মতবাদের বিরুদ্ধে তারা সারা ভারতব্যাপী চালু রেখেছিল এক ঘৃণ্য প্রচারাভিযান। একইসঙ্গে তারা সংবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে কঠোর সেন্সরশিপ ব্যবস্থাও বলবৎ রেখেছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্রে তাদের যাবতীয় প্রয়াস শেষ বিচারে বিফলতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কারণ বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব থেকে ভারত মুক্ত থাকে নি।[৪]

একইভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিল, এই বলশেভিক বিপ্লবের সংবাদ যাতে কোনওভাবে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যারাকে গিয়ে না পৌঁছয়। এই বিষয়ে তারা অব্যাহত রেখেছিল তাদের কঠোর প্রয়াস। ব্রিটিশ সরকারের আশঙ্কা ছিল, এই বিপ্লবের সংবাদ সেনাবাহিনীর ব্যারাকে প্রবেশ করলে তা ভারতীয় সেনাদের প্রভাবিত করবে এবং তার ফল হবে ব্রিটিশ সরকার ও তার সৈন্যবাহিনীর পক্ষে মারাত্মক। কিন্তু এখানেও তাদের প্রয়াস সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কঠোর লৌহবেষ্টনী ভেদ করে বলশেভিক বিপ্লবের সংবাদ এসে পৌঁছেছিল ব্রিটিশ ভারতীয়

সেনাবাহিনীর ব্যারাকে। আর এই সংবাদ সংগ্রহের ব্যাপারে সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন স্বয়ং নজরুল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কঠিনকঠোর সেন্সরশিপ ব্যবস্থাও হার মেনেছিল তাঁর কাছে। সেনা ব্যারাকে অবস্থানকালে নজরুল নানা পথে বলশেভিক বিপ্লব সম্পর্কে বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলামের বিশেষ স্নেহভাজন বন্ধু এবং 'কাজী নজরুল' নামে তিন খণ্ডের পুস্তকটির লেখক চুঁচুড়ার প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা নজরুলের সৈনিক জীবনের বিশিষ্ট বন্ধু ও সহকর্মী জমাদার শম্ভু রায়ের চিঠি থেকে জানা যায় যে, ব্রিটিশ সরকারের আপাতনিশ্ছিদ্র সেন্সরশিপ ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই ছিদ্র সৃষ্টি করে এবং এই কঠোর ব্যবস্থাকে হার মানিয়েই নজরুল বলশেভিক বিপ্লব এবং সোভিয়েত লাল ফৌজ সম্পর্কিত বিবিধ সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের লেখা থেকে এই বিষয়ে কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

> জমাদার শম্ভু রায়ের লেখা পত্র হতে আমরা জানতে পারছি যে করাচিতে তাঁদের ব্যারাকের প্রতি কর্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। যে-কোনো রকমের রাজনীতিক সাহিত্যের ব্যারাকে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সেন্সরিং-এর ব্যবস্থা ছিল অতি কঠোর। তবুও এই সব ব্যবস্থা নজরুলের নিকটে হার মেনেছিল। সে এমন গোপন পথ খুলেছিল যে যার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে নিষিদ্ধ পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা অবলীলাক্রমে ব্যারাকের ভিতরে প্রবেশ করত। রাওলাট বা সিডিশন কমিটির রিপোর্ট তাঁদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু জমাদার রায় সেই রিপোর্ট নজরুলের নিকটে দেখেছিলেন। রুশ বিপ্লব সম্বন্ধেও নিষিদ্ধ সাহিত্য নজরুলের হাতে এসেছিল। জমাদার রায় ও নজরুলের আরও কজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে নজরুল সে সাহিত্য দেখিয়েছিল। একদিন নজরুল তার নিজের ঘরের সামনে একটি উৎসব করেছিল। এই উৎসবের উপলক্ষ অক্টোবর বিপ্লব ছিল, না, লালফৌজের কোনো বিশিষ্ট জয়লাভ ছিল, তা জমাদার শম্ভু রায়ের পত্র হতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। আমার মনে হয় লালফৌজের কোনো বিশিষ্ট জয়লাভ উপলক্ষেই উৎসবটি হয়ে থাকবে। জমাদার রায় বলছেন ঃ
>
> "নজরুল তার বন্ধুদের মধ্যে যাদের বিশ্বাস করত তাদের এক সন্ধ্যায় খাবার নিমন্ত্রণ করে, অবশ্য এই রকম নিমন্ত্রণ প্রায়ই সে তার বন্ধুদের করত। কিন্তু ঐ দিন সন্ধ্যার পর তার ঘরে আমি ও নজরুলের অন্যতম বন্ধু তার অরগ্যান মাস্টার হাবিলদার নিত্যানন্দ দে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম অন্যান্য দিনের চেয়ে নজরুলের চোখে মুখে একটা অন্য রকমের জ্যোতি খেলে বেড়াচ্ছিল। উক্ত নিত্যানন্দ দে মহাশয়ের বাড়ী ছিল হুগলী শহরের ঘুটিয়া বাজার নামক পল্লীতে। তিনি অরগ্যানে একটা মার্চিং গৎ বাজানোর পর নজরুল সেই দিন যে-সব গান গাইল ও প্রবন্ধ পড়ল তা থেকেই আমরা

জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গান বাজনা প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লালফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং ঠিক নাম মনে নেই সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখায়। ঐ পত্রিকাতে আমরাও বিশদভাবে সংবাদটি দেখে উল্লসিত হয়ে উঠি। সে দিন সারা রাতই প্রায় হৈ হুল্লোড়ে আমাদের কেটে গিয়েছিল।" (১৯৫৭ সালের ৬ই জুন তারিখে চুঁচুড়ার প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত জমাদার শম্ভু রায়ের পত্র হ'তে উদ্ধৃত।)[৫]

বলশেভিক বিপ্লব এবং লাল ফৌজের সাফল্যের প্রভাবে সৈন্যবাহিনীতে অবস্থানকালীনই নজরুলেব দেশপ্রেম এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আন্তর্জাতিকতাবাদী চেতনা, তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলশেভিক মতাদর্শ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি। ফৌজে থাকাকালীনই তাঁর লেখা দুটি ছোট গল্প এই চেতনা ও আকর্ষণের সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে। ছোট গল্পদুটির নাম—'হেনা'[৬] ও 'ব্যথার দান'।[৭] তিনি সৈন্যবাহিনী থেকে ফিরে আসার পূর্বেই ছোটগল্প দুটি প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য়। নজরুলের 'হেনা' প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় ১৩২৬ সালের কার্তিক সংখ্যায় (অক্টোবর, ১৯১৯) এবং তাঁর 'ব্যথার দান' প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকার ১৩২৬ সালের মাঘ সংখ্যায় (জানুয়ারি, ১৯২০)। 'হেনা' গল্পটির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতা ও আন্তর্জাতিকতাবাদী চেতনা সমালোচকদের সাদা চোখে সর্বদা ধরা না পড়লেও এই গল্পটিতে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানসিকতা ও আন্তর্জাতিকতাবাদ নিহিত আছে, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। এই গল্পটির নায়ক প্রথমে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীতে থেকে ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধ করলেও শেষ পর্যন্ত সে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে স্বদেশের পক্ষেই, ইংরেজদের সৈন্যবাহিনী ছেড়ে এসে সে বন্দুকের নল ঘুরিয়ে দিয়েছে ইংরেজদের বিরুদ্ধেই, 'বুকের রক্তে' নিজের 'দেশকে রক্ষা' করার সংগ্রামে সে লিপ্ত হয়েছে। 'নিজের দেশের পায়ে' 'জীবনটা উৎসর্গ' করাকেই সে তার কাজ হিসাবে স্থির করে নিয়েছে।

নজরুলের আন্তর্জাতিকতাবাদী চেতনা এবং বলশেভিক মতাদর্শ, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লাল ফৌজের প্রতি আকর্ষণ স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে তাঁর 'ব্যথার দান' গল্পটিতে। এই গল্পটিতে দারা এবং সয়ফুল-মুলক—এই দুই প্রধান চরিত্রই তাদের ব্যর্থ প্রেমের উত্তরণ ঘটিয়েছে সোভিয়েত লালফৌজে যোগ দিয়ে, যাদের 'মহান নিঃস্বার্থ ইচ্ছা বিশ্বের অন্তরে অন্তরে শক্তি সঞ্চয় ক'রছে', 'মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা প্রণোদিত হ'য়ে' যারা 'উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রছে'। 'অচিন্ত্য অপূর্ব অসমসাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ' করেছে দারা শত্রুপক্ষের সঙ্গে, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী এবং বিপ্লব

বিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, 'ব্যথার দান' গল্পটি যেভাবে ছাপা হয়েছে, তাতে 'লালফৌজ' কথাটি নেই, পরিবর্তে 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের লেখা থেকে জানা যায় যে, নজরুল যখন 'ব্যথার দান' গল্পটি ছাপানোর জন্য প্রথমে পাঠিয়েছিলেন, তখন তাতে 'লালফৌজ' কথাটিই লেখা ছিল, কিন্তু রাজরোষ এড়ানোর জন্যই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ স্বয়ং 'লালফৌজ'-এর স্থানে 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল' কথাটি বসিয়ে দিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ প্রসঙ্গটি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের লেখা থেকেই উদ্ধৃত করা হল ঃ

> সয়ফুল মুল্ক্ ও দারা দুজনেই যোগ দিল লালফৌজে। অথচ 'ব্যথার দান' পুস্তকে আছে যে তারা মুক্তিসেবক সৈন্যদের দলে যোগ দিয়েছিল। এখানে আমার কিছু বলার আছে। নজরুল ইস্‌লাম যখন 'ব্যথার দান' গল্পটি আমাদের নিকটে পাঠিয়েছিল তখন তাতে এই দু'জনের লালফৌজে যোগ দেওয়ার কথাই অর্থাৎ আমি ওপরে যে উদ্ধৃতি দিয়েছি ঠিক সেই রকমই ছিল। আমিই তা থেকে 'লালফৌজ' কেটে দিয়ে তার জায়গায় 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল' বসিয়ে দিয়েছিলেম। ১৯১৯ সালে ব্রিটিশ ভারতে 'লালফৌজ' কথা উচ্চারণ করাও দোষের ছিল। সেই 'লালফৌজে' ব্রিটিশ ভারতের লোকেরা যে যোগ দেবে, তা যদি গল্পেও হয়, তা পুলিসের পক্ষে হজম করা মোটেই সহজ হতো না। একজন ভারতীয় সৈনিকের লেখা গল্পের নায়কেরা যদি 'লালফৌজে' যোগ দেয় তা হলে তার সৈনিক-শৃঙ্খলার দিক হতেও খুব ভালো হতো না। তাই আমি নজরুলকে জিজ্ঞাসা না করেও তার 'লালফৌজ' কথা কেটে দিয়েছিলেম। তার জায়গায় 'মুক্তিসেবক সৈন্যদের দল' এই ভেবে লিখে দিয়েছিলেম যে যাঁর যা খুশী তিনি তাই বুঝে নিবেন। আমার পরিবর্তনে সে খুব খুশী হয়ে আমায় ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র লিখেছিল। তারপরে, সে যখন কলকাতায় ছুটিতে এসেছিল তখনও শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সম্মুখে আবারও সে আমায় 'লালফৌজ' কথার পরিবর্তনের জন্যে ধন্যবাদ দিয়েছিল।[৮]

কাজী নজরুল ইসলামের 'ব্যথার দান' গল্পের দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র যে সোভিয়েত লালফৌজে যোগ দিয়েছিলেন, তা তাঁর নিছক কল্পনার বিলাস ছিল না, কারণ প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে অনুরূপ ঘটনা সেই সময়ে ঘটেছিল বলেই তিনি তাঁর গল্পের নায়কদের লালফৌজে যোগদানের কথা লিখতে পেরেছিলেন।

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'স্মৃতিকথা'র উপর ভিত্তি করে এবং ১৯৫৭ সালে মস্কোর ফরেন ল্যাংগুয়েজেস্ পাবলিশিং হাউস দ্বারা প্রকাশিত *In Common They Fought* শীর্ষক পুস্তক থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি সহকারে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন যে, সোভিয়েত লালফৌজের যে সব আন্তর্জাতিক ইউনিট দক্ষিণ রাশিয়াতে যুদ্ধ করছিলেন, তাঁদের মধ্যে বহু ভারতীয়ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এই

সমস্ত খবর ধীরে ধীরে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ ব্রিটিশ অফিসারদের বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও পুরু দেওয়াল-ঘেরা ব্যারাকের ভিতরেও বিপ্লবী ভাবধারা প্রবেশ করেছিল। ফলে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল এবং অচিরেই তাঁদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক সৈন্য তাঁদের বেয়নেট ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধেই তুলে ধরে সোজা সোভিয়েত লালফৌজে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন। লালফৌজে যোগদানকারী এই সকল ভারতীয় সৈনিক রুশদের কাছে গেরিলা যুদ্ধে প্রশিক্ষণ লাভ করে ক্রমে ক্রমে সেনাবাহিনীর অফিসার পদেও উন্নীত হয়েছিলেন। এতে তাঁদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। নূতন নূতন ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশ বাহিনী ছেড়ে এসে লালফৌজে যোগ দিলেন। লালফৌজের বিজয় অভিযানে এই সকল ভারতীয় সৈনিকের অবদান যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। লাল ফৌজের ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডভুক্ত ভারতীয় সৈন্যরা মাশ্‌হাদ-আশ্‌কাবাদ রোডের ধারে ধারে ব্রিটিশ সৈনিকদের অতর্কিত আক্রমণ করে একেবারে ব্যতিব্যস্ত ও অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন।[৯]

সুতরাং ১৯২০ সালের মার্চ মাসে সৈন্যবাহিনী থেকে ফিরে কলকাতায় এসে যখন নজরুল মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে একত্রে বসবাস শুরু করলেন, তখন তাঁর মধ্যে প্রবল স্বদেশপ্রেম ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদী মানসিকতার পাশাপাশিই অবস্থান করছে আন্তর্জাতিকতাবাদী চেতনা এবং বলশেভিক বিপ্লব, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সাম্যবাদী মতাদর্শের প্রতি আকর্ষণ। আর এই সবের পেছনে প্রধানত কাজ করেছিল তাঁর হৃদয়াবেগের প্রাবল্য। আর সেই কারণেই অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্দোলন গড়ে তোলার গোড়ার যুগে তিনি প্রাথমিক ভাবে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সহযোগী হয়েছিলেন।

অবিভক্ত বাংলায় প্রথম কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল কলকাতায়, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে কেন্দ্র করে। অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলার কাজের সূচনা তাঁর হাত ধরেই। তিনিই ছিলেন অবিভক্ত বাংলাব প্রথম ঘোষিত কমিউনিস্ট—অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্রষ্টা, এই আন্দোলনের পিতৃতুল্য নেতা। ভারতে কমিউনিস্ট মতাদর্শের আবির্ভাবের এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন বিকাশের যুগের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন তিনিই। তাঁর জীবন ইতিহাস সম্পর্কে বলা যেতে পারে, তা ছিল 'ভারতে কমিউনিস্ট ক্রিয়াকলাপের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস' (*'is the history of the origin and growth of the communist activity in India'*)[১০]। কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণের পূর্বে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ কোনও ধারার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গেই প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী লৌহ যবনিকা ভেদ করে আসা বলশেভিক বিপ্লবের সংবাদ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। চরম প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে তিনি শুরু করেছিলেন মার্ক্স, লেনিন ও বলশেভিক বিপ্লব সংক্রান্ত পুস্তক-

পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকার অনুসন্ধান, সচেষ্ট হয়েছিলেন মার্কস-লেনিনের লেখার সঙ্গে পরিচিত হতে, কমিউনিস্ট মতাদর্শ কি জানতে। নানাবিধ প্রতিকূলতা-প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এই বিষয়ে অধ্যয়নের কাজে, প্রয়োজনের তুলনায় গ্রন্থাদির প্রাপ্তি যতই অপ্রতুল হোক না কেন। ১৯২১ সালে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ অবলম্বন করলেন কমিউনিস্ট মতাদর্শ এবং নিজেকে নিয়োজিত করলেন কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার কাজে। কাজী নজরুল ইসলাম মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের এই প্রাথমিক প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। কোনও দিন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ না দিলেও ১৯২৫ সালে সারা ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে গঠিত ওয়ার্কাস্ অ্যান্ড্ পেজ্যান্ট্‌স্ পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন নজরুল। ১৯২২ সালে তাঁর প্রয়াসে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সঙ্গে পেলেন প্রথমে আব্দুর রেজ্জাক খাঁকে এবং তার পরে আব্দুল হালিমকে। উভয়েই যোগ দিয়েছিলেন অসহযোগ আন্দোলনে এবং এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিসাবে কারাবরণ করেছিলেন। আকস্মিকভাবে এই আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় তাঁরা নিরাশ হয়েছিলেন, আস্থা হারিয়েছিলেন গান্ধী নির্দেশিত পথে। বলশেভিক বিপ্লবের সংবাদ তাঁদেরও অনুপ্রাণিত করেছিল, তাঁরাও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণে। বিকল্প পথের অনুসন্ধান তাঁদের নিয়ে এসেছিল মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের কাছে, তাঁরা যুক্ত হয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রাথমিক প্রয়াসের সঙ্গে। ১৯২২ সালেই তাঁরা অর্জন করলেন কুতবুদ্দিন আহ্‌মদের উষ্ণ বন্ধুত্ব, তিনি সি.পি আই-তে যোগ দিয়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, যদিও প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ সহযোগী। বিশের দশকের মাঝামাঝি অন্যতম সদস্য হিসাবে শামসুল হুদা যোগ দিয়েছিলেন কলকাতার কমিউনিস্ট গোষ্ঠীতে।

তাশকন্দে প্রতিষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দুই প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখোপাধ্যায়। একত্রে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার কাজে যুক্ত থাকলেও পরে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে অবনী মুখোপাধ্যায়ের বিরোধ দেখা দিয়েছিল। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে সাহায্যের উদ্দেশ্যে নলিনী গুপ্ত ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর কলকাতা পৌঁছেছিলেন। নলিনী গুপ্ত কলকাতায় এসে প্রথমে অনুশীলন ও যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। সেবারে সেই চেষ্টা খুব সাফল্য লাভ করেনি। তিনি বাংলার প্রথম কমিউনিস্ট ও বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের জনক মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন। নলিনী গুপ্তর সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের যোগাযোগ কলকাতায় কমিউনিস্ট কাজকর্মের সূত্রপাত ঘটায়। নলিনী গুপ্তের মাধ্যমেই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

১৯২২ সালের মার্চ মাসে নলিনী গুপ্ত ফিরে যান। ১৯২২ সালের শেষভাগে নলিনী গুপ্ত কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে সাহায্যের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন। ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে একই উদ্দেশ্যে ভারতে আসেন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের বিরোধী অবনী মুখোপাধ্যায়। উভয়েই পৃথকভাবে অনুশীলন ও যুগান্তর বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা চালান। এই কাজে অবনী মুখোপাধ্যায়ের তুলনায় নলিনী গুপ্ত অধিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন। যুগান্তর বিপ্লবীদের কাছে দুজনের কেউই সেভাবে গ্রহণযোগ্য হন নি। অনুশীলন বিপ্লবীদের সঙ্গে দুজনেরই যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল, তবে অনুশীলন বিপ্লবীদের উপর প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারে নলিনী গুপ্ত ছিলেন অধিক সফল। ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে অবনী মুখোপাধ্যায় ফিরে যান। জাতীয় বিপ্লববাদ থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ পর্বে মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায় ও বিশেষ করে নলিনী গুপ্তের ভূমিকা নিঃসন্দেহে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

১৯২০ সালে সাংবাদিকতার কাজে প্রবেশের মধ্য দিয়েই নজরুলের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। এই ব্যাপারে তিনি ছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সহযাত্রী ও সহযোগী। স্বয়ং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের লেখা থেকেই জানা যায় যে, সাংবাদিকতার জীবন শুরু করার মাধ্যমেই নজরুলের সক্রিয় রাজনীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ।[১১] তিনি খুব পরিষ্কার ভাবেই লিখেছেন, '১৯২০ সাল হতে খবরের কাগজ চালানোর ভিতর দিয়ে নজরুল ইসলাম আর আমি রাজনীতি করেছি।'[১২]

১৯২০ সালের ১২ জুলাই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কাজী নজরুল ইসলামের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত হল সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা 'নবযুগ'।[১৩] কাগজটির মালিক ছিলেন এ কে ফজলুল হক। কৃষক ও শ্রমিকদের কথা লেখা কাগজটির নীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। জনগণের সমস্যাবলীর দিকে পত্রিকাটির দৃষ্টি ছিল। খুব চড়া মেজাজের লেখা প্রকাশিত হত 'নবযুগ' কাগজে, সুর ছিল প্রবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও আক্রমণাত্মক। একইসঙ্গে শ্রমিক-কৃষকের প্রতি সহমর্মিতাও প্রকাশ পেত এই পত্রিকায। নজরুলের জোরালো লেখার গুণে কাগজটি প্রথম থেকেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। চড়া মেজাজের লেখার জন্য 'নবযুগ' বেশ কয়েকবার সরকার কর্তৃক সতর্কিত হয়েছিল। শেষবার সতর্কিত হয়েছিল 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' লেখাটির জন্য। প্রবন্ধটি তার আক্রমণাত্মক চরিত্রের জন্য ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কাছে অসহ্য বোধ হয়েছিল। এই পত্রিকাতেই 'ধর্মঘট' শিরোনামে নজরুলের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু থেকেই পরিষ্কার ১৯২০ সালেই মেহনতী জনগণের প্রতি নজরুলের আকর্ষণ ছিল কতখানি প্রবল। ১৯২০ সালে সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক ধর্মঘট চলছিলই। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই লেখা এই প্রবন্ধে মেহনতী জনগণের প্রতি নজরুলের সহমর্মিতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। ১৯২১ সালের জানুয়ারি মাসে এই 'নবযুগ' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।[১৪]

১৯২১ সালের শেষভাগ থেকেই নজরুল রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত

হয়েছিলেন। আর সেই রাজনীতি ছিল শ্রমিক-কৃষকের রাজনীতি, সাম্যবাদী মতাদর্শকে বাস্তবে রূপদানের প্রয়াসের রাজনীতি। কল্পতরু সেনগুপ্তের লেখা থেকে জানা যায় যে, শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠন করার কাজে কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২১-২২ সাল থেকেই সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া শুরু করেছিলেন।[১৫] এই সময়ই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গেই নজরুলও আকৃষ্ট হয়েছিলেন কমিউনিজমের প্রতি। তাঁর 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন, '১৯২১ সালের শেষাশেষিতে আমরা মার্কসবাদের পড়াশুনা করব বলে স্থির করেছিলেম। কিছু পুঁথি-পুস্তকও সেই সময়ে কিনেছিলেম।'[১৬] তাঁর 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা-তেও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন, '১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে নজরুল আর আমি ঠিক করি যে আমরা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে এগিয়ে যাব। পড়াশুনা করব বলে সামান্য কিছু পুঁথি-পুস্তকও কিনেছিলাম।'[১৭]

১৯২১ সালের শেষভাগে অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের একেবারে প্রাথমিক প্রয়াসে নজরুল ছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সহযোগী। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রতিনিধি হিসাবে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে সাহায্যের উদ্দেশ্যে নলিনী গুপ্ত ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর কলকাতা পৌঁছেছিলেন।[১৮] তাঁর ভারতে আসার উদ্দেশ্য ছিল দুটি। এই দুটি উদ্দেশ্যই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। প্রথমটি ছিল সেই যুগে ভারতে অবস্থিত বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং দ্বিতীয়টি ছিল-সম্ভব হলে জাতীয় বিপ্লবীদের কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট করে কমিউনিস্ট মতাদর্শে দীক্ষিত করা। কলকাতায় এসে পৌঁছনোর কিছুদিনের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯২১ সালেরই ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে নলিনী গুপ্ত গোপনে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[১৯] প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ নিয়ে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও নজরুলের সঙ্গে নলিনী গুপ্তের সুদীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল।[২০] নলিনী গুপ্তের সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কাজী নজরুল ইসলামের এই যোগাযোগ কলকাতায় কমিউনিস্ট কাজকর্মের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। অবশ্য এর পরে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ও কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কাজকর্মের সঙ্গে নজরুল আর প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকেন নি, কিন্তু একেবারে প্রাথমিক প্রয়াসে তিনি মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সাথী হিসাবেই ছিলেন। নলিনী গুপ্তের মাধ্যমেই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।[২১] এই যোগাযোগের ফলে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তরফ হতে ভারতের ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়ও নজরুল সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন এবং ১৯২২ সালেই তিনি এমনকি নজরুলকে ইউরোপে পাঠিয়ে দেওয়ার কথাও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকে লিখেছিলেন।[২২]

১৯২২ সালের আগস্ট মাসে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ

করল 'ধূমকেতু' পত্রিকা। পত্রিকাটি ছিল অর্ধ-সাপ্তাহিক অর্থাৎ সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত হত। তাঁর কাগজের নামকরণ করেছিলেন নজরুল নিজেই। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৬ শ্রাবণ। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশের ইংরাজি তারিখটি ঠিক কি ছিল, সেই নিয়ে বিতর্ক আছে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন, '১২ই আগস্ট (১৯২২) তারিখে "ধূমকেতু"র প্রথম সংখ্যা বা'র হলো।'[২৩] প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ও ১২ আগস্ট ১৯২২ তারিখেই 'ধূমকেতু' প্রথম প্রকাশিত হওয়ার কথা লিখেছেন।[২৪] অপরদিকে শিশির কর সরকারি তথ্যের উপর অর্থাৎ গোয়েন্দা দপ্তরের গোপন রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তাঁর 'নিষিদ্ধ নজরুল' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট (১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২৬ শ্রাবণ) 'ধূমকেতু' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।[২৫] বাংলা সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ সহকারী এইচ গ্রীনফিল্ড ১৯২৪ সালের ১৯ জুন বাংলা সরকারের আন্ডার সেক্রেটারী আর এইচ হুটচিংসকে যে তথ্য পাঠিয়েছিলেন, তাতে ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট থেকে 'ধূমকেতু'র সূত্রপাত হওয়ার কথাই উল্লিখিত হয়েছে। (File No. 138, Serial Nos.1-5, Annual Report on Newspapers and Periodicals Published in Bengal During 1922) ।[২৬] কল্পতরু সেনগুপ্তও লিখেছেন, '১৯২২ সালের ১১ই আগস্ট কাজী নজরুল ইসলাম "ধূমকেতু" পত্রিকা বার করেন'।[২৭]

'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশের লগ্নে নজরুল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে আশীর্বাণী চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পাঠানো এই আশীর্বাণী ছাপানো হয়েছিল 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই প্রথম পৃষ্ঠার উপরের দিকে। শুধু প্রথম সংখ্যাতেই নয়, 'ধূমকেতু'র প্রতিটি সংখ্যাতেই এই আশীর্বাণীটি একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায় পত্রিকার নামের ঠিক নীচে ছাপানো হত। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ভাষায় রবীন্দ্রনাথের পাঠানো এই আশীর্বাণীটি ছিল 'নজরুলের প্রতি তাঁর রাজনীতিক আশীর্বাদ'।[২৮]

রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী মাথায় নিয়ে প্রকাশিত 'ধূমকেতু' একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই পাঠক মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তৎকালীন বাংলার বিশিষ্ট সব মহলই 'ধূমকেতু'কে বিশেষভাবেই স্বাগত জানিয়েছিল। পত্রিকার অষ্টম সংখ্যা (১২ সেপ্টেম্বর ১৯২২) থেকে সম্পাদক অভিধাটির পরিবর্তে 'সারথি' অভিধাটি ব্যবহৃত হওয়া শুরু হল। 'ধূমকেতুর'র 'সারথি'—কাজী নজরুল ইসলাম। পত্রিকার সম্পাদককে 'সারথি' হিসাবে চিহ্নিত করা ছিল নজরুলের একান্ত ভাবেই নিজস্ব স্টাইল। বাংলা সংবাদ-পত্র বা পত্রিকার ক্ষেত্রে, নজরুলের 'ধূমকেতু'র আগে বা পরে, এমন জিনিস আর কখনও দেখা যায় নি। পুরো বিষয়টিই নজরুলের আকর্ষণীয় সাংবাদিক মেজাজেরই এক পরিচয় বহন করে।

'ধূমকেতু' পত্রিকা সম্পাদনা এবং এই পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে নজরুল বিপ্লবী সাংবাদিকতার এক অসামান্য নিদর্শন রেখেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি এবং সামাজিক বৈষম্যসমূহের বিরুদ্ধে

দেশের মানুষকে সজাগ করার কাজে এই পত্রিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। 'ধূমকেতু' একদিকে যেমন বাংলার জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের সমর্থন পেয়েছে, অপরদিকে তেমনই সাম্যবাদী মতাদর্শ ও চিন্তাধারার মানুষদেরও সমর্থন পেয়েছে। একদিকে যেমন প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতা ভূপতি মজুমদার এই পত্রিকার সমর্থক ছিলেন, অপরদিকে আবার তেমনই অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্রষ্টা মুজফ্ফর আহ্‌মদও এই পত্রিকার শুভানুধ্যায়ী ছিলেন এবং 'দ্বৈপায়ন' নামে এই পত্রিকায় বিবিধ লেখা লিখেছেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে নজরুলের বিপ্লবী সত্তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছিল। 'ধূমকেতু' ছাত্র-যুব সমাজকে বিপ্লবের পথে আহ্বান জানিয়েছিল। 'ধূমকেতু'তে প্রকাশিত লেখাগুলি থেকে পরিষ্কার যে, তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষপাতী ছিলেন, অহিংসার পথে স্বাধীনতা আসতে পারে, এই বিশ্বাস তাঁর ছিল না। যাঁরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে বা দরকষাকষি করে 'স্বরাজ' লাভের কথা বলেন, তাঁদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাতে ধরাশায়ী করে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন বিপ্লবের পতাকা উড্ডীন রাখবার কথা। মুজফ্ফর আহ্‌মদের মতে, '১৯২৩-২৪ সালে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন আবার যে মাথা তুলল, তাতে নজরুলের অবদান ছিল, একথা বললে বোধহয় অন্যায় করা হবে না। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দু'টি বড় বিভাগের মধ্যে 'যুগান্তর' বিভাগের সভ্যরা তো বলছিলেন, "ধূমকেতু" তাঁদেরই কাগজ'।[২৯]

একই সঙ্গে নজরুল বিশ্বাস করতেন, জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত বিপ্লব কখনও সাফল্য অর্জন করতে পারে না। তিনি মনে করতেন, যদি সকলের জন্য অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষার ব্যবস্থা না করা যায়, এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিপুল ফারাক, এই বৈষম্যমূলক অসম ব্যবস্থার অবসান না হয়, তবে স্বাধীনতা অবশ্যই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কল্পতরু সেনগুপ্তের অভিমত অনুযায়ী, 'একই সময়ে "ধূমকেতু" শ্রমিক-কৃষকের সংগঠনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শ্রমিক-কৃষকের অংশগ্রহণ ছাড়া বিপ্লব সম্পূর্ণ হয় না, স্বাধীনতা আসে না, এই বিশ্বাস প্রকাশ করেছে।'[৩০]

'ধূমকেতু'র অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ হানা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা। মুসলমান সমাজকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রয়াসে 'ধূমকেতু'র মাধ্যমে নজরুল নিরন্তর তাঁর লেখনী চালনা করেছেন।

'ধূমকেতু'র পাতায় নজরুল সরাসরি তুলেছিলেন 'পূর্ণ স্বাধীনতা'র দাবি। ১৯২২ সালের ১৩ অক্টোবর প্রকাশিত 'ধূমকেতু' পত্রিকার প্রথম বর্ষের ত্রয়োদশ সংখ্যায় 'ধূমকেতুর পথ' শীর্ষক প্রবন্ধে নজরুল দ্ব্যর্থহীনভাবে লিখেছিলেন ঃ

সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়।

স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেন না, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে

> থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসন-ভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে বোঁচকা-পুঁটলি বেঁধে সাগরপারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনও। আমাদেরও এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।
>
> পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়ম-কানুন-বাঁধন-শৃঙ্খল-মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে।
>
> আর এই বিদ্রোহ করতে হলে সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে, 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।' বলতে হবে, 'যে যায় যাক সে, আমার হয় নি লয়।[৩১]

সেই যুগে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে এমন একটি জ্বালাময়ী লেখার জন্য যে অপরিসীম সাহসের প্রয়োজন ছিল, তা নজরুলের পর্যাপ্ত পরিমাণেই ছিল। তাঁর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লবী মানসিকতার সুস্পষ্ট পরিচয়বাহী 'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর এই সময়কার বিভিন্ন লেখা। 'ধূমকেতু'র অগ্নিবর্ষী লেখাগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ক্রুদ্ধ করে তোলার পক্ষে যথেষ্টই ছিল। ফলে রাজরোষ নেমে এসেছিল নজরুল এবং তাঁর 'ধূমকেতু'র উপর। নজরুলকে আর বেশিদিন 'ধূমকেতু' চালাতে দেয়নি ব্রিটিশ সরকার। 'ধূমকেতু' পত্রিকার ১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল 'আনন্দময়ীর আগমনে'[৩২] নামে তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্যঙ্গ ও শ্লেষে পরিপূর্ণ নজরুলের একটি আগুন ঝরানো কবিতা। ঐ একই সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' নামে একটি ছোট প্রবন্ধ। প্রবন্ধটির লেখিকা ছিলেন লীলা মিত্র নামে এক এগারো বছরের বালিকা। নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' নামক কবিতাটি এবং লীলা মিত্রের 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ' শীর্ষক ছোট প্রবন্ধটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রোষানলে পড়ে নিষিদ্ধ হল, এবং এই দুটি লেখার কারণে 'ধূমকেতু' পত্রিকার ১৯২২ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সংখ্যাটি ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটির জন্য রাজদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন নজরুল। ১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁকে বিচারার্থে পুলিস পাহারায় কলকাতায় আনা হল এবং তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা শুরু করা হল। ১৯২৩ সালের ১৭ জানুয়ারি কলকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট্ সুইন্‌হোর রায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ও ১৫৩ নং ধারা অনুযায়ী নজরুল এক বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।[৩৩] আদালতে আত্মপক্ষ

সমর্থন করে নজরুল একটি লিখিত বিবৃতি পেশ করেছিলেন। ঐতিহাসিক মূল্যসমৃদ্ধ এই লিখিত বিবৃতিটি 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' [৩৪] নামে 'ধূমকেতু' পত্রিকার ১৯২৩ সালের ২৭ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংখ্যাটিই ছিল 'ধূমকেতু'র বত্রিশতম ও সর্বশেষ সংখ্যা। নজরুল গ্রেপ্তার হওয়ার পর 'ধূমকেতু'র সম্পাদক হয়েছিলেন অমরেশ কাঞ্জিলাল। তাঁকেও একবার জেলে যেতে হওয়ায় কয়েকটি সংখ্যার সম্পাদনা করেছিলেন বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

কাজী নজরুল ইসলামই ছিলেন প্রথম সাহিত্যিক, যাঁকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনকালে কবিতা লেখার জন্য কারাবাস করতে হয়েছিল। এই বিষয়ে নজরুল ছিলেন অনন্য। তাঁর 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে স্বীকৃত, এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পীচেতনার এক মহৎ কণ্ঠস্বর ও অসামান্য দলিল। প্রেসিডেন্সি জেলে অবস্থানকালে ১৯২৩ সালের ৭ জানুয়ারি তিনি এটি লিখেছিলেন।

১৯২৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর নজরুল জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশিত হওয়ার পরিণতিতে নজরুলের কারাবাস প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তরফ থেকে ভারতের ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় নজরুলকে ইউরোপে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা লিখেছিলেন মুজফ্ফর আহ্‌মদকে। নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারি হওয়ার ঠিক আগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে, এইরকম নানাবিধ খবর আসা শুরু হয়েছিল। সেই সময় মুজফ্ফর আহ্‌মদ তাঁকে ইউরোপে চলে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মুজফ্ফর আহ্‌মদ নজরুলকে জানিয়েছিলেন, ইউরোপে পাঠানোর ব্যবস্থা করা খুবই শক্ত হলেও নজরুল সম্মত হলে তিনি সে ব্যাপারে চেষ্টা করে দেখবেন। কিন্তু নজরুল ইউরোপে যাওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হন নি, কারণ তাঁর বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। [৩৫]

'ধূমকেতু' কোনও মতেই কমিউনিস্ট পত্রিকা ছিল না। অবশ্যই 'ধূমকেতু'র লেখা জঙ্গী প্রতিবাদী লেখা, কিন্তু এই পত্রিকার মূল সুরটিই ছিল তীব্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী। বলশেভিক বিপ্লব পরবর্তী তখনকার নতুন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন খবর 'ধূমকেতুর' বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই ছাপতো। বার্লিনে কমিউনিস্টদের মিছিলের ও সেই মিছিল সংক্রান্ত ব্যাপারে পুলিসের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সংঘর্ষের সংবাদও প্রকাশিত হয়েছিল 'ধূমকেতুর'র পাতায়, এবং নজরুলের অননুকরণীয় লেখনীতে ও তাঁর সংবাদ পরিবেশনের নিজস্ব স্টাইলে সহমর্মিতাও পোষণ করা হয়েছিল সেই কমিউনিস্টদের প্রতি। সাম্যবাদী মতাদর্শের প্রতি আকর্ষণের কারণে শ্রমিক-কৃষকের সংগঠনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে 'ধূমকেতু'র পাতায়, এবং শ্রমিক-কৃষকের অংশগ্রহণ ছাড়া বিপ্লব সম্পূর্ণ হয় না ও স্বাধীনতা আসে না, এই বিশ্বাসও প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও

'ধূমকেতু'কে কোনও ভাবেই কমিউনিজম প্রচারের এক উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না এবং কমিউনিস্ট পত্রিকার পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ঠিক সেই কাজটাই করেছিল। ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ 'ধূমকেতু'কে শুধুমাত্র একটি 'উগ্রপন্থী সংবাদপত্র' [৩৬] হিসাবে চিহ্নিত করেই ক্ষান্ত হয় নি, তারা 'ধূমকেতু'র মধ্যে আবিষ্কার করেছিল তাদের চিরশত্রু কমিউনিজমের ভূত। আর তাই গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে 'ধূমকেতু' সরাসরি অভিহিত হয়েছিল 'কমিউনিস্ট পত্রিকা' হিসাবে। সেই গোয়েন্দা রিপোর্টের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

> (f) The following definitely communist publications have been started within recent months in India : The *Atma Sakti, Dhumketu, Desher Bani* (vernacular papers mostly run by revolutionaries in Bengal), [৩৭]

একইভাবে 'ধূমকেতু'কে সরাসরি 'কমিউনিস্ট পত্রিকা' হিসাবে চিহ্নিত করে অপর একটি গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টেও লেখা হয়েছে ঃ

> In the autumn of 1922 the following definitely communist publications were in existence.
> "*Atma Sakti*", "*Dhumketu*", "*Desher Bani*" (mostly run by former revolutionaries of Bengal) [৩৮]

'ধূমকেতু' যে কমিউনিস্ট পত্রিকা ছিল না, সে কথা তো আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর 'আত্মশক্তি' ও 'দেশের বাণী' তো কমিউনিস্ট পত্রিকা হওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না, কারণ উভয়ই ছিল সম্পূর্ণভাবেই জাতীয়তাবাদী পত্রিকা।

'ধূমকেতু'কে শুধুমাত্র 'কমিউনিস্ট পত্রিকা' বলেই উল্লিখিত করা হয় নি, গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে কলকাতার কমিউনিস্ট গ্রুপ ও 'ধূমকেতু' পত্রিকা গ্রুপের কথা একসঙ্গেই লেখা হয়েছে, যার থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের চোখে 'ধূমকেতু' পত্রিকা গোষ্ঠী ছিল কলকাতায় কমিউনিস্টদের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও চরিত্রগত ভাবে কমিউনিস্ট। এই ধরনের দুটি প্রায় একই রকমের গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

> It was Roy's intention to send Jotin Mitter to India, with the mission of getting in touch with 'the Calcutta Communists and the "Dhumketu"group', as well as with Roy's 'centres', in India– ... [৩৯]

দ্বিতীয় উদ্ধৃতাংশটি প্রথম উদ্ধৃতাংশটির অনুরূপই বলা চলে ঃ

> About the same time Jotin was instructed by Roy that he should get into touch with the Calcutta Communist and the "Dhumketu" newspaper group, ... [৪০]

বাংলা সরকারের ইন্টেলিজেন্স্ ব্রাঞ্চের ১০৯/১৯২৩ নম্বর ফাইলে বলশেভিক মতাদর্শ প্রচারের কাজে লিপ্ত হিসাবে তৎকালীন বাংলা দেশের যে সকল পত্র-পত্রিকার তালিকা দেওয়া আছে ('Newspapers and periodicals in Bengal which advocate Bolshevism'), তাতে একেবারে প্রথমেই নজরুলের 'ধূমকেতু'র উল্লেখ করে লেখা হয়েছিল ঃ

> 1. *The Dhumketu* :- Its editor Nazrul Islam has since been convicted u/s 124 I. P. C. ... and sentenced to 1 yrs R.I. Amaresh Kanjilal who succeeded Nazrul as the editor has also been prosecuted u/s 124 I.P.C. The case is pending.

এই নোটটির উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদের বাঁ দিকের মার্জিনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জনৈক মিঃ রবার্টসনকে এই বলে নির্দেশ দিয়ে লিখেছিলেন যে, 'These notes may be placed in the new "Bolshevik" file you have opened'. সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর 'ধূমকেতু'কে বলশেভিক মতাদর্শ প্রচারের একটি মাধ্যম হিসাবেই মনে করত এবং এই বিষয়ে যাবতীয় সংবাদ একত্র করে একটি আলাদা ফাইল খোলার কথাও বলা হয়েছিল।[৪১]

অধ্যাপক লাডলীমোহন রায়চৌধুরীর লেখা থেকে জানা যায় যে, ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ নজরুল শুধুমাত্র পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেই বলশেভিক মতাদর্শ বা কমিউনিজম প্রচারের কাজে লিপ্ত মনে করেই ক্ষান্ত ছিল না, তারা মনে করত, নজরুল স্বয়ং সক্রিয়ভাবে কমিউনিস্ট সংগঠন গড়ে তোলার কাজে ব্যাপৃত আছেন ও তিনি বলশেভিক আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি ভাবে যুক্ত। এ বিষয়ে তারা অনেক মনগড়া রিপোর্টও তৈরি করেছিল। এই রকম অজস্র মনগড়া গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টের মধ্যে একটির উল্লেখ করা হল, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক ছিল না ঃ

> Vigorous attempts should be made to bring to light Kazi Nazrul Islam's connection with Hindu revolutionaries and the Bolshevik movement. It is said that he has got a revolutionary party under him in Comilla. His wife is a woman (Hindu) of Comilla and it is probable that he has got his gang in that loyalty.[৪২]

স্ত্রী প্রমীলার সাহায্যে কুমিল্লায় নজরুলের গোপনে বিপ্লবী দল গঠন সম্পর্কিত গোয়েন্দা দপ্তরের যাবতীয় তথ্য ছিল কষ্টকল্পিত ও বাস্তবতাবিবর্জিত।

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর নজরুল অবশ্যই ক্রমশ অধিক মাত্রায় ঝুঁকছিলেন সাম্যবাদী মতাদর্শের দিকে। পরিপূর্ণভাবে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ করে কমিউনিস্ট তিনি কখনওই হয়ে ওঠেন নি এবং কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনের অভ্যন্তরেও তিনি কোনও দিনই আসেন নি। কিন্তু সাম্যবাদী মতাদর্শের প্রতি তাঁর আকর্ষণের প্রমাণ মেলে তাঁর বিশের দশকের মধ্যভাগের ও শেষভাগের বিভিন্ন লেখায়। সাম্যবাদী

মতাদর্শের প্রতি তাঁর আকর্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে কাজ করেছিল তাঁর উপরে মুজফ্ফর আহ্মদের প্রভাব। নজরুল যখন জেল থেকে বেরোলেন, মুজফ্ফর আহ্মদ তখন কারাগারের অভ্যন্তরে। ১৯২৩ সালের ১৭ মে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ।[৪৩] 'কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা'য় তাঁর চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল। অসুস্থতার কারণে তিনি ১৯২৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর বিনা শর্তে জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।[৪৪] ১৯২৫ সালের ২৫ থেকে ২৮ ডিসেম্বর কানপুরে অনুষ্ঠিত ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে তিনি কলকাতা ফিরেছিলেন ১৯২৬ সালের ২ জানুয়ারি।[৪৫]

কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি নজরুলের আকর্ষণের সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে তাঁর 'মৃত্যু-ক্ষুধা' নামক উপন্যাসটি।[৪৬] তাঁর কৃষ্ণনগরে বসবাসকালেই এই উপন্যাসটি মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যা (নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯২৭) থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল-মে, ১৯৩০)। ম্যাক্সিম গোর্কির *Lower Depths*-এর মতই নজরুলের 'মৃত্যু-ক্ষুধা' উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে নিচু তলার মানুষের জীবন চিত্র। এই উপন্যাসের পটভূমিকা বিশের দশকের শ্রমিক জীবন ও সাম্যবাদী আন্দোলন, যদিও উপন্যাসটিতে আন্দোলনের বিশেষ কিছু প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায় না। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক আনসার একজন কমিউনিস্ট—সে শ্রমিক নেতা। কমিউনিস্ট আনসার শ্রমিক-কৃষকের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, শ্রমিক-কৃষককে সংগঠিত করাই তার কাজ। সে কৃষ্ণনগরে এসেছে একটি বিশেষ কাজ নিয়ে। তার মুখ থেকেই কাজের কথাটা শোনা যাক ঃ

> এখানে একটা শ্রমিকসঙ্ঘ গড়ে তুলতে এসেছি। প্রত্যেক জেলায় আমাদের শ্রমিকসঙ্ঘের একটা ক'রে শাখা থাকবে। আপাতত সেই মতলবেই ঘুরে বেড়াচ্ছি সব জায়গায়। এখানে হয়ত মাসখানেক বা তারও বেশী থাকতে হবে। এই ত ময়মনসিংহ-এ দু'মাস থেকে এলাম।[৪৭]

এর পরবর্তী দু-তিন দিন আনসারের কিভাবে কেটেছে দেখা যাক ঃ

> এরপর দু'তিন দিন কেটে গেছে। এবং এই দু'তিন দিন আনসার গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান, ঘোড়ার গাড়ীর কোচোয়ান, রাজমিস্ত্রী, কুলি-মজুর, মেথর প্রভৃতিদের নিয়ে টাউনে একটা রীতিমত হুলুস্থুল বাধিয়ে তুলেছে। শহরময় গুজব রটে গেছে যে, রাশিয়ার বলশেভিকদের গুপ্তচর এসেছে লোক ক্ষেপাতে। সরকারী কর্তাদের মধ্যেও এ নিয়ে কানাঘুষা চলছে। ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, মিউনিসিপ্যালিটি, এমন কি, কংগ্রেসওয়ালারা পর্যন্ত আনসারকে কেমন বাঁকা চোখে বাঁকা মন দিয়ে দেখতে শুরু করেছে। সেদিকে আনসারের ভ্রূক্ষেপও নাই। সে সমান উদ্যমে মোটরের চাকার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।[৪৮]

আনসার 'জানে শুধু কার্ল-মার্ক্স, লেনিন, ট্রটস্‌কি, স্টালিন, কৃষক, শ্রমিক, পরাধীনতা, অর্থনীতি,'[৪৯] আর তার বুকভরা আছে 'পীড়িত মানবাত্মার জন্য বেদনাবোধ'।[৫০] কিছুদিনের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকারের পুলিস গ্রেপ্তার করল আনসারকে, কারণ 'আনসার রাশিয়ার বল্‌শেভিক-চর ও বিপ্লবী-নেতা। সে ছেলেদের মধ্যে কম্যুনিস্ট মতবাদ প্রচার করছিল এবং তাদের বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করছিল'।[৫১] 'আনসারের ধৃত হওয়ার সংবাদ শহরময় রাষ্ট্র হয়ে' পড়ায় 'দলে দলে মেথর-কুলি, গাড়োয়ান-কোচোয়ান, কৃষক-শ্রমিকের দল'[৫২] ছুটে এসেছিল আনসারকে মুক্ত করতে। তাদের ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আনসার তাদের কাছে তার শেষ আহ্বান রেখেছিল ঃ

> ...যদি আসতেই হয় আমার পথে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এসো আমার পিছনে। বিপুল বন্যার বেগে এসো, এক মুহূর্তের জোয়ারের রূপে এসো না। আমি ভেসে চললুম, দুঃখ নেই, কিন্তু তোমরা এসো। নমস্কার![৫৩]

শ্রমিক-কৃষকের অংশগ্রহণসঞ্জাত গণবিপ্লবের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা লাভে নজরুলের আস্থা ও বিশ্বাস এখানে পরিষ্কার।

সাম্যবাদী মতাদর্শের প্রতি তাঁর আকর্ষণের এবং নিম্নবর্গের প্রতি তাঁর সহমর্মিতার ও তাদের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা বোধের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বিভিন্ন কবিতাতেও। 'ঝড় (পশ্চিম-তরঙ্গ)[৫৪] নামক তাঁর কবিতাটিতে তিনি ঝড়কে উন্নীত করেছেন লাল বিপ্লবের প্রতীকে—

> ঝড় কোথা? কই?
> বিপ্লবের লাল-ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ—[৫৫]

বিখ্যাত 'ইন্টারন্যাশনাল' বা 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীতটির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন নজরুল, নাম দিয়েছিলেন 'অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত'।[৫৬] এই 'অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত' -এই ঘোষিত হয়েছে এই দৃঢ় প্রত্যয়—

> ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী![৫৭]

'অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত'-টি প্রকাশিত হয়েছিল 'গণবাণী' পত্রিকায়। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন, এটি প্রকাশিত হয়েছিল 'গণবাণী' পত্রিকার ১৯২৭ সালের ২১ এপ্রিল সংখ্যায়।[৫৮] অপরদিকে অধ্যাপক লাডলীমোহন রায়চৌধুরীর লেখায় আমরা পাই, 'গণবাণী' পত্রিকায় নজরুলের 'অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৭ সালের ২৯ এপ্রিল।[৫৯] এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা যেতে পারে নজরুলের সুবিখ্যাত 'সাম্যবাদী'[৬০] কবিতাটির। নানা উপ-শিরোনামে বিভক্ত নজরুলের 'সাম্যবাদী' একটি বিরাট কবিতা। 'ঈশ্বর', 'মানুষ', 'পাপ', 'বারাঙ্গনা', 'নারী' ও 'কুলি-মজুর' এই দীর্ঘ কবিতাটির বিভিন্ন উপ-শিরোনাম। এই কবিতাটির মূল সুর হল 'সাম্য', সারা কবিতাটি জুড়েই কবি গেয়েছেন 'সাম্যের গান'। নজরুলের এই প্রখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর

'লাঙল' পত্রিকার একেবারে প্রথম সংখ্যায়। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ শুনেছেন, 'সাম্যবাদী' তখনই রুশ ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল।[৬১] নজরুলের 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান', 'ধীবরের গান', 'শ্রমিক মজুর', 'চাষার গান', 'শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র' প্রভৃতি বিভিন্ন কবিতার উল্লেখও এই প্রসঙ্গেই করা যেতে পারে।[৬২]

জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই নজরুল রাজনীতিতে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকেন। তাঁর গতিবিধি কেবল সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সভা-সমিতির মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ থাকল না। তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপও সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের পরিধির বাইরে এসে আরও বৃহত্তর রূপ ধারণ করল। এই সময়েই তিনি বাংলা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়াও শুরু করেছিলেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এই সময় থেকেই গোয়েন্দা পুলিসের গুপ্তচরেরা তাঁর পেছনে ঘোরা শুরু করেছিল। ১৯২৬ সালে নজরুল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

এই সক্রিয় রাজনীতি করার সুবাদেই কাজী নজরুল ইসলাম সাম্যবাদী চিন্তাধারা প্রচারের সাধারণ মঞ্চ হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন লেবার-স্বরাজ পার্টিতে। শ্রমিক-কৃষকের রাজনীতি করার উদ্দেশ্যে এবং সাম্যবাদী চিন্তাধারা প্রচারের সাধারণ এক মঞ্চ হিসাবে এই দলটি গঠিত হয়েছিল। নজরুল এই দলের গঠনপর্বে বিশেষ ভাবেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর সারা ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ওয়ার্কার্স্ অ্যান্ড্ পেজ্যান্ট্‌স্ পার্টি গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার সময় এই পার্টির নাম ছিল লেবার-স্বরাজ পার্টি অফ্ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। পার্টির বাংলায় নাম ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায় বা ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দল।[৬৩] একমাত্র অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের লেখাতেই এই দলটির নাম পাওয়া যাচ্ছে লেবার-পেজ্যান্ট্-স্বরাজ পার্টি অফ্ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস,[৬৪] অন্যান্য সব লেখাতেই দলটির নাম উল্লিখিত হয়েছে—লেবার-স্বরাজ পার্টি অফ্ দি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। কুতবুদ্দিন আহ্‌মদ, হেমন্তকুমার সরকার, কাজী নজরুল ইসলাম এবং শামসুদ্দিন হুসেন ছিলেন লেবার-স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। আব্দুল হালিমও এই দল গঠনের উদ্যোগীদের অন্যতম ছিলেন।[৬৫] 'কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা'য় দণ্ডিত কমিউনিস্ট মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ১৯২৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ছাড়া পান এবং ১৯২৬ সালের ২ জানুয়ারি কলকাতায় ফেরার অব্যবহিত পরেই এই দলে যোগ দেন।[৬৬] বেশ কয়েকজন তরুণ রাজনৈতিক কর্মী যোগ দিয়েছিলেন এই দলে। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সদ্য কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণকারী সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দলে যোগ দিয়েছিলেন ১৯২৬ সালের গোড়ার দিকে।[৬৭] প্রখ্যাত সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ছিলেন এই দলের প্রথম সভাপতি, প্রসিদ্ধ

আইনজীবী অতুলচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন প্রথম সহ-সভাপতি এবং হেমন্তকুমার সরকার ছিলেন এই দলের প্রথম সাধারণ সম্পাদক।[৬৮]

কায়েমী স্বার্থের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টায় ও তার জন্য বিপ্লবী সাহসের জন্য লেবার-স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর *Masses of India* পত্রিকায় ঃ

> The *Masses of India* (Roy's newspaper) welcomes the Labour-Swaraj Party and congratulates its promoters for their revolutionary courage in the attempt to break away from the politics of vested interests.[৬৯]

বিদেশে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল নবগঠিত এই দল। আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির দুই অধ্যাপক জেনিয়া জুকফ্ ইউদিন (Xenia Jukoff Eudin) ও রবার্ট সি নর্থ (Robert C North) তাঁদের *Soviet Russia and the East* নামক বইতে ঘটনা তালিকায় (chronology) কলকাতায় ১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর লেবার-স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন।[৭০]

লেবার-স্বরাজ পার্টি কোনও কমিউনিস্ট সংগঠন ছিল না এবং কাজী নজরুল ইসলামও সাম্যবাদী মতাদর্শের প্রতি তাঁর আকর্ষণ সত্ত্বেও কমিউনিস্ট ছিলেন না। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর নজরুলকে কমিউনিস্ট এবং লেবার-স্বরাজ পার্টিকে কমিউনিস্ট সংগঠন বলেই মনে করত। গোপন গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী নজরুলের 'Communistic tendencies were well-known.'।[৭১] এই রিপোর্ট অনুসারে লেবার-স্বরাজ পার্টির প্রোগ্রাম ছিল সুস্পষ্ট ভাবে কমিউনিস্ট লাইনের উপরই প্রতিষ্ঠিত ঃ

> The party drew up their programme on distinctly Communistic lines and produced a newspaper called the *Langal* (Plough), to which Nazrul Islam was one of the principal contributors. This party seems to have been financed by Communists abroad.[৭২]

অপর একটি গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে লেখা হয়েছিল ঃ

> In Bengal a new party known as the Labour-Swaraj Party was formed in November by Qazi Nazrul Islam (a fanatical poet), Hemanta Kumar Sarkar, Kutubuddin Ahmad and others, with the object of organising Labour and the peasantry in order to use them to enforce the demands of the people of India. The ostensible purpose of the party was the amelioration of the conditions of labourers, the nationalisation of industries and the establishment of land-ownership on a Communist basis.[৭৩]

কলকাতার স্টেট আর্কাইভ্স্-এ সংরক্ষিত গোয়েন্দা বিভাগের একটি ফাইলে (নং আই বি ৩২০/১৯২৬ কে ডব্লিউ, সিরিয়াল নং ৩১০/১৯২৬) 'Notes on the

Workers' and Peasants' Party of Bengal' শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে এই পার্টির বিকাশ, রাজনৈতিক কর্মপন্থা ইত্যাদি বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্যটি করা হয়েছিল ঃ

> Nalini Gupta, who was released on medical grounds soon after his conviction, returned to Bengal in July 1925, and resumed his activities in league with Kutubuddin Ahmad, Abdul Halim, Kazi Nazrul Islam and Hemanta Kumar Sarkar. They formed a party which was known as the 'Labour-Swaraj Party' apparently in opposition to the Swaraj Party, but actually to establish the Communist Party in Bengal on a sound basis. Their declared object was the attainment of Swaraj in the sense of the complete Independence of India, with economic and social emancipation, and the political freedom for men and women. The principal means of realising this aim was non-violent mass action.[৭৪]

১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর লেবার-স্বরাজ পার্টির সংবিধান এবং নীতি ও কর্মসূচী বা প্রোগ্রাম সংবলিত একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হয়েছিল। এই ইস্তাহারটিতে স্বাক্ষরকারী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম, অর্থাৎ লেবার-স্বরাজ পার্টির তরফে নজরুলের নামেই ইস্তাহারটি প্রকাশিত হয়েছিল।[৭৫] ইস্তাহারটি মুদ্রিত হয়েছিল লেবার-স্বরাজ পার্টির মুখপত্র 'লাঙল' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায়—১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর।[৭৬] এই ইস্তাহারে ঘোষিত হয়েছিল, 'নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য'।[৭৭] স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে শ্রমিক-কৃষককে সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এই ইস্তাহারে লেখা হয়েছিল ঃ

> অতএব ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায় এই ঘোষণা করিতেছেন যে, ভারতের জাতীয় দাবী পূরণের এখনও একমাত্র অবশিষ্ট উপায় এই যে, দেশের শতকরা আশিজন যাহারা—সেই শ্রমিক ও কৃষকগণকে সংঘবদ্ধ করা এবং তাহাদিগকে জন্মগত অধিকার লাভে সাহায্য করা, যাহাতে তারা রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে আরও সচেতন হইয়া নিজেদের ক্ষমতায় এবং নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতাশালী স্বার্থপর ব্যক্তিগণের হাত হইতে স্বাধীনতা আনিতে পারে।[৭৮]

১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর লেবার-স্বরাজ পার্টির মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হল 'লাঙল'। এটি ছিল সাপ্তাহিক পত্রিকা। পরবর্তীকালে এই দলের নাম পরিবর্তিত হয়ে পেজ্যান্ট্স্ অ্যান্ড্ ওয়ার্কার্স্ পার্টি অফ্ বেঙ্গল (বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল)

হওয়ায় 'লাঙল' সেই দলের মুখপত্রে পরিণত হয়। ১৯২৬ সালের ১৫ এপ্রিল অবধি 'লাঙল' প্রকাশিত হয়েছিল।[৭৯]

লেবার-স্বরাজ পার্টির অফিস কলকাতার ৩৭ নং হ্যারিসন রোড থেকেই 'লাঙল' প্রকাশিত হত। সাপ্তাহিক 'লাঙল' পত্রিকার প্রধান পরিচালক হিসাবে কাজী নজরুল ইসলামের নাম ছাপা হত এবং সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হত নজরুলের সৈনিক জীবনের বন্ধু মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের। 'লাঙল' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নাম ছাপা হলেও সম্পাদনার কাজটি প্রকৃতপক্ষে করতেন কাজী নজরুল ইসলাম। পরে মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় নামেও 'লাঙল'-এর সম্পাদক থাকতে না চাওয়ায় এই পত্রিকার সম্পাদক করা হয়েছিল গঙ্গাধর বিশ্বাসকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নজরুলই ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক এবং 'ধূমকেতু'র মতই 'লাঙল'ও ছিল আসলে নজরুলেরই কাগজ। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদও এই পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত ছিলেন।

নজরুলের অনুরোধে 'ধূমকেতু'র মতই 'লাঙল'-এর জন্যও আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'লাঙল'-এর তরফ হতে রবীন্দ্রনাথের কাছ হতে এই আশীর্বচন যোগাড় করে নিয়ে এসেছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৮০] ১৯২৬ সালের ২৫ মার্চ প্রকাশিত এই পত্রিকার ত্রয়োদশ সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠায় এই আশীর্বচন ছাপা হয়েছিল।[৮১] তখন থেকেই 'লাঙল'-এর প্রচ্ছদপটে তাঁর আশীর্বাণী থাকত।[৮২]

১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর (১৩৩২ বঙ্গাব্দের ১ পৌষ) প্রকাশিত 'লাঙল' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় লেবার-স্বরাজ পার্টির সংবিধান এবং নীতি ও কর্মসূচী বা প্রোগ্রাম সংবলিত ইস্তাহারটি পূর্ণাঙ্গ রূপেই মুদ্রিত হয়েছিল। এই প্রথম সংখ্যাটিকে 'লাঙল' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং পত্রিকার প্রচ্ছদে 'বিশেষ সংখ্যা' কথাটিই ছাপা হয়েছিল।[৮৩] 'লাঙল' পত্রিকার এই প্রথম বা বিশেষ সংখ্যাতেই ছাপা হয়েছিল নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'সাম্যবাদী'। এই 'সাম্যবাদী' কবিতাটির অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণেই প্রথম সংখ্যাটির পাঁচ হাজার কপি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ ভাবে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। ১৯২৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর প্রকাশিত এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল নজরুলের 'কৃষাণের গান' কবিতাটি। ১৯২৬ সালের ৭ জানুয়ারি প্রকাশিত তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল নজরুলের 'সব্যসাচী' কবিতাটি। 'লাঙল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই শুরু করে প্রতিটি সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় লিখতেন নজরুল নিজেই। নিপীড়িত-বঞ্চিত-শোষিত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা এবং তাদের সঙ্গে একাত্মতা বোধের প্রকাশ ঘটত প্রতিটি সম্পাদকীয়তেই। নজরুলের লেখা প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে শুধুমাত্র কৃষকদের সংঘবদ্ধ শক্তির জয়গানই ঘোষিত হয় নি, সেই সম্পাদকীয়তে খুব পরিষ্কারভাবেই লেখা হয়েছিল—'এবার সমাজের প্রয়োজনে শূদ্র

নয়—শূদ্রের প্রয়োজনে সমাজ চলবে'। 'লাঙল' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে প্রবন্ধগুলি ছাপা হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে ছিল মুজফ্ফর আহ্মদের 'ভারত কেন স্বাধীন নয়?', 'কোথায় প্রতিকার?', 'শ্রেণী সংগ্রাম', 'কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন' প্রভৃতি বিভিন্ন প্রবন্ধ, কুতবুদ্দিন আহ্মদের 'কার্ল মার্কসের শিক্ষা', দেবব্রত বসুর 'কার্ল মার্কস' এবং 'লেনিনের সোভিয়েত রাশিয়া' সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী ইত্যাদি। এই 'লাঙল' পত্রিকাতেই সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'মা' নামে ম্যাক্সিম গোর্কির *Mother* নামক প্রখ্যাত উপন্যাসটির বঙ্গানুবাদ। 'লাঙল'-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে ছিল ১৯২৬ সালের ৬-৭ ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের অভিভাষণের পূর্ণাঙ্গ বয়ান, 'কমিউনিজম ও বলশেভিজম' শিরোনামে ও 'প্রথম সাম্যবাদী সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ' উপ-শিরোনামে কানপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম কমিউনিস্ট সম্মেলনে সভাপতি সিঙ্গরাভেলু চেট্টিয়ারের বক্তৃতা সম্পর্কিত একটি লেখা, 'সাম্যবাদ কি ?' শিরোনামে মৌলানা হসরৎ মোহানীর বক্তৃতা, 'সাম্যবাদ ও ধর্ম' সম্পর্কিত লেখা, 'কমিউনিস্ট পার্টি গঠন' সম্পর্কে মুজফ্ফর আহ্মদের বিবৃতি, কানপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম কমিউনিস্ট সম্মেলনে গৃহীত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংবিধান ও গঠন নীতিসমূহ, এই সম্মেলনের প্রথম দিনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ ইত্যাদি। এগুলি ছাড়াও বীরভূম, হাওড়া, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার প্রজা সম্মিলন অর্থাৎ কৃষক সম্মিলনগুলির রিপোর্টগুলিও 'লাঙল' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল।[৮৪]

প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা গঙ্গাধর অধিকারী 'লাঙল' পত্রিকাকে 'more definitely communist-sponsored'[৮৫] হিসাবে অভিহিত করে এই পত্রিকাটি সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রণিধানযোগ্য মন্তব্যটি করেছেন ঃ

> *Langal* reflects that early period of the history of the Communist Party in Bengal when its pioneers were turning to practical work of organising peasants and workers,when they are just beginning the mass popularisation of Marxism-Leninism and scientific socialism and the experience of the October socialist revolution ; when it is drawing support from the left-wing of the national movement, particularly of the Swaraj Party.[৮৬]

'লাঙল' কোনও কমিউনিস্ট পত্রিকা ছিল না, কিন্তু কমিউনিস্ট আন্দোলনের সেই গোড়ার যুগে অবিভক্ত এই বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন, কমিউনিস্ট মতাদর্শ, শ্রেণী সংগ্রাম, শ্রমিক-কৃষকের রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়কে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে নজরুলের 'লাঙল' যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন

করেছিল, সে কথা অনস্বীকার্য।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭-৮ ফেব্রুয়ারি নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বগুড়া শহরে। ঐ সম্মিলনে সারা বাংলার জন্য একটি স্থায়ী প্রজা সংঘ ও নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর গঠন প্রণালী ও নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। বগুড়াতেই স্থির হয়েছিল নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন নদীয়াতে অনুষ্ঠিত হবে। সেই জন্য মৌলবী সামসুদ্দিন আহ্‌মদকে সভাপতি এবং হেমন্তকুমার সরকারকে সম্পাদক করে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হয়েছিল। সেই অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯২৬ সালের ৬-৭ ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন নির্ধারিত হয়েছিল। এই অধিবেশনে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল তিনটি ঃ (১) কৃষক-শ্রমিক দল গঠন, (২) বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন এবং (৩) কাউন্সিল নির্বাচন। এই অধিবেশনের কথা ঘোষণা করে এবং এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হেমন্তকুমার সরকারের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল 'লাঙল' পত্রিকার ১৯২৬ সালের ২৮ জানুয়ারি সংখ্যায়।[৮৭]

১৯২৬ সালের ৬-৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে হেমন্তকুমার সরকারের আহ্বানে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। লেবার-স্বরাজ পার্টির সদস্যবৃন্দও উক্ত অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই অধিবেশনটি অনুষ্ঠিত করার ব্যাপারে তাঁরাই প্রধানত উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রধান উদ্যোগী ছিলেন অবশ্যই হেমন্তকুমার সরকার। আর তাঁর সঙ্গেই ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তখন নজরুল ছিলেন কৃষ্ণনগরেরই বাসিন্দা। নজরুল যে শুধু এই নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন, তাই নয়, এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার ব্যাপারে তিনি নিয়েছিলেন বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা। ১৯২৬ সালেই কৃষ্ণনগরে প্রজা সম্মেলন ছাড়াও আরও তিনটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল—

(১) বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন, (২) ছাত্র সম্মেলন ও (৩) যুব সম্মেলন। প্রজা সম্মেলনের সময়ই এই অন্য তিনটি সম্মেলনেরই প্রস্তুতি চলছিল। সবকটি সম্মেলনের সঙ্গেই নজরুল যুক্ত ছিলেন এবং সবকটিতেই ছিল তাঁর বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা।

হেমন্তকুমার সরকার ও কাজী নজরুল ইসলাম ছাড়াও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, কুতবুদ্দিন আহ্‌মদ, শামসুদ্দিন হুসেন, আব্দুল হালিম, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেবার-স্বরাজ পার্টির সকল নেতাই যোগ দিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর এই দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব

করেছিলেন লেবার-স্বরাজ পার্টির সভাপতি নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এই দলের সহ-সভাপতি অতুলচন্দ্র গুপ্তও যোগ দিয়েছিলেন এই সম্মেলনে। এই সম্মেলন উপলক্ষেই নজরুল লিখেছিলেন তাঁর দুটি অসাধারণ কবিতা—'কৃষাণের গান' ও 'শ্রমিকের গান'। এই কবিতা দুটি গান হিসাবেও গাওয়া হত। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সঠিক ভাবেই লিখেছেন যে, 'বাঙলা-সাহিত্যে এই ধরনের গান ছিল না এর আগে, নজরুলই তার পথকার।'[৮৮] নজরুলের 'শ্রমিকের গান' এই সম্মেলনেরই উদ্বোধন সঙ্গীতরূপে রচিত হয়েছিল এবং তিনি নিজেই সম্মেলনে গানটি গেয়েছিলেন। 'কৃষাণের গান'টিও সম্মেলনে তিনি নিজেই গেয়েছিলেন। রবিবার ৭ ফেব্রুয়ারি অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় নজরুল ছিলেন অন্যতম বক্তা। এই সম্মেলনে মোট আঠারোটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তার মধ্যে চারটি প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন নজরুল।

এই অধিবেশনেই পেজ্যান্ট্স্ অ্যান্ড্ ওয়ার্কার্স্ পার্টি অফ্ বেঙ্গল-কে (বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল) সংগঠিত করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। তখন থেকেই লেবার-স্বরাজ পার্টির নাম পরিবর্তিত হয়ে পেজ্যান্ট্স্ অ্যান্ড্ ওয়ার্কার্স্ পার্টি অফ্ বেঙ্গল নাম হয়। অর্থাৎ লেবার-স্বরাজ পার্টিটিই পরিণত হয়েছিল পেজ্যান্ট্স্ অ্যান্ড্ ওয়ার্কার্স্ পার্টি অফ্ বেঙ্গল-এ। বাংলায় নাম হয় বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল। 'প্রজা' শব্দটির পরিবর্তে 'কৃষক' শব্দটির ব্যবহার লক্ষণীয়। আরও লক্ষণীয় যে, জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে নয়, এক স্বতন্ত্র দল হিসাবেই পেজ্যান্ট্স্ অ্যান্ড্ ওয়ার্কার্স্ পার্টি অফ্ বেঙ্গল-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অবশ্য এই দলের সদস্যরা কংগ্রেসের মধ্যেও সদস্য হিসাবে কাজ করতেন। যেমন নজরুল নিজেই ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন। এই কৃষ্ণনগর অধিবেশনে পেজ্যান্ট্স্ অ্যান্ড্ ওয়ার্কার্স্ পার্টি অফ্ বেঙ্গল-এর সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি হয়েছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন হেমন্তকুমার সরকার ও কুতবুদ্দিন আহ্মদ।[৮৯] এই দলের কার্যনির্বাহী কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, আব্দুল হালিম, শামসুদ্দিন হুসেন প্রমুখ। এই দলের যে মুদ্রিত ইস্তাহারটি আই বি ৩২০/১৯২৬ (কে ডব্লিউ) নম্বরের ফাইলে সংরক্ষিত রয়েছে, তার থেকে দেখা যায় যে, নতুন নামের এই দলের কার্যনির্বাহী কমিটির পনেরোজন সদস্যের মধ্যে একেবারে প্রথমেই ছিল নজরুলের নাম, আর মুজফ্ফর আহ্মদের নাম ছিল চৌদ্দ নম্বরে।[৯০] গোপন গোয়েন্দা রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, এই দলের নাম মস্কোর *Krestintern* অর্থাৎ *Red Peasants' International*-এর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।[৯১] অর্থাৎ বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল কোনও কমিউনিস্ট সংগঠন না হলেও ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ একে কমিউনিস্ট সংগঠন বলেই মনে করত।

১৯২৬ সালের ১১ ও ১২ মার্চ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাদারিপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎস্যজীবী সম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই মৎস্যজীবী সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন হেমন্তকুমার সরকার, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলাম। ঐ সম্মেলন থেকে হেমন্তকুমার সরকারকে সভাপতি করে একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই মৎস্যজীবী সম্মেলন উপলক্ষে নজরুল রচনা করেছিলেন তাঁর 'ধীবরের গান'। এটি উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া হয়েছিল। নজরুলের গানে সম্মেলনে সবাই মুগ্ধ হয়েছিলেন। এই 'ধীবরের গান' ছাপা হয়েছিল ১৯২৬ সালের ১৮ মার্চ প্রকাশিত 'লাঙল' পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায়।[৯২]

১৯২৭ সালের ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে পেজ্যান্ট্‌স্ অ্যান্ড্ ওয়ার্কার্স্ পার্টি অফ্ বেঙ্গল-এর দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলন উপলক্ষে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত। সম্মেলনের দ্বিতীয় বা শেষ দিনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট্-এর প্রখ্যাত কমিউনিস্ট সদস্য শাপুরজি শাকলাৎওয়ালা (Shapurji Saklatvala)। এই সম্মেলনে দলের নিয়মাবলীর কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। সম্মেলনে দলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[৯৩] বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের এই দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন থেকে দলের যে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছিল, তারও অন্যতম উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন নজরুল। ১৯২৭ সালের ২১ এপ্রিল প্রকাশিত 'গণবাণী' পত্রিকার একাদশ সংখ্যায় এই দলের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নামের যে পূর্ণাঙ্গ তালিকাটি মুদ্রিত হয়েছিল, তাতেই পাওয়া যাচ্ছে নজরুলের নাম। পেজ্যান্ট্‌স্ অ্যান্ড্ ওয়ার্কার্স্ পার্টি অফ্ বেঙ্গল-এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মধ্যে অন্যতম নজরুল তখনও ছিলেন এই দলেরই এক গুরুত্বপূর্ণ নেতা।

'লাঙল' পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৬ সালের ১৫ এপ্রিল। ১৯২৬ সালের ১২ আগস্ট পেজ্যান্ট্‌স্ অ্যান্ড্ ওয়ার্কার্স্ পার্টি অফ্ বেঙ্গল-এর নতুন মুখপত্র হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হল সাপ্তাহিক 'গণবাণী'। সাপ্তাহিক 'গণবাণী' পত্রিকার ডিক্লারেশন নেওয়া হয়েছিল মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের নামে। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদই ছিলেন এই পত্রিকার সম্পাদক।[৯৪] পরবর্তীকালে এই দলের নাম আবার পরিবর্তিত হয়ে ওয়ার্কার্স্ অ্যান্ড্ পেজ্যান্ট্‌স্ পার্টি অফ্ বেঙ্গল হওয়ার পরে 'গণবাণী' সেই দলেরও সাপ্তাহিক মুখপত্রে পরিণত হয়। ১৯২৬ সালের ১২ আগস্ট প্রথমবার প্রকাশিত হওয়ার সময় থেকেই পত্রিকাটি তীব্র আর্থিক দুর্দশার শিকার ছিল। তীব্র আর্থিক দুর্দশাজনিত কারণে ১৯২৬ সালের ১২ অক্টোবর প্রকাশিত হওয়ার পর এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। পুনর্বার ১৯২৭ সালের ১৪ এপ্রিল প্রকাশিত

হয়ে এই পত্রিকা চলেছিল ১৯২৭ সালের ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত। ১৯২৮ সালের ১৪ জুন পুনর্বার প্রকাশিত হওয়ার পর এই পত্রিকা ১৯২৮ সালের ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত চলেছিল এবং সেই সংখ্যাটিই ছিল এই পত্রিকার সর্বশেষ সংখ্যা। অবিভক্ত বাংলায় শ্রমিক-কৃষকের রাজনীতি প্রচার ও প্রসারের কাজে 'গণবাণী' সেই যুগে গ্রহণ করেছিল অগ্রণী ভূমিকা। কমিউনিস্ট মতাদর্শকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও 'গণবাণী'র ছিল বিশেষ ভূমিকা। পরবর্তীকালে প্রকাশিত বিবিধ কমিউনিস্ট পত্র-পত্রিকার যথার্থ পূর্বসূরি ছিল 'লাঙল' ও 'গণবাণী', বিশেষত 'গণবাণী'।

'গণবাণী' ছিল প্রকৃতপক্ষে 'লাঙল'-এরই প্রবহমানতা। আসলে 'লাঙল'-এর ফালই মিশে গিয়েছিল 'গণবাণী'র স্রোতে। 'লাঙল'-এর সঙ্গে সংযোগ বোঝাতে 'গণবাণী'র প্রথম তেরোটি সংখ্যায় শিরোনামের নিচে বন্ধনীর মধ্যে লেখা থাকত—'এর সাথে 'লাঙল' একীভূত হয়েছে।' 'গণবাণী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে না থাকলেও এই পত্রিকার সঙ্গেও নজরুলের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। লেখালেখির মাধ্যমেই এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায় নিয়মিতই নজরুলের কোনও-না-কোনও লেখা—হয় কবিতা, নয়তো প্রবন্ধ—প্রকাশিত হয়েছে 'গণবাণী'র পাতায়।

১৯২৬ সালের ২৬ আগস্ট প্রকাশিত 'গণবাণী' পত্রিকার প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল নজরুলের লেখা অনবদ্য একটি প্রবন্ধ—'মন্দির ও মসজিদ'।[৯৫] হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়েরই দাঙ্গাবাজদের তীব্র ধিক্কার জানানো হয়েছিল এই প্রবন্ধে। ২ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত পত্রিকাটির ঠিক পরবর্তী সংখ্যায় অর্থাৎ প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল নজরুলের লেখা 'হিন্দু-মুসলমান' নামক প্রবন্ধটি।[৯৬] উভয় প্রবন্ধই ছিল ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হানাহানির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও তীব্র কশাঘাত।

'গণবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের বিভিন্ন কবিতার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 'অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত',[৯৭] 'রক্ত পতাকার গান',[৯৮] 'জাগর-তূর্য'[৯৯] প্রভৃতি। 'গণবাণী' পত্রিকার একাদশ সংখ্যায় (২১ এপ্রিল ১৯২৭) প্রকাশিত হয়েছিল 'অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত', দ্বাদশ সংখ্যায় (২৮ এপ্রিল ১৯২৭) প্রকাশিত হয়েছিল 'রক্ত-পতাকার গান' এবং ত্রয়োদশ সংখ্যায় (৫মে ১৯২৭) প্রকাশিত হয়েছিল 'জাগর-তূর্য'। এই 'জাগর-তূর্য' কবিতাটিই ছিল 'গণবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের শেষ লেখা। বিখ্যাত 'ইন্টারন্যাশনাল' বা 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীতের বাংলা অনুবাদ 'অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত'-এ ঘোষিত হয়েছে 'সর্বহারা'দের 'সর্বজয়ী' হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়। 'রক্ত-পতাকার গান'-এ নজরুল ডাক দিয়েছেন 'লাল নিশান' ওড়ানোর, 'রক্ত পতাকা' দোলানোর। আর শেলীর বিখ্যাত কবিতা *Mask of Anarchy*-এর ভাব অবলম্বনে রচিত 'জাগর-তূর্য' কবিতায় তাঁর কলমে 'শ্রমিক' বর্ণিত হয়েছে 'সব মহিমার উত্তর-অধিকারী' হিসাবে। এই তিনটি কবিতার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়েছে

এক ভাবগত ঐক্য। দাসত্বের কঠিন শৃঙ্খলকে চূর্ণ করে নিপীড়িত-বঞ্চিত-শোষিত সর্বহারাদের মুক্তির আশাই ধ্বনিত হয়েছে এই কবিতা তিনটিতে—কবি আস্থা রেখেছেন তাদের চূড়ান্ত জয়লাভে, গভীর প্রতীতির সঙ্গেই উচ্চারিত হয়েছে তাদের 'সর্বজয়ী' হওয়ার তীব্র আশাবাদ। সাম্যবাদী মতাদর্শের প্রতি নজরুলের আকর্ষণ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই কবিতা তিনটির মাধ্যমে।

'গণবাণী' পত্রিকার সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক যে কতখানি নিবিড় ছিল, তা বোঝার জন্য নিম্নলিখিত চিঠিটির উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন। ১৯২৬ সালের ২০ আগস্ট স্বরাজ্য দলপন্থী সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি' পত্রিকার পুস্তক পরিচয়ে 'তারারা' ছদ্মনামে এক ভদ্রলোক সাপ্তাহিক 'গণবাণী'র সমালোচনা করে একটি লেখা লিখেছিলেন। সেই সমালোচনায় নজরুলের প্রতিও কিছু কটাক্ষপাত করা হয়েছিল। তার উত্তরে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৮ ভাদ্র (১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের ২৪, ২৫ বা ২৬ তারিখ) কৃষ্ণনগর থেকে নজরুল 'আত্মশক্তি'র সম্পাদক গোপাললাল সান্যালকে একটি সুদীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন।[১০০] নজরুলের সেই সময়কার চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারণার সম্যক্ পরিচয়ের জন্য চিঠিটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

> কার্ল মার্ক্সের মতবাদ সাধারণ শ্রমিক বুঝতে না পারলেও তা দিয়ে তাদের মঙ্গল সাধিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এ মতবাদ দিয়ে এমন কতকগুলি লোকের সৃষ্টি হয়েছে, যারা জগৎটাকে উল্টে দিয়ে নতুন করে গড়তে চাচ্ছেন বা গড়ছেন। মতবাদ কোনকালেই জনসাধারণ বুঝবে না, মতবাদ তৈরী করে তুলবে সেই রকম লোক যাঁরা বুঝাবেন এ মতবাদের মর্ম্ম জনসাধারণকে। ইঞ্জিন চালাবে ড্রাইভার কিন্তু গাড়ীতে চড়বে সর্ব্বসাধারণ। "গণবাণী"ও কৃষক-শ্রমিকদের পড়ার জন্য নয়, কৃষক শ্রমিকদের গড়ে তুলবেন যাঁরা—"গণবাণী" তাঁদেরই জন্য। "কৃষক শ্রমিক দলের মুখপত্র"; মানে তাঁদের বেদনাতুর হৃদয়ের মূক মুখের বাণী এই "গণবাণী". তাদের বইতে না পারা ব্যথা কথায় ফুটিয়ে তুলবে "গণবাণী।[১০১]

নজরুলের এই চিঠিটি থেকে কার্ল মার্কসের মতবাদে অর্থাৎ কমিউনিস্ট মতবাদে তাঁর আস্থার বিষয়টি পরিষ্কার। আর একই সঙ্গে পরিষ্কার 'গণবাণী'র সঙ্গে তাঁর আত্মিক সংযোগের বিষয়টিও।

বিশের দশকের সেই যুগে শ্রমিক-কৃষকের রাজনীতির সঙ্গে নজরুলের ছিল প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। শ্রমিক-কৃষক-নিম্ন বর্গের সঙ্গে একাত্মতা বোধ থেকেই কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়ক এলাকায় অবস্থানকালে নজরুল হেমন্তকুমার সরকারের সহযোগে একটি শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।[১০২] এই প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

> নজরুল শুধু শিক্ষিত-সমাজে কাব্য-চর্চা করত না। তার পরিচয়ের পরিধিও সুবিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। আমি দেখেছি, তার গান ও কবিতার আবৃত্তি

> শোনার জন্য চটকলের বাঙালী মজুরেরা পর্যন্ত তাকে ডেকেছে। পরে সে কৃষকদের ভিতরেও ঘুরেছে, বক্তৃতা দিয়েছে। অর্থাৎ, শুধু শিক্ষিত সমাজের গণ্ডির ভিতরে সে নিজেকে ধরে রাখেনি। সে পৌঁছেছে জনগণের মধ্যেও। এই জন্যেই বাঙলা দেশের কবিদের ভিতরে নজরুল ইস্‌লাম সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি হতে পেরেছিল। আজও কারখানার মজুরেরা পর্যন্ত তাঁর জন্ম-দিবস পালন করেন।[১০৩]

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের এই মন্তব্যটিকে ঘিরে বিতর্ক থাকতেই পারে, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা অনস্বীকার্য।

১৯২৮ সালের ৩১ মার্চ ও ১ এপ্রিল এই দুদিন পেজ্যান্ট্‌স্‌ অ্যান্ড্‌ ওয়ার্কার্স পার্টি অফ্‌ বেঙ্গল-এর তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভাটপাড়ায়। এই অধিবেশনে দলের নাম পুনর্বার পরিবর্তিত হয়ে শেষ পর্যন্ত হয়েছিল ওয়ার্কার্স্‌ অ্যান্ড্‌ পেজ্যান্ট্‌স্‌ পার্টি অফ্‌ বেঙ্গল। বাংলা নাম হয়েছিল বঙ্গীয় শ্রমিক ও কৃষক দল। শ্রেণী হিসাবে 'শ্রমিকশ্রেণী'র উপর বাড়তি গুরুত্ব আরোপ করতেই 'শ্রমিক' শব্দটিকে আগে বসানো হয়েছিল। এই অধিবেশনে দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।[১০৪] পূর্ববর্তী সম্মেলনের মতই এই সম্মেলনেও দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এই সম্মেলন থেকেই এই পদ দুটির নতুন অভিধা হল যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান।[১০৫] নজরুল এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন নি।

বাংলার পর বোম্বাই, পাঞ্জাব, যুক্ত প্রদেশ (বর্তমানে উত্তর প্রদেশ) প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশেও এই পার্টি গড়ে উঠেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের ঠিক আগে ১৯২৮ সালের ২১-২৪ ডিসেম্বর প্রাদেশিক দলগুলোকে একত্র করার উদ্দেশ্যে সর্দার সোহন সিং জোশের সভাপতিত্বে কলকাতার অ্যালবার্ট হলে বিভিন্ন প্রদেশের ওয়ার্কার্স্‌ অ্যান্ড্‌ পেজ্যান্ট্‌স্‌ পার্টিগুলির সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন বাংলাদেশে এই পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো যে, ১৯২৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর ওয়ার্কার্স্‌ অ্যান্ড্‌ পেজ্যান্ট্‌স্‌ পার্টি অফ্‌ বেঙ্গল-এর নেতৃত্বে প্রায় ত্রিশ হাজার শ্রমিকের এক বিশাল মিছিল কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গিয়ে 'পূর্ণ ও আপসহীন স্বাধীনতা'র দাবি পেশ করেন এবং উক্ত অধিবেশনে শ্রমিকরা 'পূর্ণ ও আপসহীন স্বাধীনতা'র দাবি জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই সমস্তই ছিল শ্রমিকদের সংগঠিত শক্তির প্রকাশ ও রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচায়ক।

এই সর্বভারতীয় সম্মেলনে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, আব্দুল হালিম, হেমন্তকুমার সরকার প্রমুখ বঙ্গীয় শ্রমিক ও কৃষক দলের নেতারা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ওয়ার্কার্স্‌ অ্যান্ড্‌ পেজ্যান্ট্‌স্‌ পার্টি অফ্‌ বেঙ্গল-এর

নেতারাই সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই সম্মেলনে কাজী নজরুল ইসলামেরও অংশগ্রহণ ছিল। সম্মেলনের উদ্বোধন হয়েছিল বিখ্যাত 'আন্তর্জাতিক' সঙ্গীতের নজরুলকৃত বাংলা অনুবাদ 'অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত' দিয়ে। গানে সুরারোপ করেছিলেন নজরুল নিজেই। গানটি গেয়েছিলেন মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের সূত্রপাতই হয়েছিল নজরুলের গান দিয়ে। গেয়েছিলেন স্বয়ং নজরুল। সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় নজরুল স্বরচিত 'কৃষাণের গান' গেয়ে শোনাবার পর দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছিল।[১০৬] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, নজরুল তখনও রাজনৈতিক জীবনে সক্রিয়।

১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে অথবা মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কুষ্টিয়ায় একটি কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন হেমন্তকুমার সরকার। এই সম্মেলনে হেমন্তকুমার সরকারের আহ্বানে যোগ দিয়েছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ, আব্দুল হালিম, ফিলিপ স্প্রাট প্রমুখ, যোগ দিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলামও। মুজফ্ফর আহ্মদ ও কাজী নজরুল ইসলাম এই সম্মেলনে যোগ দিতে একসঙ্গেই কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া গিয়েছিলেন, সঙ্গে গিয়েছিলেন আব্দুল হালিম, ফিলিপ স্প্রাট প্রমুখ। কুষ্টিয়ার এই কৃষক সম্মেলনে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যোগ দিয়েছিলেন। কুষ্টিয়ার এই সভাতেই মুজফ্ফর আহ্মদ ও কাজী নজরুল ইসলাম একসঙ্গে শেষবার রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়েছিলেন। ঐ সম্মেলনে কৃষকদের একটি নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে বঙ্গীয় কৃষক লীগ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে শ্রমিক ও কৃষক দুই শ্রেণীর ভিত্তিতে ওয়ার্কার্স্ অ্যান্ড্ পেজ্যান্ট্স্ পার্টি গড়ার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা হওয়ায় সংগঠনকে এক শ্রেণীর ভিত্তিতে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যেই কুষ্টিয়ায় এই উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রয়াস আর কখনওই বাস্তবায়িত হল না। কলকাতায় ফেরার পর ১৯২৯ সালের ২০ মার্চ 'মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা' সূত্রে গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন মুজফ্ফর আহ্মদ। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন আরও অন্যান্য কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট মতাবলম্বীরা। পরিণতিতে বঙ্গীয় কৃষক লীগ আর গড়ে উঠল না।[১০৭]

যদিও বাংলাদেশে ১৯২৮-২৯ সালে কমিউনিস্ট শক্তি ও প্রভাব ছিল সীমিত, তবুও কমিউনিস্টদের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শিশু কমিউনিস্ট আন্দোলন ও সংগঠনের উপর আঘাত হানল। ১৯২৯ সালের ২০ মার্চ ব্রিটিশ সরকার কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট নির্বিশেষে সারা ভারত জুড়ে মোট ৩২ জনকে (প্রথমে ৩১ জনকে এবং পরে আরও ১ জনকে) গ্রেপ্তার করে তাঁদের বিরুদ্ধে 'মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু করে। দীর্ঘ তিন বছর দশ মাস যাবৎ এই মামলা চলেছিল। এই মামলায় বাংলা থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য মুজফ্ফর আহ্মদ ও শামসুল হুদা এবং অন্যান্য কমিউনিস্ট মতাবলম্বীরা গ্রেপ্তার হন। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এই গ্রেপ্তার জেলে কমিউনিস্ট বন্দীদের আরও কাছাকাছি আসার

সুযোগ করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে সারা ভারতে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই ঘটনা নিঃসন্দেহে এক বিশেষ সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই ব্যাপক গ্রেপ্তার প্রাথমিক ভাবে বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্দোলন গড়ে তোলার কাজকে বিপর্যস্ত করেছিল, কিন্তু স্তব্ধ করতে পারে নি। রুদ্ধ হয় নি কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রবহমানতা। বরং এই চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন প্রচেষ্টা চলতে থাকল।

কিন্তু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ গ্রেপ্তার হয়ে কারান্তরালে চলে যাওয়ায় নজরুলের সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের যোগসূত্র ছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। সেই যোগসূত্রটিই অনুপস্থিত হয়ে যাওয়ায় যোগাযোগটিও আর রইল না। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের 'বামপন্থী' অবস্থানকে ভারতের কমিউনিস্টরা অত্যুৎসাহের ঝোঁকে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা করে আরও বেশি 'বাম' দিকে নিয়ে গিয়ে এক 'বাম-সংকীর্ণতাবাদী' অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। এটা তিরিশের দশকের একেবারে গোড়ার দিকের ঘটনা। এই 'বাম-সংকীর্ণতাবাদ' অনিবার্য ভাবেই নিয়ে এল বিচ্ছিন্নতা। কমিউনিস্ট আন্দোলনের নির্দিষ্ট পরিধির বাইরেও যাঁরা এই আন্দোলনের সহমর্মী ও সহযাত্রী হিসাবে ছিলেন, তাঁদের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন কমিউনিস্টরা। ফলে নজরুলের মত সহযাত্রীর সঙ্গেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্দোলনের সম্পর্ক, কমিউনিস্ট আন্দোলন হারালো তার বিশের দশকের সহযাত্রীকে। সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে চলে গেলেন নজরুল, অবসান ঘটে গেল তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের। রাজনৈতিক জগৎ ত্যাগ করে তিনি পাকাপাকিভাবে অধিবাসী হলেন এক ভিন্ন জগতের। সে জগৎ গানের জগৎ, সুরের জগৎ।

ওয়ার্কার্স্ অ্যান্ড্ পেজ্যান্ট্স্ পার্টি সম্পর্কে এই দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও এক সময়ের সাধারণ সম্পাদক সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন ঃ

> দেশের তখনকার রাজনৈতিক অবস্থা যা ছিল তাতে স্বাধীনতার তৃষা-কাতর মধ্যবিত্তকে কংগ্রেসের মরীচিকার মায়া থেকে বাঁচিয়ে বিপ্লবের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরে নিয়ে আসবার শ্রমিক-কৃষক দল ছিল প্রথম সরাইখানা। আমরা অন্তত শ্রমিক-কৃষক দলকে এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র হিসেবে দেখেছিলুম। বিপ্লবের আসল হাতিয়ার—কমিউনিস্ট দল তৈয়ারির দিকে আমাদের পুরো নজরই ছিল। শ্রমিক-কৃষক দলের রাজনৈতিক আবরণের তলায় কমিউনিস্ট দল গঠন করব। এই ছিল আমাদের সঙ্কল্প। আমরা করেছিলুমও তাই।[১০৮]

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থ কথাই লিখেছেন। প্রকৃতপক্ষে কমিউনিস্টরা তাঁদের প্রকাশ্য প্ল্যাট্‌ফর্ম (platform) ও আইনী আবরণ (legal cover) হিসাবেই ওয়ার্কার্স্ অ্যান্ড্ পেজ্যান্ট্স্ পার্টি গড়ে তুলেছিলেন। এই দলের আবরণের মধ্যে থেকে তাঁদের

আসল উদ্দেশ্যই ছিল কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা। সেই চেষ্টাই তাঁরা প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছিলেন। এই ওয়ার্কার্স্ অ্যান্ড্ পেজ্যান্টস্ পার্টিই পরবর্তীকালে বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠার পথ অনেকটাই প্রশস্ত ও সুগম করে দিয়েছিল। এই দলই ছিল অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টির আদি প্রতিষ্ঠান। সেই অর্থে নিঃসন্দেহে নজরুল ছিলেন অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের অন্যতম পথিকৃৎ।

কাজী নজরুল ইসলাম কোনওদিনই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন নি। স্বভাব বোহেমিয়ান নজরুলের পক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির নিয়মশৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করে পার্টির সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থাকা সম্ভবপর ছিল না। সেই কারণেই সম্ভবত সাম্যবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সারা বিশের দশক জুড়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সহযাত্রীই ছিলেন। ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত কুষ্টিয়ার কৃষক সম্মেলন অবধি নজরুল সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আর সেই রাজনীতি একদিকে যেমন ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনীতি, আবার একই সঙ্গে ছিল শ্রমিক-কৃষকের রাজনীতি, সাম্যবাদী আদর্শকে বাস্তবে রূপদানের প্রয়াসের রাজনীতি।

সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেলেও এবং এক ভিন্ন জগতের অধিবাসী হয়ে গেলেও নজরুল সাম্যবাদী মতাদর্শে তাঁর আস্থা হারান নি। শারীরিক ও মানসিক ভাবে যতদিন তিনি সক্রিয় ছিলেন, ততদিন পর্যন্তই সাম্যবাদের রাজনীতির প্রতি তাঁর ছিল অমোঘ আকর্ষণ, অন্তরের টান। তাই ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রচিত তাঁর গানেও নজরুল চীন-ভারতের জনগণের ঐক্যের জয়গান করেছেন, জয়গান করেছেন সাম্যের, দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন সর্বহারাদের সর্বজয়ী হওয়ার কথা।[১০৯] এই বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস অটুটই ছিল। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশের দশকের একই তরণীর সহযাত্রী কাজী নজরুল ইসলামকে যদি পরবর্তী যুগেও কমিউনিস্ট পার্টি অন্তত সহযাত্রী হিসাবেও সঙ্গে পেত, তবে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠত কমিউনিস্ট পার্টি ও আন্দোলন। এই বিষয়ে যদি কমিউনিস্ট পার্টি কিছুটা সক্রিয় হত, কাছে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করত তার বিশের দশকের সহযোগী নজরুলকে, তবে হয়তো ইতিহাসের কয়েকটা পাতা কিছুটা অন্যরকম ভাবে লেখা হতে পারতো।

তথ্যসূত্র

১। মুজফ্ফর আহ্‌মদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৮৫, (প্রথম মুদ্রণ ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫), পৃঃ ৯-১০, ১৩।

২। তদেব, পৃঃ ২৯।
৩। তদেব, পৃঃ ১৪-১৫, ১৬-১৭।
৪। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ঃ অমিতাভ চন্দ্র, "অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশে নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব,", 'মূল্যায়ন (নবপর্যায়)', প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, অক্টোবর, ১৯৯৭—মার্চ, ১৯৯৮, কলকাতা, পৃঃ ১০৫-২০।
৫। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১০৩।
৬। কাজী নজরুল ইসলাম, "হেনা", 'নজরুল রচনা-সম্ভার', সম্পাদনা ঃ আবদুল আজীজ আল্‌-আমান, দ্বিতীয় খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, মার্চ, ১৯৯৫, পৃঃ ৩২৭-৩৯।
৭। কাজী নজরুল ইসলাম, "ব্যথার দান", 'নজরুল বচনা-সম্ভার', দ্বিতীয় খণ্ড, তদেব, পৃঃ ৩১১-২৬।
৮। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১০১-০২।
৯। তদেব, পৃঃ ১০৩-০৫।
১০। L P Sinha, *The Left-Wing in India (1919-47)*, New Publishers, Muzaffarpur, April, 1965, p. 64.
১১। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', (প্রথম খণ্ড) (১৯২০-১৯২৯) এবং (দ্বিতীয় খণ্ড) (১৯২৯-১৯৩৪) (অসম্পূর্ণ), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪, (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ৬১, ৩৩৭-৩৮।
১২। তদেব, পৃঃ ৩৩৮।
১৩। তদেব, পৃঃ ৬১; মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৩২, ৪৬।
১৪। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২৯-৪৬।
১৫। কল্পতরু সেনগুপ্ত, ' জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯২, পৃঃ ৬৩।
১৬। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পূর্বোল্লিখিত, (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ৩৩৮।
১৭। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৫৯।
১৮। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পূর্বোল্লিখিত, (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ৭১।
১৯। তদেব, পৃঃ ৬৫-৬৬, ৭১।
২০। তদেব, পৃঃ ৬৫-৬৮, ৭১, ৭৩।
২১। তদেব, পৃঃ ৮৩।
২২। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা', পূর্বোল্লিখিত , পৃঃ ১৬০।
২৩। তদেব, পৃঃ ১৫৪।
২৪। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, 'সাংবাদিক নজরুল', পৃঃ ৩৭, তথ্যসূত্র ঃ শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, 'নজরুল ঃ একটি রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব', নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, এপ্রিল, ১৯৯৩, পৃঃ ৩৩।

২৫। শিশির কর, 'নিষিদ্ধ নজরুল', পৃঃ ৮৪; তথ্যসূত্র ঃ শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৩৪।

২৬। তদেব।

২৭। কল্পতরু সেনগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৪৫।

২৮। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৫৪।

২৯। তদেব, পৃঃ ১৫৫।

৩০। কল্পতরু সেনগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৫০।

৩১। কাজী নজরুল ইসলাম (সম্পাদিত), 'ধূমকেতু', প্রথম বর্ষ, ত্রয়োদশ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৬ আশ্বিন, ১৩২৯ বঙ্গাব্দ, ১৩ অক্টোবর, ১৯২২, পৃঃ ৩; তথ্যসূত্র ঃ কল্পতরু সেনগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৪৬-৪৭; শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৩৬; এ ছাড়াও উদ্ধৃতাংশের জন্য দ্রষ্টব্য ঃ মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৫৫; অঞ্জন বেরা, 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ঃ নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্য', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃঃ ৬৪-৬৫। অঞ্জন বেরা তাঁর বইতে লিখেছেন নজরুলের 'ধূমকেতুর পথ' শীর্ষক এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'ধূমকেতু' পত্রিকার ১৯২২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। (পৃঃ ৬৪)।

৩২। কাজী নজরুল ইসলাম, "আনন্দময়ীর আগমনে", 'নজরুল রচনা-সম্ভার', সম্পাদনা ঃ আবদুল আজীজ আল্-আমান, তৃতীয় খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, মে, ১৯৮১, পৃঃ ২৪৭-৪৯; কাজী নজরুল ইসলাম, "আনন্দময়ীর আগমনে", 'নজরুলের সুনির্বাচিত কবিতা', সাহিত্যম, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৭০, পৃঃ ২৩৯-৪১।

৩৩। শিশির কর, 'নিষিদ্ধ নজরুল', পৃঃ ৮৭; তথ্যসূত্র ঃ শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৪৬-৪৭। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ তাঁর বইতে লিখেছেন ১৯২৩ সালের ১৬ জানুয়ারি সুইন্‌হো নজরুলের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলায় তাঁর রায় দিয়েছিলেন। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৬৫। অপরদিকে অঞ্জন বেরার লেখায় আমরা পাই যে, নজরুলের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলায় এবছর সশ্রম কারাদণ্ডের রায় ঘোষিত হয়েছিল ১৯২৩ সালের ২৭ জানুয়ারি। অঞ্জন বেরা, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৬৭-৬৮।

৩৪। কাজী নজরুল ইসলাম, "রাজবন্দীর জবানবন্দী", 'নজরুল রচনা-সম্ভার', তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৩২৭-৩০।

৩৫। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৬০।

৩৬। Home (Press) File No. 184/1923, Serial Nos. 1—6, cited in শিশির কর, 'নিষিদ্ধ নজরুল', পৃঃ ৮৩; তথ্যসূত্র ঃ শান্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৪১।

৩৭। Cecil Kaye, *Communism in India : With Unpublished Documents from National Archives of India (1919-1924)*, Compiled and edited by Subodh Roy, (With an introduction and explanatory notes by Mahadevaprasad Saha), Editions India, Calcutta, 1971, p. 208.

৩৮। Ibid., p. 235.

৩৯। Ibid., p. 50.

৪০। Ibid., p. 210.

৪১। লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, " সাম্যবাদী আদর্শ প্রচারে অন্যতম পথিকৃৎ-কবি", 'দেশ', বর্ষ ৬৬, সংখ্যা ১৬, ১২ জুন ১৯৯৯, ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬ বাংলা সন (বা স), কলকাতা, পৃঃ ৫৫-৫৬।

৪২। তদেব, পৃঃ ৫৬।

৪৩। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পূর্বোল্লিখিত, (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ৪৯, ২৬২, ২৮৫।

৪৪। তদেব, পৃঃ ৩২১, ৩৪০।

৪৫। তদেব, পৃঃ ৩৪৩।

৪৬। কাজী নজরুল ইসলাম, "মৃত্যু-ক্ষুধা", 'নজরুল রচনা-সম্ভার', দ্বিতীয় খণ্ড, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৪৩-২২৫।

৪৭। তদেব, পৃঃ ১৮৬।

৪৮। তদেব, পৃঃ ১৮৬।

৪৯। তদেব, পৃঃ ১৯৪।

৫০। তদেব, পৃঃ ১৯৪।

৫১। তদেব, পৃঃ ১৯৯।

৫২। তদেব, পৃঃ ১৯৯।

৫৩। তদেব, পৃঃ ২০১।

৫৪। কাজী নজরুল ইসলাম, "ঝড় (পশ্চিম তরঙ্গ)", 'নজরুল রচনা-সম্ভার', তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১২-১৬।

৫৫। তদেব, পৃঃ ১৬।

৫৬। কাজী নজরুল ইসলাম, "অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত", 'সঞ্চিতা', ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, আষাঢ়, ১৩৮৯ বাংলা সন (বা স), জুন-জুলাই, ১৯৮২, পৃঃ ১১১।

৫৭। তদেব, পৃঃ ১১১।

৫৮। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৯৫-৯৬।

৫৯। লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৫৫।

৬০। কাজী নজরুল ইসলাম, "সাম্যবাদী", 'সঞ্চিতা', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৬৯-৮৩।

৬১। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১৮৪।

৬২। 'নজরুলের সুনির্বাচিত কবিতা', পূর্বোল্লিখিত—"কৃষাণের গান", পৃঃ ৭-৮, "শ্রমিকের গান", পৃঃ ৯-১১, "ধীবরের গান", পৃঃ ১২-১৪, "শ্রমিক মজুর", পৃঃ ৭১-৭৩, "চাষার গান", পৃঃ ১৭১-৭২, এবং "শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র", পৃঃ ১৮৩-৮৪।

৬৩। *The Peasants' and Workers' Party of Bengal—Report : 1927 and 1928,* (a Bengali pamphlet), published by Muzaffar Ahmad, 31 March 1928, in Gangadhar Adhikari (ed.), *Documents of the History of the Communist Party of India,* Volume Two (1923-1925), People's

Publishing House, New Delhi, May, 1982, p. 671; মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্বোল্লিখিত, (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ৩৩৭, ৩৪১; Gautam Chattopadhyay, *Communism and Bengal's Freedom Movement,* Volume I (1917-29), People's Publishing House, New Delhi, November, 1970, pp 95-96.

৬৪। Gautam Chattopadhyay, op. cit., pp. 98, 177.

৬৫। Gangadhar Adhikari (ed.), *Documents,* Vol. II, p. 671; মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পূর্বোল্লিখিত, (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ৩৩৭।

৬৬। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৩৩৯-৪০, ৩৪৩; Gautam Chattopadhyay, op. cit., p. 97.

৬৭। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'যাত্রী', জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নভেম্বর, ১৯৭৫, কার্তিক, ১৩৮২ বা স, পৃঃ ৮৫-৮৬; Gautam Chattopadhyay, op. cit., p. 97.

৬৮। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৮৬; Gautam Chattopadhyay, op. cit., pp. 96,177.

৬৯। Manabendra Nath Roy, 'A Stop in the Right Direction', *Masses of India,* Paris, February, 1926, quoted in Gautam Chattopadhyay, op cit., p. 96

৭০। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পূর্বোল্লিখিত, (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ৩৩৭।

৭১। David Petre, *Communism in India : 1924-1927,* (Edited with an introduction and explanatory notes by Mahadevaprasad Saha), Editions Indian, Calcutta, 1972, p. 128.

৭২। Ibid., p. 128.

৭৩। Ibid., p. 259.

৭৪। লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৫৬।

৭৫। লেবার-স্বরাজ পার্টির এই ইস্তাহারটির পূর্ণাঙ্গ বয়ানের জন্য দেখুন ঃ কল্পতরু সেনগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৬৪-৬৯; অঞ্জন বেরা, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৮২-৮৬। ইস্তাহারটির পূর্ণাঙ্গ ইংরাজি অনুবাদের জন্য দেখুন, Gangadhar Adhikari (ed.), *Documents,* Vol. II, pp. 682-86, এবং অংশবিশেষের ইংরাজি অনুবাদের জন্য দেখুন, Gautam Chattopadhyay, op. cit, pp. 177-79.

৭৬। Gangadhar Adhikari (ed.), *Documents,* Vol. II, p. 676; কল্পতরু সেনগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৬৯। গঙ্গাধর অধিকারীর লেখায় অন্যত্র পাই, ইস্তাহারটি মুদ্রিত হয়েছিল ১৯২৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর 'লাঙল' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায়। Gangadhar Adhikari, op. cit., p. 672. অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, এটি 'লাঙল' পত্রিকার ১৯২৬ সালের ৭ জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত

হয়েছিল। Gautam Chattopadhyay, op. cit., p. 177. আর মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের মতে এটি 'লাঙল' পত্রিকার ১৯২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পূর্বোল্লিখিত, (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ৩৩৮। তবে এই ইস্তাহারটি ১৯২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর 'লাঙল' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার তথ্যটিই সঠিক।

৭৭। কল্পতরু সেনগুপ্ত, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৬৪; অঞ্জন বেরা, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৮২।

৭৮। তদেব, পৃঃ ৬৬-৬৭; তদেব, পৃঃ ৮৪।

৭৯। Chinmohan Sehanabis, *Fifty Years of Communist Press,* Communist Party Publication, Communist Party of India (CPI), New Delhi, October, 1975, p. 6

৮০। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৮৮।

৮১। অঞ্জন বেরা, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৮৯।

৮২। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৮৮।

৮৩। Gangadhar Adhikari (ed.), *Documents,* Vol. II, pp. 674-75.

৮৪। Ibid., pp. 675-81; গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'সংহতি, লাঙল, গণবাণী', কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯২, পৃঃ ৭৭-১১৬ ("লাঙল")।

৮৫। Gangadhar Adhikari (ed.), op cit., p. 680.

৮৬। Ibid., p 680.

৮৭। 'লাঙল', ২৮ জানুয়ারি ১৯২৬, গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'সংহতি, লাঙ্গল, গণবাণী', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১০৩।

৮৮। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৮৮।

৮৯। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পূর্বোল্লিখিত, (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ৩৪২।

৯০। লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৫৮।

৯১। David Petrie, op.cit., p. 128.

৯২। অঞ্জন বেরা, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৯৮।

৯৩। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১০৮।

৯৪। Chinmohan Sehanabis, op. cit., p. 6; মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পূর্বোল্লিখিত , (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ৩৩৯।

৯৫। গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), 'সংহতি, লাঙল, গণবাণী', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১২৭-৩২ ('গণবাণী')।

৯৬। তদেব, পৃঃ ১৪১-৪৪ ("গণবাণী")।

৯৭। কাজী নজরুল ইসলাম, "অন্তর-ন্যাশনাল-সঙ্গীত", 'সঞ্চিতা', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১১১।

৯৮। কাজী নজরুল ইসলাম, "রক্ত-পতাকার গান", 'নজরুলের সুনির্বাচিত কবিতা', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৩৯।

৯৯। কাজী নজরুল ইসলাম, "জাগর-তূর্য", তদেব, পৃঃ ৪৪।

১০০। 'নজরুল রচনা-সম্ভার', তৃতীয় খণ্ড, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৪১৮-২৩।

১০১। তদেব, পৃঃ ৪২২-২৩।

১০২। মুজফ্ফর আহ্মদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২০০।

১০৩। তদেব, পৃঃ ২৮।

১০৪। মুজফ্ফর আহ্মদ, 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি', পূর্বোল্লিখিত, (প্রথম খণ্ড), পৃঃ ৩৪৮।

১০৫। Gangadhar Adhikari (ed.), *Documents of the History of the Communist Party of India*, Volume III-C (1928), People's Publishing House, New Delhi, December, 1982, p. 75.

১০৬। অঞ্জন বেরা, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ১১০ ।

১০৭। মুজফ্ফর আহ্মদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২১৪-১৫।

১০৮। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ৯২-৯৩।

১০৯। মুজফ্ফর আহ্মদ, 'কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা', পূর্বোল্লিখিত, পৃঃ ২০৭-০৮। গানটির সম্পূর্ণ বয়ানের জন্য দেখুন ঃ তদেব, পৃঃ ২০৭-০৮।

লেখক পরিচিতি

কল্পতরু সেনগুপ্ত, নজরুল পুরস্কারে সম্মানিত। সর্বভারতীয় ললিতকলা মন্দিরের সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘের কলকাতা জেলার সভাপতি। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে নজরুল গীতি অন্বেষা (সম্পাদিত), জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম, উদাসী ভৈরব (সম্পাদিত), নজরুল গীতি আলোচনা, নজরুল গীতি সহায়িকা (সম্পাদিত) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গোলাম কুদ্দুস, বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত ঔপন্যাসিক ও বিশিষ্ট কবি। প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থের মধ্যে বিদীর্ণ, ইলামিত্র, স্বেচ্ছাবন্দী, শেভ্‌চেঙ্কোর স্বপ্ন ও অন্যান্য কবিতা, নাচে মনময়ূর, নবরামায়ণ, জগৎ জয়ের যাত্রী প্রভৃতি এবং অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে সম্বোধন, একসঙ্গে, বাঁদী, মরিয়ম, লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে, উজানিয়া, সুরের আগুন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৯৯ সালে তারাশংকর পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত নজরুল শতবার্ষিকী স্মারক পদকে সম্মানিত। হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি অধ্যাপক ছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে নজরুল ইসলাম ঃ কবিমানস ও কবিতা, নজরুল ইসলাম ঃ সম্পাদক সাংবাদিক এবং পত্র পত্রিকায়, রবীন্দ্রনাথ ঃ নানা প্রসঙ্গ, রাশিয়ার চিঠি প্রবাসী এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ, জীবনানন্দ পরিক্রমা, আধুনিক কবিতার স্বরূপ চেতনা চিত্রকল্প এবং অন্যান্য, সাহিত্য ও সাহিত্যিক ঃ সৃজনে ও ভাষ্যে, সুধীন্দ্রনাথ ঃ জীবন ও সাহিত্য (সম্পাদিত), বিষ্ণু দে ঃ জীবন ও সাহিত্য (সম্পাদিত), বিষ্ণু দের কবিতার নিবিড় পাঠ (সম্পাদিত), বিষ্ণু দের প্রবন্ধ সংগ্রহ ১, ২ (সম্পাদিত), তারাশংকর ঃ সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে (সম্পাদিত) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাঁধন সেনগুপ্ত, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে নজরুল কাব্যগীতি ঃ বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন, নজরুলের ছেলেবেলা, রবীন্দ্রনাথের চোখে নজরুল ও নজরুলের ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ, বাজেয়াপ্ত রচনা ও নজরুল ইসলাম (যৌথ রচনা), কাজী নজরুল ইসলাম তথ্য-সূত্র গ্রন্থ ও গানের তালিকা, সমগ্র নজরুল জীবনী, চির উন্নত শির (সম্পাদিত), আলোর উদ্দাম পথিক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অরুণাভ ঘোষ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ ঝাড়খণ্ড মুভমেন্ট ঃ এ স্টাডি ইন দ্য পলিটিক্স অফ্ রিজিওনালিজ্‌ম, সার্ধশতবর্ষে কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারের প্রাসঙ্গিকতা (সম্পাদিত)।

অঞ্জন বেরা, পোষাকী নাম সৌম্যেন্দ্রনাথ বেরা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ সাংবাদিক নজরুল, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, জনযুদ্ধ পত্রিকা ঃ সন্ধিক্ষণের মুখপত্র, টেলি প্রজন্মে সংস্কৃতি, কিউবা ঃ সংকট ও সংগ্রাম, ডেমোক্র্যাসি এ্যান্ড মার্কসিজ্‌ম (যৌথ সম্পাদনা), ইন্টারপ্রেটিং এ নেশন ঃ সিলেকশন্‌স ফ্রম শরৎ বোসেজ 'দ্য নেশন' (সম্পাদিত)।

তরুণকুমার দাস, হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও নজরুল-গবেষক।

জিয়াদ আলী, কবি ও সাংবাদিক। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ ও ভারতীয় সমাজ ভাবনা, আরব জাতীয়তাবাদ ও সাদ্দামের লড়াই, সংখ্যালঘু রাজনীতি, নজরুল প্রতিভার উৎস ঃ বিতর্কিত বিস্তার, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ঃ জীবন ও বৈশিষ্ট্য, শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

করুণাসিন্ধু দাস, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক। কবি ও প্রাবন্ধিক। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্য পরিক্রমা, কাব্য জিজ্ঞাসার রূপরেখা, প্রসঙ্গ ঃ বাক্‌শিল্প, সংস্কৃত সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, 'আলোকের মহাজিজ্ঞাসায় কবি জীবনানন্দ, পরিবেশ, বাংলার মুখ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পরিভাষাজ্‌ ইন দ্য পানিনিয়ান সিস্টেম অফ্ গ্রামার, এ পানিনিয়ান অ্যাপ্রোচ টু ফিলোজফি অফ্ ল্যাঙ্গোয়েজ, সেম্যান্টিকো-সিনট্যাকটিক রিলেশন্‌সঃ এ ফিলোজফিকাল অ্যাপ্রোচ প্রভৃতি এবং কাব্যগ্রন্থের মধ্যে অফুরন্ত রোদ, যেমন নক্ষত্র জাগে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রঞ্জনা সরকার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নজরুলের উপর গবেষণারত এবং হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস্‌ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপিকা।

সুস্নাত দাশ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থঃ তুমিই জীবন (সম্পাদিত), তেভাগার গল্প (সম্পাদিত), ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা।

অমিতাভ চন্দ্র, স্কটিশচার্চ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ অবিভক্ত বাংলায় কমিউনিস্ট আন্দোলন ঃ সূচনা পর্ব।

গ্রন্থপঞ্জী

আইয়ুব সালাউদ্দীন, নজরুল সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিচার, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।

আচার্য রামজীবন, নজরুল এক বিস্ময়, কালিন্দী, মেদিনীপুর, ১৯৭১।

আজাদ আবুল, নজরুলের গানের রাগ, ১৯৯৪।

আফসারউদ্দীন কাজী, ইসলাম ও নজরুল ইসলাম,

আরা শামীম সুইটী, নজরুল-সাহিত্যে যুবশক্তি, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।

আল আজাদ আলাউদ্দীন, আলী নেওয়াজ, আহ্মদ শাহাবুদ্দীন (সম্পাদিত), নজরুল জন্মশতবর্ষ বক্তৃতামালা, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৫।

আল্ আমান আবদুল আজীজ, নজরুল পরিক্রমা, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, (১৩৭৬) ১৯৬৯।

—, ধূমকেতুর নজরুল, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৪।

—, বিদ্রোহী বিচিত্রা, ১৯৮০।

—, কবির সাংবাদিক জীবন, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৯।

—, অপ্রকাশিত নজরুল, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৯।

আলম শেখ দরব্বার, অজানা নজরুল, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৮।

—, রাজবন্দী কবি,

—, যখন বরিশালে নজরুল ঃ প্রথমবার,

—, মেদিনীপুরে নজরুল সম্বর্ধনা,

—, শের এ বাংলা, নবযুগ ও নজরুল,

আলী জিয়াদ, নজরুল প্রতিভার উৎস ঃ বিতর্কিত বিস্তার, নবজাতক, কলকাতা, ২০০১।

আলী মোবাশ্বের, নজরুল প্রতিভা, স্টুডেন্ট্স ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৯।

—, নজরুল ও সাময়িকপত্র, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৪।

আশরাফ সৈয়দ আলী (সম্পাদিত), নজরুল জীবনের প্রেমের এক অধ্যায়, বাংলা বিভাগ, করাচি বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি, ১৯৬৭।

আসগর সৈকত, গদ্যশিল্পী নজরুল, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, ১৯৭৯।

আহ্মেদ দবিরুদ্দীন, নজরুল সাহিত্যের নবমূল্যায়ন,

আহ্মদ বেগম জেবু, ইসলামের সৌন্দর্য ও কবি নজরুল, ১৯৭০।

আহ্মদ মুজফ্ফর, কাজী নজরুল প্রসঙ্গে, বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৫৯।

—, কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬৫,

১৯৬৮, ১৯৮৫, ১৯৮৯, ১৯৯৫।
আহ্‌মেদ রফিক, বাঙলা বাঙালী আধুনিকতা ও নজরুল,
আহ্‌মদ শাহাবুদ্দীন, শব্দধানুকী নজরুল ইসলাম, নজরুল একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০।
—, নজরুল সাহিত্য বিচার, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬।
—, ছোটদের নজরুল, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭।
—, ইসলাম ও নজরুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮০।
—, নজরুল সাহিত্য দর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।
—(সম্পাদিত), নজরুলের পত্রাবলী, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৫।
—, নজরুল সাহিত্য সমীক্ষা, সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা, ১৯৭১।
আহ্‌সান কামরুল, নজরুল সাহিত্য পাঠের ভূমিকা, বুক সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৭৬।
—, ছোটোদের নজরুল, বুক সোসাইটি, ঢাকা।
আহ্‌সান সৈয়দ আলী, নজরুল ইসলাম, মখদুমী এন্ড আহ্‌সানউল্লা লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৪।
—, কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা, ১৯৭১।
ইসলাম তাপসী, নজরুল সাহিত্যে মানব তত্ত্ব, চিত্রিতা পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৫।
ইসলাম ফেরদৌস, ছোটদের নজরুল, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
ইসলাম মজহারুল, আমারে দেব না ভুলিতে, ১৯৯২।
ইসলাম মুস্তাফা নূরউল, সমকালে নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।
—, নজরুল ইসলাম ঃ নানা প্রসঙ্গ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯১।
—, নজরুল ইসলাম, বাংলা বিভাগ, করাচি বিশ্ববিদ্যালয়, করাচি, ১৯৬৯।
ইসলাম রফিকুল, নজরুল নির্দেশিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯।
—, নজরুল জীবনী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭২।
—(সম্পাদিত), কাজী নজরুল ইসলাম ঃ এ নিউ এ্যানথোলজি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, ১৯৯০।
—, কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও সাহিত্য, কে. পি. বাগচী, কলকাতা, ১৯৯১।
—, কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও কবিতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৪,১৯৯২।
—(সম্পাদিত), নজরুল সমীক্ষা, ১৯৯২।
—(সম্পাদিত), নজরুল স্মৃতিচারণ, ১৯৯৫।
—, কাজী নজরুল ইসলাম ঃ জীবন ও সৃষ্টি, ১৯৯৭।
—, নজরুল প্রসঙ্গে, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৮।
—(সম্পাদিত), শতবর্ষে শতকবির নজরুল বন্দনা, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৯।
ইসহাক আবু ফাতেমা মুহম্মদ, মুসলিম রেনেসাঁয় নজরুলের অবদান, ১৯৭০।

ওদুদ কাজী আবদুল, নজরুল প্রতিভা, বর্মন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৪১।
'কথা সাহিত্যিক' সম্পাদকমণ্ডলী (সম্পাদিত), নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ, অমর সাহিত্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৭।
কর শিশির, নিষিদ্ধ নজরুল, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৩, ১৯৯২।
—, নজরুল সাহিত্য দর্শন, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৮, ১৯৮৩।
কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ (সম্পাদিত), নজরুল পত্রাবলী,
কাদির আবদুল, নজরুল জীবনী, ১৯৪১।
—(সম্পাদিত), নজরুল পরিচিতি, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৫৯।
—, কবি নজরুল, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭০।
—, যুবকবি নজরুল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬।
—, নজরুল প্রতিভার স্বরূপ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৬৮, ১৯৮৯।
—(সম্পাদিত), বিদ্রোহী রণক্লান্ত, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা।
কিউ. এ., কবি কিশোর নজরুল, পশ্চিমবঙ্গ নজরুল গবেষণা কেন্দ্র,
কুদ্দুস মোহাম্মদ আবদুল, রেনেসাঁ ও নজরুল, ঢাকা, ১৯৬৯।
—, নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা, ঢাকা, ১৯৭০।
—, কুমিল্লায় নজরুল, আম্বিয়া খাতুন, কুমিল্লা, ১৯৭৬।
—, শিশু সাহিত্যে নজরুল, আম্বিয়া খাতুন, কুমিল্লা, ১৯৮৩।
—, আমি যাযাবর কবি, নজরুল স্মৃতিরক্ষা পরিষদ, কুমিল্লা, ১৯৮৪।
—, নজরুল কাব্যে নবী মোস্তফা,
খান আজহারউদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে নজরুল, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, (১৩৫৩, ১৩৬৩, ১৩৬৫, ১৩৬৯, ১৩৮০) ১৯৪৬, ১৯৫৬, ১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭৩ এবং সুপ্রীম পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।
খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন, যুগস্রষ্টা নজরুল, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৫৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮।
খান লায়েক আলি, নজরুল প্রতিভা, মুর্শিদাবাদ, ১৯৮৮, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৯৮।
খোন্দকার আবদুল কাইয়ুম, জাতির জীবনে এলো বিদ্রোহী, লাভপুর, বীরভূম, ১৯৬৫।
গুপ্ত ক্ষেত্র, নজরুলের কবিতা ঃ অসংযমের শিল্প, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৭।
গুপ্ত সুশীলকুমার, কবি নজরুল, ইন্ডিয়ানা, কলকাতা, ১৯৫৭।
—, নজরুল চরিতমানস, নবযুগ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, (১৩৮৪) ১৯৭৭।
গুহ অশোক, অগ্নিবীণা বাজান যিনি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, (১৩৭৫) ১৯৬৮।
গুহ সুধীররঞ্জন, মর্তলোকের ধূমকেতু, ইউনিভার্সাল বুক ডিপো, কলকাতা, ১৯৭৬।
গোস্বামী করুণাময়, নজরুল গীতিপ্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮।

—, কাজী নজরুল ইসলাম, শিশু সাহিত্য বিতান, চট্টগ্রাম, ১৯৮২।
—, বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯১।
—, নজরুল সংগীত ঃ জনপ্রিয়তার স্বরূপ সন্ধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।
—, কাজী নজরুল ইসলাম ঃ এ প্রোফাইল, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯০।
ঘোষ বিশ্বজিৎ, নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।
ঘোষ শম্ভুনাথ, নজরুল গীতির নানা দিক, বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৭।
ঘোষ হরিপদ (সম্পাদিত), নজরুল স্মৃতিমাল্য, ১৯৭৬।
চক্রবর্তী নরেন্দ্রনারায়ণ, নজরুলের সঙ্গে কারাগারে, গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা, ১৯৭০।
চক্রবর্তী বসুধা, কাজী নজরুল ইসলাম, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট অফ্ ইন্ডিয়া, নয়াদিল্লী, ১৯৬৯।
চক্রবর্তী রঘুবীর (সম্পাদিত), রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বাংলাদেশ, ওয়ার্লড প্রেস, কলকাতা, ১৯৭২।
চক্রবর্তী সুবোধ, বিদ্রোহী কবি নজরুল, ১৯৭২।
চাকলাদার শক্তি, জীবন সায়াহ্নে নজরুলকে যেমন দেখেছি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৮।
চৌধুরী আবদুল মুকীত, বাংলাদেশে নজরুল ঃ বিদায়ী ছালাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮২।
চৌধুরী আমীর হোসেন, নজরুল কাব্যে রাজনীতি, স্টুডেন্ট্স ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৬।
—, নজরুল এ্যান্ড রবীন্দ্রনাথ, ঢাকা, ১৯৬২।
চৌধুরী কবীর, নজরুল দর্শন, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯২।
চৌধুরী তিতাস, নিষিদ্ধ নজরুল ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ভিনাস প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০।
চৌধুরী নারায়ণ, সঙ্গীত পরিক্রমা, ১৯৫৫।
—, কাজী নজরুলের গান, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৭৭।
—, নজরুল চর্চা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯০।
চৌধুরী সিরাজুল ইসলাম, ইনট্রোডিউসিং নজরুল ইসলাম, ঢাকা, ১৯৬৮।
চট্টোপাধ্যায় প্রাণতোষ, কাজী নজরুল (প্রথম খণ্ড), দেবদত্ত কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৫৫, এ. মুখার্জী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৭৭।
—, কাজী নজরুল, দ্বিতীয় পর্ব, হুগলী জিলা পরিষদ, ১৯৮৩।
—, সাংবাদিক নজরুল, দি ভার্সেটাইল্স, কলকাতা, ১৯৭৮।
—, অমৃত নজরুল,
চট্টোপাধ্যায় বীরেন্দ্র (সম্পাদিত), দুর্গম গিরি কান্তার মরু, টাইম্স ডিস্ট্রিবিউটরস্, কলকাতা,
জামান সেলিনা বাহার (সম্পাদিত), নজরুল পাণ্ডুলিপি, ১৯৯৪।

জাহাঙ্গীর মুহাম্মদ, কবি নজরুলের সাংবাদিক জীবন, বাংলাদেশ বুক্‌স ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮২।
জাহাঙ্গীর সেলিম, লোকায়ত নজরুল, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।
ঠাকুর ব্রহ্মমোহন, নজরুল সঙ্গীতের সুরবিকৃতি ও সুর সংরক্ষণ, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯২।
জাহাঙ্গীর সেলিম, লোকায়ত নজরুল, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।
—, নজরুল গীতির নানা প্রসঙ্গ, ১৯৯৩।
—, নজরুল সঙ্গীত কোষ, ১৯৯৪।
—, নজরুল সঙ্গীতের বাণীর পাঠান্তর, বিকৃতি ও বাণী সংরক্ষণ,
—(সম্পাদিত), অপ্রকাশিত নজরুল, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, (১৩৯৯), ১৯৯২।
—, নজরুল সঙ্গীত, বিকৃতি ও অবিকৃত বাণীর উৎস, ১৯৯৩।
—, বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৫।
—, বেতারে নজরুল ও তাঁর গান, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, (১৪০৫) ১৯৯৮।
দত্ত পরিমল, অগ্নিবীণার কবি নজরুল, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৮৯।
দত্ত মিলন, নজরুল জীবনচরিত, প্রসাদ লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯৭৬।
—, নজরুল প্রেমকথা, নবাঙ্কুর প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৭।
দত্ত হারাধন, নজরুল প্রবন্ধ মালিকা, ১৯৮২।
—, যুগের কাণ্ডারী নজরুল, নজরুল একাডেমী, চুরুলিয়া, ১৯৮৬।
—, বিদ্রোহীর বেশে এলে সুন্দর (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), নজরুল একাডেমী, চুরুলিয়া, ১৯৮৮ ও ১৯৮৯।
—, মানুষ ও কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ১৯৯৯।
দাশ অজিত, কাজী নজরুল ইসলাম ঃ এক অজ্ঞাত পর্ব, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৫।
দাস ঋষি, ছোটদের নজরুল, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৫৭।
দাস চিত্তরঞ্জন, নজরুল ইসলামের উপন্যাস, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯২।
দাস রমেন, ছেলেদের নজরুল, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, (১৩৬৩) ১৯৫৬।
—, ঘরে বাইরে নজরুল, সাহিত্য সংস্থা, কলকাতা, ১৯৭৬।
—, নজরুলের প্রেম, মৌসুমী সাহিত্যমন্দির, কলকাতা, ১৯৭৬।
দিলদার (সম্পাদিত), নজরুল স্মৃতিকথা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা এবং বসাক বুক স্টোর, কলকাতা, ১৯৭১।
দে বিশ্বনাথ, নজরুল স্মৃতি, সাহিত্যম, কলকাতা, ১৯৭০, ১৯৭১।
—(সম্পাদিত), নজরুল কথা, সাহিত্যম, কলকাতা, (১৩৮০) ১৯৭৩।
দে সুনীলকান্তি, নজরুলের অপ্রকাশিত ব্যঙ্গ রচনা, ১৯৯৪।

নজরুল ইনস্টিটিউট, নজরুল ও নাসিরউদ্দীন, ঢাকা,
—, নজরুল চর্চা, প্রথম খণ্ড, ঢাকা,
—, নজরুল চর্চা, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা,
—, নজরুল ইনস্টিটিউট ও নজরুল চর্চা, ঢাকা,
—, নজরুল গ্রন্থপঞ্জী ও নজরুল বিষয়ক গ্রন্থাবলী, ঢাকা, ১৯৯৪।
—, নজরুলের কবিতা ও গান,
নাসিরউদ্দীন মোহাম্মদ, সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৮৮।
পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, নজরুল পরিচিতি, ঢাকা, ১৯৫৯।
ফজল আবুল, বিদ্রোহী কবি নজরুল, সুধীর সিংহ, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
বন্দ্যোপাধ্যায় জিতেন্দ্রনাথ, বিধাতার অভূতপূর্ব সৃষ্টি, ১৯৬৯।
বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন্দ্র, নজরুল, প্যাপিরাস, কলকাতা, (১৪০১) ১৯৯৪।
বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তা, নজরুল একটি রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, (১৪০০) ১৯৯৩।
বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিময়, অগ্নিতাপস নজরুল, মণ্ডল এন্ড সন্স, কলকাতা, ১৯৮৮।
—, বিদ্রোহী নজরুল, ভট্টাচার্য এ্যান্ড কোং, কলকাতা।
বন্দ্যোপাধ্যায় শিবসনাতন, সৈনিক কবি নজরুল, রাঢ়েশ্বর প্রকাশনী, আসানসোল ১৯৮৬।
বসু অরুণকুমার, নজরুল জীবনী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০০।
বসু দক্ষিণারঞ্জন, খেয়ালী কবি-সৈনিক ঃ ছোটদের প্রিয় কবি নজরুল, পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৭৯।
বসু মজুমদার অক্ষয়কুমার, নব নবীনের কবি নজরুল, ১৯৯১।
বসু মধুসূদন, নজরুল কাব্যপরিচয়, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা, ১৯৭৫, ১৯৮৫।
—, নজরুল কাব্যে ও গানে অলংকার, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৪।
বাসার আফজালুর (অনুদিত), নজরুল ইসলামের সাহিত্য জীবন, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৮।
বাহারউদ্দীন (সম্পাদিত), বাঁশি আর রণতূর্য, স্মরজিৎ প্রামাণিক, কলকাতা, ১৯৯৮।
বাংলা একাডেমী, নজরুল সংগীত সম্ভার ঃ নজরুল হস্তলিপি, ঢাকা, ১৯৮২।
বিশ্বাস লক্ষ্মণকুমার, বিদ্রোহী কবি নজরুল, ১৯৭৮।
বিশ্বাস বিশ্ব, বিদ্রোহী কবি নজরুল, বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৬৯।
বেগ জামরুল হাসান, নজরুল ইসলাম এবং অন্যেরা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।
বেগম শাহিদা, নজরুল জীবনের গল্প, ১৯৯৩।
বেরা অঞ্জন, সাংবাদিক নজরুল, ক্যালকাটা জার্নালিস্ট্স্ ক্লাব, কলকাতা, ১৯৯৮।

—, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৯৯।
ভট্টাচার্য গৌরীশঙ্কর, নজরুল সঙ্গ ও প্রসঙ্গ,
ভট্টাচার্য বিশ্ববন্ধু (সম্পাদিত), নজরুল শতবর্ষের শ্রদ্ধার্ঘ্য, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও নেতাজী ইনস্টিটিউট ফর এশিয়ান স্টাডিজ, কলকাতা, ১৯৯৯।
ভৌমিক জয়গোবিন্দ, জাতীয় জাগরণে নজরুল, গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬২।
ভৌমিক শান্তিরঞ্জন, নজরুলের উপন্যাস, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯২।
মঈনুদ্দীন খান মুহাম্মদ, যুগস্রষ্টা নজরুল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮, ১৯৭৮।
মজিদ এ. আবদুল, নজরুলের প্রেমের কবিতা, ১৯৭২।
মজিদ এম. এ., ছোটদের কবি নজরুল ইসলাম, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা, (১৩৬৩) ১৯৫৬।
মজিরউদ্দীন মুহম্মদ, নজরুল গদ্যসমীক্ষা,
মজুমদার দিলীপ, নজরুল কী করে নজরুল হলেন, ১৯৯৯।
মজুমদার দুর্গা ও মজুমদার দিব্যজ্যোতি (সম্পাদিত), কারার ঐ লৌহকপাট, সাহিত্যপ্রয়াস, কলকাতা, ১৯৬৬।
মজুমদার সুলতান মাহমুদ, ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি, নজরুল পরিষদ, কুমিল্লা।
মণ্ডল প্রফুল্ল (সম্পাদিত), নজরুল সমীপেষু, কলকাতা, ১৯৭০।
মনিরুজ্জমান মোহাম্মদ (সম্পাদিত), নজরুল সমীক্ষণ, ১৯৭২।
—, নজরুল চেতনা, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৬।
মনিরুজ্জমান (সম্পাদিত), সৃষ্টিসুখের উল্লাসে, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯১।
—(সম্পাদিত), প্রলয় কেতন, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯২।
—(সম্পাদিত), চট্টগ্রামে নজরুল, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৩।
মাওলা আহমেদ, নজরুলের কথাসাহিত্য মনোলোক ও শিল্পরূপ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।
মান্নান কাজী আবদুল, রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলাম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, গ্লোব লাইব্রেরী, ঢাকা।
মামুদ হায়াৎ, প্রতিভার খেলা নজরুল, চেতনা, ঢাকা, ১৯৮৮।
—, নজরুল ইসলাম ঃ কিশোর জীবনী, প্রতীক, ঢাকা, ১৯৮৯।
মামুদ হায়াৎ ও দত্ত জ্যোতিপ্রকাশ (সম্পাদিত), তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ১৯৭৩।
মাশয়েকী আবদুল হাই, দুখু মিঞার জারী
মাহ্ফুজউল্লাহ্ মোহাম্মদ, নজরুল ইসলাম, ১৯৬৩।

—, নজরুল কাব্যের শিল্পরূপ, নজরুল একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০, ১৯৮০।
—, নজরুলের কবিতা গান : সংস্কার, পরিমার্জন ও পাঠভেদ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৮৯।
—, নজরুল-নার্গিস বিষয়ক পত্রাবলী, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৮৯।
—(সম্পাদিত), কাজীর সিমলা ও দরিরামপুরে নজরুল, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯০।
—, অনন্য নজরুল, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯০।
—(সম্পাদিত), নজরুলের ছোটগল্প,
—(সম্পাদিত), নজরুল ও নাসিরউদ্দীন স্মারকগ্রন্থ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৫।
—, নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।
—(সম্পাদিত), জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জন্মবার্ষিকী উদযাপন স্মারকগ্রন্থ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯১-৯২, ১৯৯৩, ১৯৯৪, ১৯৯৫, ১৯৯৬।
মাহমুদ মজিদ, নজরুল : তৃতীয় বিশ্বের মুখপাত্র, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।
মাহমুদ শামসুন নাহার, নজরুলকে যেমন দেখেছি, ভারতী লাইব্রেরী, কলকাতা, (১৩৬৫) ১৯৫৮।
—, নজরুল পরিচিতি,
মিঞা বন্দে আলী, ছোটদের নজরুল, ১৯৬১।
—, জীবনশিল্পী নজরুল, আহ্‌মদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭৯।
মিঞা মজিরউদ্দীন (সম্পাদিত), নজরুল গদ্য সমীক্ষা, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৮।
মিত্র অশোক কুমার, নজরুল প্রতিভা পরিচিতি, বাণীভবন, ঢাকা, ১৯৬৯।
মিত্র প্রেমেন্দ্র (সম্পাদিত), নজরুল বিচিত্রা, ১৯৬৯।
মিত্র সুধীরকুমার, পত্র-পত্রিকার আলোকে নজরুল,
মুখোপাধ্যায় ধ্রুবকুমার, নজরুল ইসলাম : কবি মানস ও কবিতা, রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯২।
—, নজরুল ইসলাম : সম্পাদক সাংবাদিক এবং পত্র পত্রিকায়, কলকাতা, ১৯৯৯।
মুখোপাধ্যায় শৈলজানন্দ, কেউ ভোলে না কেউ ভোলে, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৬০।
—, আমার বন্ধু নজরুল, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৮।
—(সম্পাদিত), কাজী নজরুল, কলকাতা।
মুস্তাফা আবুল কালাম, নজরুল শব্দকোষ,
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সমকালে নজরুল ইসলাম, ১৯৮৩।
—(সম্পাদিত), নজরুল ইসলাম : নানা প্রসঙ্গ, ১৯৯১।

মোদাব্বের মোহাম্মদ, নজরুল ইসলাম, শিশু একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২।
মোশেল বাসুদেব, দুখু মিঞা, ধূসর পাণ্ডুলিপি প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৩।
রহমান আতাউর, নজরুল কাব্যসমীক্ষা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৬৭।
—, কবি নজরুল (প্রথম খণ্ড), শুভ্রা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮।
—, ঔপনিবেশিক সমাজে সংগ্রামী কবি, নজরুল ইন্‌স্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৩।
রহমান আতোয়ার, নজরুল বর্ণালী, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৪।
রহমান এম. আবদুর, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল, বইঘর, বীরভূম, ১৯৮৩।
—, কিশোর নজরুল,
রহমান কাজী তালেবুর, আসানসোল কাজীর সিমলা ও দরিরামপুরে নজরুল, ১৯৯৪।
রহমান গাজী সামসুর, নজরুলের বিচার ও কারাদণ্ড, কোরান মঞ্জিল, বরিশাল, ১৯৬৮।
রহমান বদিউর (সম্পাদিত), নজরুল পত্রাবলী,
রহমান মিজানুর, নজরুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৫৯।
—, আমার জানা নজরুল,
—, ছোটদের নজরুল, সাহিত্যমালা, ঢাকা।
রশীদ বজলুর, ছোটদের নজরুল,
রায় বিষ্ণুপদ, নজরুল কেন বিদ্রোহী, জে. সি. রায় এ্যান্ড কোং, কলকাতা, ১৯৯৯।
রায় বুদ্ধদেব, নজরুল গীতিপ্রসঙ্গ, সাহিত্যম, কলকাতা, ১৯৮৯।
লাহিড়ী শিবপ্রসন্ন, নজরুল সাহিত্যের ভূমিকা, ঢাকা, ১৯৫৪।
লাহিড়ী সৌমিত্র (সম্পাদিত), সৃজন প্রতিভা নজরুল, অনুভব, শ্রীরামপুর, ১৯৯৯।
শরীফ আহ্‌মদ, একালে নজরুল, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯০।
শাহ্‌নাজ মুন্নী, নারী জাগরণ ও নজরুল সাহিত্যে নারী, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।
সংস্কৃতি পরিষদ (সম্পাদিত), কবি নজরুল, ইন্ডিয়ানা, কলকাতা, ১৯৫৭।
সাত্তার আবদুস, নজরুল গীতি সন্ধানে (প্রথম খণ্ড), ১৯৬৮।
—, নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯২।
—, নজরুল সঙ্গীত অভিধান, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৩।
সান্যাল কমলেন্দু, ছন্দে ছড়ায় কাজী নজরুল ইসলাম, ১৯৯২।
সান্যাল প্রবোধকুমার, নজরুল কথা,
সাহারায় রবিদাস, বিদ্রোহী বিচিত্রা,
সিংহ শান্তিপদ, নজরুল কথা, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭২।
সুলতানা রাজিয়া, নজরুল অন্বেষা, মখদুমী এন্ড আহসানউল্লা লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৯।

—, কথাশিল্পী নজরুল, ১৯৭৫।
সেন প্রবোধচন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম, কলকাতা, ১৯৫৬।
সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার, কবি নজরুল, ১৯৬০।
—, জ্যৈষ্ঠের ঝড়, আনন্দধারা প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭০।
সেনগুপ্ত কল্পতরু, কাজী রেজাউল করিম, জিয়াদ আলী (সম্পাদিত), কাজী নজরুলকে নিয়ে বই লিখলাম কেন?, নজরুল একাডেমী, চুরুলিয়া, ১৯৮৯।
সেনগুপ্ত কল্পতরু (সম্পাদিত), নজরুল গীতি অন্বেষা, বসুমতী কর্পোরেশন, কলকাতা, ১৯৭২, ১৯৭৪ এবং ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৭৭।
—(সম্পাদিত), উদাসী ভৈরব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯১।
—, জনগণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯২।
—, নজরুল গীতি আলোচনা, নজরুল একাডেমী, চুরুলিয়া, ১৯৯৫।
—(সম্পাদিত), নজরুল গীতি সহায়িকা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি, কলকাতা, ১৯৯৭।
সেনগুপ্ত বাঁধন, নজরুল কাব্যগীতি ঃ বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৬।
—, নজরুলের ছেলেবেলা, ১৯৯৭।
—, রবীন্দ্রনাথের চোখে নজরুল ও নজরুলের ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ, নবজাতক প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৮।
—, কাজী নজরুল ইসলাম তথ্য-সূত্র গ্রন্থ ও গানের তালিকা, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৯৯।
সেনগুপ্ত বাঁধন ও ইসলাম মজহারুল, বাজেয়াপ্ত রচনা ও নজরুল ইসলাম, ১৯৯৯।
সৈয়দ আবদুল মান্নান, নজরুল ইসলাম ঃ কবি ও কবিতা, নজরুল একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭।
—, নজরুল ইসলাম ঃ কালজ ও কালোত্তর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭।
—(সম্পাদিত), তোরা সব জয়ধ্বনি কর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯।
—(সম্পাদিত), লেখায় রেখায় রইল আড়াল, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৮।
হক আসাদুল, নজরুল সঙ্গীতের রূপকার, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯০।
—(সম্পাদিত), নজরুলের জাগো সুন্দর চিরকিশোর, ১৯৯১।
—, চলচ্চিত্রে নজরুল, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।
—, অন্তরঙ্গ আলোকে নজরুল ও প্রমীলা, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৪।
হক মেসবাহুল, ছোটোদের নজরুল ইসলাম, কোহিনূর লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৫।
হক মোহাম্মদ নূরুল, দুখু মিঞার দুখের জীবন, রুশা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫।

হক শেখ আজিবুল, নজরুল ইসলাম ও বাংলাসাহিত্য, হক ব্রাদার্স, বাঁকুড়া, (১৩৯৪) ১৯৮৭।

হাকিম আরিফ, নজরুল শব্দপঞ্জি, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।

হাকিম শেখ আবদুল, নজরুল সাহিত্য মানবতা ও ধর্ম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮০।

হাজরা নীরদবরণ, এক নজরুল ঃ সহস্র সংশয়, ১৯৯৯।

হালদার গোপাল, কাজী নজরুল ইসলাম, সাহিত্য একাডেমী, নয়াদিল্লী, ১৯৭৩।

হালিম জি. এম. (সম্পাদিত), নজরুল মানস সমীক্ষা, পূবালী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৮।

হাসান ইমাম সাগর (সম্পাদিত), নজরুল, অনুকল্প গোষ্ঠী, কুষ্টিয়া, ১৯৭৩।

হাসান মাহবুব, নজরুলের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।

হায়দার জুলফিকার সুফী, নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়, সুফী জুলফিকার হায়দার ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৬৪, ১৯৬৯, ১৯৮৩, এবং অনন্য প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭১।

—, বিদ্রোহী নজরুল নীরব আজি, আর্ট এন্ড কালচার, ঢাকা, ১৯৬৯।

—(সম্পাদিত), নজরুল প্রতিভা পরিচয়, সুফী জুলফিকার হায়দার ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৪।

হায়াৎ অনুপম, নাট্যাঙ্গনে নজরুল, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।

—, নাট্যকার নজরুল, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।

—, চলচ্চিত্র জগতে নজরুল, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৮।

হুমায়ুন রাজীব, নজরুল ইসলাম ও বাংলাদেশের সাহিত্য, ১৯৯৬।

হুদা মাহমুদ নূরুল, চিরঞ্জীব নজরুল, আবু রশীদ মাহমুদ, ঢাকা, ১৯৮৭।

হুদা মুহম্মদ নূরুল (সম্পাদিত), জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জন্মবার্ষিকী উদযাপন স্মারক গ্রন্থ, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।

—, নজরুল ও বঙ্গবন্ধু, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।

হোসেন কাজী মোতাহার, নজরুল কাব্য পরিচিতি, জুয়েল লাইব্রেরি, ঢাকা, ১৯৫৭।

হোসেন মনোয়ার, মায়ের চোখে নজরুল,

হোসেন মীর আবুল (সম্পাদিত), নজরুল সাহিত্য, স্টুডেন্ট্স ওয়েজ, ঢাকা, (১৩৬৭) ১৯৬১।

হোসেন মোবারক, স্বাধীনতা আন্দোলনে নজরুলের অবদান, নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৭।